আসাম হইতে

বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ

(ইহাতে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার ও
হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা আছে)

Recent advances in the treatment of Syphilis",
"Tuberculosis—its ætiology, prophylaxis,
and treatment", and "Treatise on
Influenza" গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার সেন, বিদ্যাভূষণ,

এল-এম-পি, পোষ্ট-গ্রেজুয়েট স্কলার (এম, ডি,);
ভিষক্-রত্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী ; মেডিক্যাল অফিসার, বর্দ্ধমান-রাজ,
কাজলাগড় (মেদিনীপুর)।

প্রণীত।

১৩৩২

এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৬নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী

স্বর্ণময়ী দেবীর শ্রীশ্রীচরণকমলেষু :—

যিনি আমার জন্ম কর্ম্ম প্রদায়িনী, যিনি আমার হিমালয় ভ্রমণের অগ্রগামিনী সঙ্গিনী ছিলেন, যিনি অকাতরে কত প্রকারের ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, যিনি আমার জন্মভূমি ও স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তাঁহার পবিত্র শ্রীশ্রীপাদপদ্মে দরিদ্রের যৎসামান্য মাতৃভক্তির উপহার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।

সেবকাধম

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার সেন।

যোগী (নাথ) সম্প্রদায়—গোরক্ষনাথ ইঁহাদের প্রবর্ত্তক। গাড়োয়ালে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই বিবাহাদি করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা শিব পূজা করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর ইঁহাদিগকে সন্ন্যাসীদের মত সমাহিত করা হয়।

বৈষ্ণব (বিরাগী)—ইহারা বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। ইঁহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়। ইঁহাদের অনেকে নন্দপ্রয়াগে বাস করিয়া থাকেন ও খুব সমৃদ্ধিশালী এবং নন্দপ্রয়াগ হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সাধুদের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন।

পাহাড়ীয়া অত্যন্ত অপরিষ্কার, গায় দুর্গন্ধ, চক্ষুর ব্যারাম বহু লোকের আছে। ইহারা কাপড় প্রায়ই পরিষ্কার করে না।

আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রবীর কুমার সেন এই পুস্তকের প্রুফ্ দেখিবার সময় অনেক সাহায্য করিয়াছে।

পাঠক পাঠিকারা আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

ময়মনসিংহ।
৬ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমী,
১৩৩১ বঙ্গাব্দাঃ। } বিনীত গ্রন্থকার।

শ্রীশ্রীসদাশিবো জয়তি

ভূমিকা

আমি এই পুস্তকের জন্য একটী ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। ইহা লিখিতে আমার আপত্তি এই যে, এই সকল লিখিতে আমার একটী মহান অন্তরায় রহিয়াছে, আমি পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতে পারি না; কেবল নিজের কথা লিখিয়া ফেলি। আমি জানি আপনাকে শুধরাইয়া লওয়ার জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, এখনকার দিনে কয়জনে একথা স্বীকার করিতে পারে? কেহ কি আপনাকে অশুদ্ধ মনে করে? এখন যে অব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণকে সমান দেখার ফ্যাসন চলিতেছে। এইক্ষেত্রে আমার মধ্যে অশুদ্ধতা রহিয়াছে তাহা দূর করার জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইবে; এতাদৃশ ভাব উপস্থিত হইবার ফাঁক (অবকাশ) কোথায়? থাক সে সকল কথা; অগত্যা নিজের কথা বলিতে হইল।

আমি একজন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম; বারদীর শ্রীশ্রী৺লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিষয় যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা জানিবেন, তিনিই সেই সিদ্ধ পুরুষ ও আমার উপদেষ্টা। তিনি এখনকার বক্তাদের ন্যায় আমার প্রতি উপদেশ বর্ষণ করেন নাই; এইত সমাজের পক্ষে অসম্ভব কথা উঠিতেছে, তিনি আমার পূর্ব্বজন্মের সহচর; আমার গত জন্মের শরীরটী তাঁহার সমক্ষে পাত হইয়াছিল। আমি এই জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, তিনি এক জীবনে আমার

দুই জীবনের কার্য্য দর্শন করিয়া একদা নিভৃতে আমাকে বলিলেন, "তুই যে গু কাটিতেছিস্ অর্থাৎ যাহা তোর করনীয় নহে তাহাই করিতেছিস্, ইহা কি টের পাস্?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি "তোর চক্ষের একরূপ পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে; যা, এই পর্দ্দা কাটিয়া গেলে তোর দিব্য জ্ঞানের উদয় হইবে।" ইহার পরে, আমি উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ হিমালয় হইতে নামিয়া আর্য্যাবর্ত্তের কয়েকটা তীর্থ দর্শন করি, এখন দক্ষিণ দিকে দ্বারকাভিমুখে যাওয়া যাক স্থির করিলাম। তখন ভ্রান্তি বশতঃই হউক বা অন্য কারণেই হউক, এতদূর যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়, ইহাও বুঝিলাম। এই বুঝ, আমার গতি রোধ করিতে পারিলনা। আমি দ্বারকা পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হইলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল দ্বারকার দিকে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য নয় বুঝিলাম, তথাপি যাইতে হইল। এইত দেখি অকর্ত্তব্য করিতেছি।

এই দৃষ্টিটা ক্রমে ক্রমে আমার পরবর্ত্তী কার্য্য কলাপের প্রতি ও পাত করিয়া বুঝিলাম, গুরু যে আমাকে "গু কাটিতেছি" বলিয়াছিলেন, সে কথা দেখি ঠিক হইতেছে। কাজেই আমার বলিতে হয় আমার তীর্থ ভ্রমণের ফলে অশুদ্ধিক্ষয় অর্থাৎ আমার চক্ষুতে যে পর্দ্দা পড়িয়াছিল তাহা কাটান হইয়াছে। অন্যেরা এই ভাবে নিজগত বিশেষ বিশেষ অশুদ্ধতার অস্তিত্ব টের পাওয়ার সুযোগ পায়না, এবং তীর্থ দর্শন দ্বারা তাহার ক্ষয় হইলেও তাহা অনুভব করিতে পারেনা। সুতরাং তাহাদের পক্ষে তীর্থ মহিমা বুঝা কঠিন ব্যাপার। তবে আমার যখন অশুদ্ধতা রহিত হইয়াছে, অন্যদের ও তেমন হইবে, আমি না বলিয়া পারিনা।

আমাকে ভূমিকা লিখিতে দিলে, আমি এতটাই লিখিতে পারি। মনে রাখিতে হইবে, আমি এরূপ লেখা ও একটী অকর্ত্তব্য বলিয়াই জানি।

যাহাদের মধ্যে যথার্থ হিন্দুয়ানির বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহারা তীর্থের বিশিষ্টতা স্বীকার না করিয়া পারেনা, এই বিশিষ্টতা Sanitorium নহে। আমাদের মত হিন্দুর ভাব এই যে, আমরা উচ্চস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কলির পাপী মনুষ্যদিগের মধ্যে এখন অবস্থান করিতেছি; উহাদের ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, চাল চলন আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়, কাজেই সহজে এই অবস্থা কাটাইতে ব্যস্ত থাকি। যে দোষের জন্য এই দণ্ডভোগ হইতেছে, তীর্থাদির সাহায্যে তাহা কাটাইতে আমরাই উদ্‌গ্রীব থাকিতে পারি। অন্য যে সকল মনুষ্য অন্তর্নিহিত আর্য্যজনোচিত সংস্কার প্রভাবে আমার লিখিত এই সকল কথার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণেও আস্থা করিতে পারে, তাহারা ও তীর্থ যাত্রার প্রতি আগ্রহ না করিয়া পারে না। আর যাহারা কলির উপযুক্ত মনুষ্য, এই এক জন্মেই জন্ম জানে; কেবল ইহ জীবনে সুখের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, পরকালের ভাবনা করা মূর্খের কর্ম্ম বোঝে, তাহারা আত্মদোষ ক্ষালন কথার ভাবই বুঝিতে পারে না, সেই নিজ দোষ দূরকরনার্থ তীর্থ যাত্রার আবশ্যকতা বুঝিবে কিরূপে? সেই শ্রেণীর পাঠকের জন্য তীর্থ প্রসঙ্গের পুস্তক লেখা অনাবশ্যক। আমরা এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোককে এই দলেই ফেলিতাম, এখন দেখি তাহাদের মধ্যে এমন একটা প্রবল ধাক্কা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে অনেকে গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। এমন অবস্থাতে তীর্থ প্রসঙ্গ শুনিবার লোকাধিক্য হইবার সম্ভাবনা করা যায়।

২১৩ নং শিবালয়, কাশী।
৫ই আশ্বিন, ১৩২০ সন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী।

নিবেদন

সে আজ বহু দিনের কথা। মইনপুরী থাকিতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স এর মালিক শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাস্পাতালের বারেন্দায় বসিয়া বদরিকাশ্রমের গল্প করিতেন, তিনি তথায় গিয়াছিলেন। এখন আর তিনি ইহ জগতে নাই। তখন একবারও মনে করি নাই যে আমার ভাগ্যে বদরিকাশ্রম দর্শনলাভ ঘটিবে। দেখিতে দেখিতে ২০ বৎসর কাটিয়া গেল। জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত আপদবিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের (এখন রায় বাহাদুর) "হিমালয়" পাঠ করিয়া হিমালয় ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে কত বৎসর কাটিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুস্তক খানার ভাষার লালিত্য এত মধুর এবং এত হৃদয়গ্রাহী যে আমি তাহা বারংবার পাঠ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই এবং স্থানে স্থানে ভাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করাও অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আমার এই গ্রন্থের কথা স্বতন্ত্র।

এই পুস্তকে বর্ণশুদ্ধি এবং ভাষাশুদ্ধি সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না, তবে আশা আছে সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজ গুণে অনায়াসে অশুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবেন। ভগবান ভাবগ্রাহী, ভাষাগ্রাহী নন, কারণ শাস্ত্রে আছে "ভাবমিচ্ছন্তি দেবতা"। আমার ভাষার লালিত্য নাই তজ্জন্য পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। আমি সাহিত্য লিখিতে বসি নাই। আমি লিখিতেছি ভ্রমণকাহিনী। বর্ণশুদ্ধি

তাষাদোষ প্রভৃতি শিশুশিক্ষার বিষয় না ভাবিয়া যাহাতে ভগবানের চরণে মাথা লুটাইতে পারা যায় তাহার শুধু আভাষ প্রদান করিয়াছি। আর চেষ্টা করিয়াছি শাক্ত ও বৈষ্ণব হিন্দুগণ যাহাতে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। কেদার ও বদরিকাশ্রমের বিষয় অনেকেই অবগত নহেন। আজিমগঞ্জের নিকট একজন ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথায় গিয়েছিলেন'? আমি বলিলাম বদরিকাশ্রম হইতে আসিতেছি। তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন সে যে বহুদূর।

তীর্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিদানাগময়োস্তীর্থমৃষিজুষ্টজলে গুরৌ। ঋষি সেবিত জল, ভূমি, পর্ব্বতাদিকে তীর্থ বলে; ইহা অমর সিংহ অমরকোষে বলিয়াছেন। পাপ হইতে যদ্দ্বারা মুক্ত হওয়া যায় তাহাকেও তীর্থ বলে। পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলেরই তীর্থগমন করা কর্ত্তব্য।

হিমালয় ভ্রমণে সোয়ালক্ষ পর্ব্বত ও ৮৪ লক্ষ তীর্থ অতিক্রম করিতে হয়। অন্ততঃ পাণ্ডারা মন্ত্র পড়াইবার সময় এই ভাবেই বলিয়া থাকেন। পশ্চিমে কাশ্মীরে ৺অমরনাথ, গাড়োয়াল জেলায় ৺কেদারনাথ ও ৺বদ্রীনাথ, পূর্ব্বে নেপালে ৺পশুপতিনাথ, উত্তরে কৈলাশ পর্ব্বত ও মানস সরোবর প্রসিদ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ সকল বিরাজিত। অপর সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সকলই হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া অসংখ্য উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে সাগরে পতিত হইয়াছে। যেমন পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় তদ্রূপ তীর্থদর্শনাদি, যাগ, যজ্ঞ, ও পূজা দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হিমালয়ের প্রত্যেক স্থান পবিত্র কেননা ইহা কোনও প্রাচীন স্মৃতির সহিত বিজড়িত। বহুস্থান দর্শন এবং বহুস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে

যদি কেহ পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ সম্বন্ধের স্থানে উপস্থিত হয়, তবে হঠাৎ তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু একস্থানে বসিয়া বহুসাধনভজন করিলেও এটি সহজে লাভ হয় না। কোন স্থানের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা বলা যায় না। যোগাযোগ হইলে তাহা স্মৃতিপথে উদয় হইয়া থাকে। তাই বলিয়া ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তীর্থভ্রমণ বিষয়ে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

ভিক্ষাভুজোনিবর্ত্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চযে।
ক্ষুত্তৃড়্জোধ্বশ্রমায়াস শীতার্ত্তি মসহিষ্ণবঃ॥
তে সর্ব্বে বিনিবর্ত্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্কান্নলেহ্য পানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ॥
তেঽপি সর্ব্বে নিবর্ত্তন্তাং যেঽপি সূদানুযায়িনঃ॥

যাঁহারা ভিক্ষাভোজী, যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের ক্লেশ, ও শীত সহিতে অপারগ, এরূপ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্ত্তন করুন। যাঁহারা মিষ্টান্নভোজী, পক্কান্নপ্রিয়, লেহ্য, পান, ও নানাপ্রকার মাংস ভোজনে রত, তাঁহারাও নিবর্ত্ত হউন। আর যাঁহারা পাচকের পশ্চাতে অনুগমন করেন তাঁহারাও আসিবেন না।

বহু প্রাচীনকালে ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও অন্যান্য নদীতটে চিরতুষারাবৃত হিমালয় হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত মুনি ঋষিদের আশ্রম ছিল। গাড়োয়ালের ন্যায় নির্জ্জন ও নানা বিষয়ে সুবিধা জনক স্থান ভারতে আর কুত্রাপি নাই। এই স্থান হিন্দুধর্ম্মের জন্মভূমি। মহর্ষি বেদব্যাস সরস্বতী গঙ্গার তীরে গুহাতে বসিয়া সমস্ত পুরাণ ও মহাভারত লিখিয়াছেন। এই প্রকার কথিত আছে যে তাঁহার দশ হাজার শিষ্য ছিল। ইহা ছাড়া কাশ্যপের আশ্রম বদরিকাশ্রমে, কপিলের আশ্রম হরিদ্বারে, ব্যাস ও জৈমিনির আশ্রম সরস্বতী নদীর তীরে ছিল।

মোটের উপর এই দেশ হিন্দুধর্ম্মের জন্মভূমি। বেদ ও পুরাণ যাহা কিছু আছে সমস্তই এই গাঢ়োয়ালে লিখিত হইয়াছিল।

এই দেশকে গাঢ়োয়াল বলে কেন? যদিও শঙ্করাচার্য্য কেদার ও বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন তথাপি শঙ্কর বিজয় নামক গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ নাই। ইহাতে বুঝা যায় ১২০০ খৃঃ অঃ পরে এই স্থানের নাম গাঢ়োয়াল হইয়াছে। সঙ্কল্প করিবার সময় কোনও কোনও পুরোহিত গাঢ়োয়ালের পরিবর্ত্তে গঢ়পাল দেশ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কণক পালের বংশের কোনও রাজা এই দেশকে গঢ় বলিতেন এবং তাঁহার নামের পদবীর অনুসারে গঢ়ো পাল শব্দ ব্যাহার করিতেন। গঢ়পালের অপভ্রংসে গাঢ়োয়াল হইয়াছে।

গাঢ়োয়ালে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচারী—ইঁহারা মস্তক মুণ্ডন করেন, শিখা রাখেন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বেদ পুরাণ বিশ্বাস করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে দাহ করা হয়। ক্বচিৎ এই প্রকার লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসী—এই সকল যোগী শঙ্করাচার্য্য ও দত্তাত্রেয়র পর হইতে সম্ভূত হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীরা দশ দলে বিভক্ত এইজন্য ইঁহারা দশ নামা সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা গাঢ়োয়ালে গ্রামের মধ্যে ঘরবাড়ী করিয়া বসতি করিতেছেন। অনেকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জমি আছে। ইঁহাদের যজ্ঞোপবীত নাই, অনেকে গৈরিক বসন পরিধান করেন এবং গায় ভস্ম মাখিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর দেহ সমাহিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সাদাসিধা ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া গাঢ়োয়ালের বহু স্ত্রীলোকেরা ও সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। হৃষীকেশের বিখ্যাত কালীকম্বলী বাবা এই শ্রেণীভুক্ত লোক ছিলেন।

সূচী পত্র।

আসাম হইতে
বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ

"রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃতজরৎ-কন্থাঞ্চলস্যাধ্বগৈঃ,
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সকৃপং দৃষ্টস্য মে নাগরৈঃ।
নির্ব্যাজীকৃত চিৎসুধারস মুদা নিদ্রায়মাণস্য মে,
নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা করপুটী ভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি॥
গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য,
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিন্তৈর্ভব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্ব্বিশঙ্কাঃ,
সম্প্রাপ্স্যন্তে জরঠহরিণা গাত্রকণ্ডুবিনোদম্॥"

যাত্রা

বহু বৎসরের বিজড়িত-স্মৃতির তমোময় গহ্বর হইতে আশা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই তাই নানা প্রকার বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও যখনই মনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া আয়োজন প্রয়োজন অভাব অভিযোগ নিবারণ করিতে অগ্রসর হইলাম তখনই এক অব্যক্ত হৃদয়বিদারক স্মৃতি মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। গত শ্রাবণ (১৩২৬ বঙ্গাব্দাঃ) মাসে যখন শ্মশানের বহ্নি বুকে করিয়া হিমালয়ে ঝাঁপ দিয়াছিলাম তখন কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আজিও তাহা বিদ্যুতের মত চমকাইয়া দেয়। নৈরাশ হৃদয়ে যাহা কিছু আয়োজন করা যায় তাহাই বিফল হয়। তাই মনে হইতে লাগিল যে, আমার এত সব সাজ সরঞ্জাম লইয়া

শেষে কি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। আমার পত্নী জীবিত থাকিতেই হিমালয় ভ্রমণের অভিলাষ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার অভাবে এখন আর মনের বল নাই, সহায় সম্পদ নাই, এই বিশাল দুঃখ দারিদ্রতাপূর্ণ সংসারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পরপারের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাঁহার স্মৃতিটুকু তুষানলের মত হৃদয় মধ্যে ধিকি ধিকি করিয়া এখনও জ্বলিতেছে। এ যন্ত্রণা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরের বুঝিবার কি সাধ্য আছে। সকলই নীরবে সহ্য করিতেছি। যে দিকে তাকাই তাঁহারই অভাব শুধু দেখিতে পাই।

চিন্তায়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়াহীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ।

এই চিন্তাই আমাদের দুঃখের হেতু, অপর কিছুই নহে। এই চিন্তাই জাগ্রত অবস্থায় সকলেরই সাথী, ইহাকে যে ত্যাগ করিতে পারে সেই সুখী হইতে পারে। যে লোক ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন তিনিই এ সংসারে সেই ভীষণ চিন্তা-শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া সুখী ও শান্ত হইয়া থাকেন। সংসারকে অনিত্য জানা সত্বেও যদি এই চিন্তাস্রোত হইতে মুক্তি পাইতাম তবেই জীবনে শান্তি মিলিত কিন্তু কৈ তাহাত হইল না। অর্থের জোর নাই, সাহায্য করিবার লোক নাই কিন্তু উপরওয়ালা ত একজন আছেন তাই তাঁহার আশ্রয় স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দাঃ—

বৃষ্টির দিন, রাস্তা ঘাট সবই কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, সঙ্গের জিনিষপত্র পূর্ব্বেই নৌকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীর পূর্ব্বেই নৌকাতে সব ঠিক করিবার জন্ত চলিয়া গিয়াছিল। আমার

সঙ্গে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শান্তি ও কন্যা শ্রীমতী ননী ও একজন ঝি। এই কয়জনে বিকালবেলা যাত্রা করিলাম। বাসা হইতে নৌকার ঘাট প্রায় ২ মাইল। তথায় পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নৌকা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারও একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমাদের সঙ্গেই রওনা হন কিন্তু এ গরীব ব্রাহ্মণের ইচ্ছা আর ফলবতী হইল না। একদিকে তাহার অর্থাভাব এবং অপর দিকে সংসার প্রতিপালন। তিনি শান্তি ও ননীকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁহার বিদায়ের সময় ননী কাঁদিয়া ফেলিল। তিনিও ছোট ছেলেমেয়ের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। একেই আমার মন ভাল নয় তাহার উপর এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমিও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবেই কাটিল পরে অনেক কষ্টে তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার সময় নৌকাখানা ধরিয়া যখন বদরীনাথ ও কেদার নাথের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা গলায় জয়ধ্বনি করিলেন তখন মনের অবস্থা অনুরূপ হইয়া গেল। সেই বদরীনাথের উদ্দেশে মস্তক নত করিলাম এবং তাঁহারই শ্রীচরণে মন অর্পণ করিলাম।

রাত্রিতে নৌকাতে রান্না করা গেল পরে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিবস প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—

নৌকা রাঙ্গানদী দিয়া চলিতে লাগিল, এই পাহাড়ীয়া নদীর ও তাহার উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর—কোথাও বা উভয় তীরে ভীষণ জঙ্গল, কোথাও বা মিরিদের গ্রাম—তাহারা চাল বাঁধিয়া ঘর করিয়া বসবাস করিতেছে; ইহারা চাস আবাদ করে।

পালিত জন্তুর মধ্যে মহিষ, গরু, শুকর, ছাগল ও মুর্গি। চা ও তামাক পাইলে ইহারা খুব সুখী হয়। ইহার বিনিময়ে ইহাদের নিকট হইতে মাছ পাওয়া যায়; আমরা কিছু পাইয়াছিলাম। সমস্ত দিন নৌকা চলিল সন্ধ্যার সময় একটা চড়াতে নঙ্গর করা হইল। আহারাদির বন্দোবস্ত নৌকাতেই করিলাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ—

বদতি ঘাটে বেলা ১২½টার সময় "ছোট জাহাজ" (Feeder Steamer) পাইলাম এবং ১½টার সময় রওনা হইয়া ৫টার সময় সুবর্ণিরিমুখ পৌঁছিলাম। সমস্ত রাত এখানে মশার উপদ্রবের মধ্যে "ফ্লেটে" কাটাইতে হইল। পরদিবস ভোর বেলা ডাকজাহাজ (mail steamer) পাওয়া গেল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—

দিন রাত্রি এই বড় জাহাজে থাকিয়া পর দিবস সকালে ৯টার সময় আমিনগাঁও পৌঁছিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ—

আমিনগাঁও ডাকঘরের নিকট একটা বড় তেঁতুল গাছ আছে তাহার নিচে পূর্ব্বে কয়েকবার রান্না করিয়া খাইয়াছিলাম—এবারও তাহাই করা গেল। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল একভাব এখন অন্যভাব। পূর্ব্বে সমস্ত আয়োজনই আমার পত্নী করিতেন কিন্তু এখন সমস্তই আমার "গতর খাটাইয়া" করিতে হয়। সে যাহাহউক আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ডাকগাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বদতিতে বড়দিও-

বাবের ডাক্তার খয়েরউদ্দিনের সহিত আলাপ হইয়াছিল। পূর্ব্বে যদিও ইঁহার নাম শুনিয়াছিলাম কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় কখনও হয় নাই। তাঁহার সহিত আলাপে বেশ আনন্দলাভ করিলাম—বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, তিনি কাবুল যুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং লর্ড রবার্টস (Lord Roberts)এর অধিনে কাজ করিয়াছিলেন। এই ডাক্তার ও তেঁতুলতলা তাঁহার মুসলমান চাকরকে দিয়া রান্না করাইয়া আহারাদি শেষ করিয়া নিলেন। এক সঙ্গেই রওনা হইলাম আমার থার্ড ক্লাসের টিকেট আর তাঁহার ছিল ইনটারের টিকেট। কাউনিয়াতে যাইয়া গাড়ী বদলি করিতে হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলাম কিন্তু ডাক্তারের চাকর আর উঠিতে পারিল না—সে কাউনিয়াতেই পড়িয়া রহিল—ডাক্তার বেগতিক দেখিয়া রংপুরে নাবিয়া গেলেন কারণ তাহার চাকরকে ত আর ফেলিয়া এতদূরের রাস্তা অমৃৎসহরে যাইতে পারেন না। এই সব দুর্ঘটনা শেষ রাত্রিতে ঘটে। ভোরবেলা আমরা দিনাজপুরে পৌঁছছিলাম। আমরা যে ট্রেনে আসিলাম সেই ট্রেনে দেশবন্ধু শ্রীযুক্তচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ও সহযোগিতা বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিনাজপুরে আসিলেন।

ষ্টেশনে আসিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। তখনও ভাল রকম ফরসা হয় নাই। অনেকের হাতে লণ্ঠন। মনে হইল যেন সহরের সমস্ত লোকই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছে। ষ্টেশনের বাহিরে একটা ফটকও নির্ম্মাণ করিয়াছে। তিনি তখন ষ্টেসনে নামিয়া ওএটিং রুমে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরাও এ ভীরের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গন্তব্য স্থানে রওনা হইলাম। অনেক কষ্টে একখানা ঘোড়ার গাড়ী পাইলাম। যখন বাসায় পৌঁছিলাম তখনও সকলে ঘুম হইতে উঠে নাই। গাড়ীর শব্দ পাইয়াই নমু ও কুটি মহা উল্লাসে দরজা

খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াই শান্তিকে কোলে নিল। ইহারা যে শান্তির সহোদর ভাই, সকলেই মাতৃহারা। শান্তিরও মহা আনন্দ, নমু ও কুট্টিকে পাইলে সে সকলকেই ভুলিয়া যায়, তখন আর আমার কাছেও আসিতে চায় না। এই মাতৃহীন শিশু যে কত অভাব বোধ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সব বুঝে না এবং বুঝাইয়া বলিতেও পারে না। যখন নীরবে ইহার বিষয় চিন্তা করি তখন আমার মনে যে কত ভাবের উদয় হয় তাহা লিখিতে পারি না। এই শিশুকে আমার ক্রোড়ে দিয়াই যে তাহার গর্ভধারিণী স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমিও উহাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারি না আর থাকিবার ইচ্ছাও নাই। ইহাকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা করে না। তাই শান্তিকে নিয়াই আমি সুদূর কৈলাশ পর্ব্বতস্থিত বদরিকাশ্রমে যাইতে স্থিরসংকল্প করিলাম। রাস্তাতে যে প্রকার কষ্টই কেন পাইনা এই শিশুকে কোথাও রাখিয়া যাইতে পারিবনা। দিনাজপুর আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ডাকবিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্। এখানে ৩ দিবস থাকিলাম।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ভগবানের নাম করিয়া রওনা হইলাম। আমার সহিত আমার পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীকেও সঙ্গে নিলাম আর শ্রীমান শান্তিত আছেই। ঘোড়ার গাড়ীতে বাসা হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে ঘোড়া বিগরাইয়া গেল, গাড়ী আর চলে না আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম নচেৎ গাড়ীখানা উল্টাইয়া যাইত। আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান ব্রজেন্দ্রকুমার সেন ও মফস্বলের ডাকঘর পরিদর্শনের জন্য রওনা হইলেন।

তিনি কাটিহার হইয়া পরে অন্যত্র যাইবেন। আমার ছেলেরা ও কন্যা ননী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবাও ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইয়া থার্ড ক্লাসের আড়াইখানা টিকেট খরিদ করিলাম। কিছু সময় পরেই ট্রেণ আসিল। বিদায় কালীন শ্রীমতী ননীর ছল ছল চক্ষু দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ছ্যাং করিয়া উঠিল, উহাকে ফেলিয়া যাইতে খুব কষ্ট হইতে লাগিল। সে ফোঁপাইয়া কান্দিতে লাগিল। তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন যমুনা সরস্বতীর প্রবাহ বহিতেছে। তাহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া হাতে একটী টাকা দিলাম বলিলাম তোর ইচ্ছামত খরচ করিস্। শ্রীমান নন্থু ও কুট্টি যখন ট্রেণ ছাড়িবার সময় আমাদের কামরা হইতে নামিয়া পড়িল তখন আর এক দৃশ্য। শ্রীমান শান্তি কিছুতেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে না গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতে চায় আর যে চিৎকার আরম্ভ করিল তাহাতে তাহাকে সামলান আমার এক বিষম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার জননী জীবিত থাকিলে আর আমার এসব দৃশ্য দেখিতে হইত না। এখন আমার যে কত প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শান্তি যে কত মনের আবেগে "ছাড়িয়া দাও" "ছাড়িয়া দাও" বলিতেছে আর "নন্থু" "নন্থু" বলিয়া চিৎকার করিতেছে তাহা কে শোনে। আমি বধির তাই এই দিগন্তভেদী চিৎকার শুনিতে পাইতেছি না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীবই বন্ধনমুক্ত হইতে প্রয়াসী। আর একদিন শান্তি এইভাবে "মা" "মা" বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়াছিল। তখন মাতৃহীন শিশুর করুণ ক্রন্দনে অধীর হইয়া আমিও অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলাম। তাহার সেই ক্রন্দন নিবারণের জন্য এই মাতৃহীন

শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়াই তাপিতপ্রাণে শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম। গাড়ীত ছাড়িয়া দিল শান্তির ক্রন্দনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একবার মনে করিলাম যদি না থামাইতে পারি তবে পরের ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিব। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় সে কয়েক মিনিট পরেই চুপ করিল এবং আমি প্রাণের ভিতর অশেষ আনন্দ উপভোগ করিলাম। মনে হইল যেন একটা বিরাট বোঝা বুক হইতে অপসারিত হইল।

কাটিহারে গাড়ী বদল করিতে হইল। সময়ও যথেষ্ট পাইলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী প্লেটফরমের কলের জলেই স্নান করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া নিলেন। সমস্ত দিনরাত্রি ট্রেণে থাকিয়া পর দিবস বিকালে অযোধ্যা ষ্টেসনে আসিয়া হাজির হইলাম।

অযোধ্যা

ষ্টেসনে নামিয়া দূর হইতে নগরের শোভা দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় ৪ মাইল একায় যাইতে হয়, সরযু নদীর উপর দিয়া কাঠের সেতু আছে, কত শত শত গরুর গাড়ী এবং একা চলাচল করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। রাস্তা বালুতে পরিপূর্ণ মধ্যে মধ্যে একা হইতে নামিতে হয় কারণ রাস্তা খারাপ পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। আর না নামিলে ঘোড়ায় টানিতেও পারে না।

এইত শ্রীরামচন্দ্রের দেশ এখানেই ভগবান ১০ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন কোথায় বা সেই রাম আর কোথায় বা সেই রাম রাজত্ব। বাল্মীকির অমর লেখনীতে যাহা বর্ণনা করিতে

পারে নাই, শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে যে স্থানের তুলনা হয় নাই, সেইস্থান কি এই? কালের কুহকে সকলই ধ্বংস হইয়াছে এখন আছে শুধু স্মৃতি আর আধুনিক অট্টালিকা সে সব স্থানের অতীব গৌরব দেখাইয়া দিতেছে।

অযোধ্যাতে ২টা ষ্টেসন একটা বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়েতে (B. N. & W. Ry.) সরযূর অপর তীরে ইহা সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল ব্যবধান, এবং অপরটী আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে (O R. Ry.) ইহা সহরের সংলগ্ন।

মানকাপুর ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিবার সময় একজন পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল। যখন সরযুর উপর দিয়া কাঠের সেতু পার হইতেছিলাম তখন দেখিলাম নদীতে অনেক কুম্ভির, আর তাহাদের রং সবুজ বর্ণ। সরযূর পারেই পাণ্ডার বাড়ী তথায় যখন উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমরা একে একে নদীতে স্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম অনেক কচ্ছপ। হাঁটু জলে স্নান করিতে হইয়াছিল দূরে যাইতে সাহস হইল না কারণ কুম্ভীরের ভয়। পাণ্ডার লোকই বাজার হইতে জিনিষ পত্র আনিয়া দিল। খুব গরম বোধ হইতেছিল তাই খোলা বারেন্দায় বিছানা করিলাম কিন্তু কিছু সময় পর দেখি "আন্ধি" আসিতেছে তাই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে বিছানা সরাইয়া ফেলিলাম।

মানকাপুর ষ্টেসনে পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম যে এবার বদরিকাশ্রম যাওয়ার রাস্তা গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন। শুনিয়াই মনটা দমিয়া গেল, মনে করিলাম যে তবে কি এযাত্রা বিফলেই যাইবে। একথা নিয়া বাসায় বসিয়া মনের মধ্যে অনেক তোলপার করিতে লাগিলাম। নারায়ণ দর্শন যদি অদৃষ্টে নাই থাকে তবে পুষ্কর হইয়া ফিরিয়া যাইব।

তীর্থপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ও লাভ

তীর্থ কাহাকে বলে এবং ইহাতে কি লাভ হয়। তীর্থশব্দের অর্থ যজ্ঞ, উপায়—তীর্থ তিন প্রকার মানসিক, জঙ্গম এবং স্থাবর বা ভৌমতীর্থ। সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি, এই সকল মানসিক তীর্থ। নির্ম্মলচিত্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম তীর্থ। ভূমির অদ্ভুৎ ক্ষমতাতে, জলের তেজে ও মুনিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হওয়ায় পবিত্র কাশী, প্রয়াগাদি স্থান স্থাবর বা ভৌমতীর্থ। যে পুণ্যক্ষেত্রে পাপ মুক্তির জন্য মানবেরা গমন করে তাহাই তীর্থ। নদীর অথবা সাগরের তীরে স্থিত ঘাটের নাম তীর্থ। সকল তীর্থেই কি নদী বা সাগর আছে? তাহা না থাকিলেও আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারি যে সংসারক্লিষ্ট মানবের শান্তির নিমিত্ত যে স্থান তাহাই তীর্থ। মুনিঋষিগণ যুগে যুগে বিভিন্ন নাম দিয়া বহুতীর্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তীর্থস্থানে যাওয়া মাত্রেই মনের এক মহান বহু উচ্চভাবের উদয় হয়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অতীত যুগের মুনি ঋষিগণ যে আধ্যাত্মিক জগতে কত উন্নত ছিলেন তাহার প্রমাণ।

পূর্ব্বতন মহাপুরুষেরা যে কতদূর সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তাহা তীর্থ ভ্রমণে জানিতে পারা যায়। যেসব স্থানে বর্ত্তমান তীর্থস্থান গুলি বিদ্যমান তথাকার জল হাওয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে কত সুন্দর তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আধুনিক নব্যশিক্ষার ফলে কি এসব সম্ভবে? কখনই না। তীর্থপর্য্যটন দ্বারা মনের দৃঢ়তা স্বাবলম্বন শিক্ষা,

ভগবানে আত্মসমর্পণ, সাধুসঙ্গ, সদগুরুলাভ, ভগবানে ভক্তি, নানা প্রকার অভিজ্ঞতা, পুণ্য, বৈরাগ্যভাব এবং অবশেষে মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে।

আত্মচিন্তা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। এই আত্মচিন্তার ভাব তীর্থ পর্য্যটন না করিলে আসিতে পারে না। সাধুসঙ্গ ও সদগুরুর কৃপা না হইলে আত্মদর্শন হইতে পারে না। আত্মদর্শনই জীবের মুক্তির উপায়।

প্রাচীন পুরুষেরা যে তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি সম্পাদন করিতেন, আমরা তাঁহাদের সেই ভাব হইতে এত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি যে তাহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নিজের আবার শুদ্ধি কি? আমরা এইদিকে কিছুমাত্র চিন্তা করিতে পারিতেছি-না। যদি কেহ এই ভাবটী অল্পও গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি তাহা ভ্রমণের সারবত্তা শতমুখে প্রশংসা করিবেন।

মোক্ষদায়িকা সপ্ততীর্থের মধ্যে অযোধ্যাই প্রধান।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।"
"হরিদ্বার দ্বারাবতি সপ্তদা মোক্ষদায়িকা"

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়াই ইহা হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। অযোধ্যা পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। মনু এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রস্থে দুই যোজন ছিল। আধুনিক অযোধ্যা ও রামায়ণের অযোধ্যা স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ। সূর্য্যবংশের শেষ রাজা সুমিত্র অযোধ্যা ত্যাগ করার পর এ স্থান অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহার পর খ্রীষ্টীয় ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমজিৎ নামক জনৈক নরপতি এইস্থান উদ্ধার করিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মুসলমানাধিকারের সময় এইস্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ মন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দির ছিল না।

১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার—

অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সরযূতে স্নান, তর্পন ও পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলাম। ইহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। নদীতে অনেক কচ্ছপ দেখিলাম স্নান করার সময়ই পায় ঠেকে এবং পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করা মাত্র, দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদের গায়ের রং ও কুম্ভিরের ন্যায় নবদূর্ব্বাদলের রং। ইহা কি ভগবানের মহিমা নয়? আমি কয়েকটা কচ্ছপকে ঠেলিয়া দিয়াছিলাম। শান্তি ও তাহাদের পৃষ্ঠে হাত দিয়াছিল। হিংসা শূন্য প্রাণী। বাসায় ফিরিয়া কিছু জলযোগের পর একখানা এক্কা গাড়ী ভাড়া করিয়া দেব দর্শনে বাহির হইলাম।

রামকোট—ইহা খুব প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীরামচন্দ্র এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিগে বিশটী বুরুজ ছিল, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্ববান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষেরা উহার উপরে থাকিয়া সর্ব্বদা প্রহরীর কার্য্য করিতেন। এই দুর্গের ভিতর ৮টী রাজপ্রসাদ ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই।

হনুমান গড়—এইস্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এখানে হনুমানের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পশ্চাদ্ভাগের একটী গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এইস্থানে অনেক সেবাইৎ থাকেন। হনুমানের আদর এ অঞ্চলে খুব বেশী। এখানে অনেক তেঁতুল গাছ দেখিলাম।

জন্মস্থান—যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে স্থান এখনও আছে তথায় ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পদ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই একটা প্রকাণ্ড মসজিদ্। ইহার গাত্রে

দুইখানা প্রস্তরে ৯৩৫ হিজিরা (১৫২৮ খৃঃ) খোদিত আছে। অনেক হিন্দুমন্দিরের উপকরণ দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৫২৮ খৃঃ যে সময় সম্রাট বাবর এখানে মৃগয়া করিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন সে সময় ইহা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই মন্দির ও মস্‌জিদ লইয়া অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জন্মস্থান ও মস্‌জিদের মধ্যে রেলিং বসাইয়া দিয়াছে।

এক মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি আছে। তথায় প্রকোষ্ঠের দরজা একখানা পরদা দিয়া ঢাকা, একটা বন্দোবস্ত না থাকিলে পরদা উঠান হয় না। কি ভীষণ কলি আসিয়া নারায়নের জন্মস্থানকে পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছে। যে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা হইল তিনি ব্রাহ্মণ কিনা জানি না। তিনি বলিলেন যে এখানে একটা বন্দোবস্ত না করিলে রামচন্দ্রের দর্শন পাওয়া যায় না। একবার মনে হইল প্রত্যাবর্ত্তন করি আবার মনে করিলাম যে এ সব লোকজনের যেরূপ চেহারা তাহাতে তাহারা লুটপাট করিয়া আমাদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করা অসম্ভব হইবে না। তিনি বলিলেন যে যাত্রীরা কেহ ৫০০৲ ২৫০৲ ১০০৲ ৫০৲ ২৫৲ ১২৷৷০ পর্য্যন্ত এখানে দিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বরাবর ভোগ দেওয়া হয়। আমাদের সামনেই একজন মহিলা ৫০৲ টাকা দিলেন। তখনই আমার মনে সন্দেহ হইল। আমি ১৷০ তে বন্দোবস্ত করিলাম. পরে পরদা উঠাইয়া রামসীতার মূর্ত্তি দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মনে ভাবিলাম কি ভীষণ প্রতারণা! কত উপায়ে যে যাত্রীদের প্রবঞ্চনা করে তাহার ইয়ত্তা নাই। অযোধ্যা থাকিতেই আমাদের বাসার অপর একজন যাত্রী গিয়াছিল। তাহাকে আমার মতন প্রলোভন

দেখাইয়াছিল এবং তাঁহার সামনেও সেই একটী মহিলা ৫০৲ টাকা ভোগের জন্য বাহির করিয়া দিল।

অযোধ্যাতে রামচন্দ্রের চরিত্রের অনেকগুলি মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিভিন্নভাবে দেখান হইয়াছে। এই সব মূর্ত্তি মাটির নির্ম্মিত। এক স্থানে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণের সমভিব্যাহারে বল্কল পরিধান করিয়া বনগমন করিতেছেন, অপর স্থানে কোথাও কৈকেয়ী অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমান করিয়া আছেন আর রাজা দশরথ অবনত বদনে তাঁহার মান ভঞ্জন করিতেছেন, কোথাও চারি রাণীরা তাঁহাদের পুত্রদের কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোথাও শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র যে বেদীর উপর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যাত্রীরা প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। বেদীর নিকটে এক জোড়া যাঁতা ও একটী উনন্ আছে। প্রবাদ সীতাকে বিবাহ করিয়া আনিলে যে বৌ-ভাতের যজ্ঞ হয় তাহাতে ঐ উনানে রান্না এবং ঐ যাঁতায় ডাইল ভাঙ্গা হইয়াছিল। এবম্বিধ অনেক রকমের চিত্র অযোধ্যাতে দেখা যায়।

মণি পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত ও কুবের পর্ব্বত—

মণি পর্ব্বত প্রায় ৪৪ হাত উচ্চ, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতি দূরে অবস্থিত। হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্ব্বত লঙ্কাতে নিয়া যাইতেছিল তখন ভরতের বাটুলাঘাতে যে অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহাই এই পর্ব্বতকে অধিবাসিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের উপরে একটী মন্দির আছে তথায় রাম, সীতা, লক্ষণ ও হনুমানের প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই পর্ব্বতটী ইট, পাথর ও কঙ্করে পরিপূর্ণ।

মণিপর্ব্বতের নিম্নে দুইটী সমাধি আছে, উহার একটীতে সেখ ও অপরটীতে জব নামক পৈগম্বর সমাহিত আছেন। অপর পার্শ্বে আমজামের বাগান। স্থানটী বেশ মনোরম দেখিলাম, তথায় ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে। অপর স্তূপ দুইটী সামান্য উচ্চ। সুগ্রীব পর্ব্বত প্রায় ৬ হস্ত এবং কুবের পর্ব্বত প্রায় ১৪ হস্ত উচ্চ। অনেকে বলেন ইহা বৌদ্ধ-স্তূপ। এ স্থান দর্শন করিতে আমরা তৃতীয় দিবস গিয়াছিলাম।

যখন সহর ভ্রমণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম তখন শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইতেছিল। শান্তির খুসখুসে কাশি হইয়াছে।

এখানে বানরের অনেক উপদ্রপ। যাহাদের খোলার ঘর তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া খোলার উপর কাঁটা দিয়া রাখিতে হয় নচেৎ ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই প্রকার রাস্তার লেম্প-পোষ্ট ও মন্দিরের ছোট ছোট চূড়াগুলিতেও দেখিলাম কাঁটা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

সরযূ নদীর তীরে যে সব ঘাট আছে তাহার মধ্যে রাম ঘাট, স্বর্গদ্বার, সীতা ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট উল্লেখ যোগ্য।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—

সকালে মণিবাবার আশ্রমাভিমুখে আমি একাই রওনা হইলাম। একখানা এক্কা করিয়া চলিলাম কারণ সহর দিয়া গেলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক মাইল রাস্তা চলিতে হয়। নদীর তীরে পৌছিয়া অবগত হইলাম যে বাবাজি বালুচড়ের মধ্যে চালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন এবং সে স্থান প্রায় ১½ মাইল হইবে। বালুর উপর দিয়া যাইতে হইবে। এক্কা বিদায় করিয়া দিলাম পরে পদব্রজে বালুর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—দেখিলাম

যেদিকে চাই কেবল বালুর মরুভূমি। যখন মণিবাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়াছে। সকলেরই আহারাদি হইয়া গিয়াছে। কয়েক মাসের জন্য এই বালুচড়ের মধ্যে সামান্য কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া কয়েক জন শিষ্য সমভিব্যাহারে এখানেই বাস করিয়া থাকেন। সরযূর তীরে বড় আশ্রম আছে, তথায় অনেক শিষ্য আছে। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন বাবাজি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, একজন শিষ্য বলিলেন যে কিছু সময় পরে সাক্ষাৎ হইবে। আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, প্রায় ½ ঘণ্টা পর সাক্ষাৎ হইল বাবাজি আমাকে প্রসাদ লইতে বলিলেন। আমি উত্তর করিলাম যে আমার মাতাঠাকুরাণী আমার আহারের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন; এমতাবস্থায় কি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারি? তিনি বলিলেন তাহাতে কোনও দোষ হইবে না, আর এই রাম ঘাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘাট আর কোথাও নাই। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সরযূতে স্নান তর্পণ শেষ করিয়া চাদরখানা পরিধান করিলাম, পরে প্রসাদ ভক্ষণ করিলাম। প্রসাদ খিচুরী ছাড়া আর কিছু নয়। পরে দেখিলাম ববাজী বিশ্রাম করিতেছেন একটা মোরাতে মাথা রাখিয়া মাদুরের উপর শয়ণ করিয়া আছেন। আমি আর তাঁহাকে বিরক্ত না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এবার আর বালুচড়ের মধ্য দিয়া হাটিবার সাধ্য নাই কারণ বালু এত গরম যে তাহাতে পা রাখিলে পায় ফোস্কা পরার মত যন্ত্রনা হয়। তাই সরযূর তীর দিয়া ভিজা মাটির উপর দিয়া হাটিতে লাগিলাম। রাম ঘাট হইতে স্বর্গদ্বার ঘাট প্রায় ১ মাইল হইবে। এইভাবে বাসায় ফিরিতে কোনও প্রকার কষ্ট হয় নাই। অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বেলা ১০টার পর আর খালি পায় হাটিতে পারা যায় না, বালু ও পাথর এত গরম

বোধ হয় যে, মনে হয় যেন পার তলা আগুনে পুড়িতেছে। এজন্যই সকলে জুতা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে ঘরে বানর ঢুকিয়া একখানা কাপড় চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছিল পরে তাহাকে কিছু খাবার দিয়া কাপড়খানা আদায় করা হইয়াছে। এই প্রকার চুরি অহরহই হইয়া থাকে। কিন্তু রাত্রিতে কোন উপদ্রব নাই।

আজ সন্ধ্যার সময় এক দল যাত্রী, পুরুষ একজন ও স্ত্রীলোক ৬ জন, বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আমাদের বাসায়ই থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন এখন আর রাস্তা খোলা নাই। গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছে কারণ গাড়োয়াল দেশে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ। শুনিয়াই আমাদের মনটা দমিয়া গেল। এখন নারায়ণ ভরসা। তাঁহাদের নিকট রাস্তার অনেক খবর পাওয়া গেল। একজন রেলের এসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার আজমির হইতে এখানে আসিয়াছেন, তিনি কাশী, গয়া, প্রয়াগ ও হরিদ্বার ঘুরিয়া ফিরিবেন। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম যে, তাহাকেও সেই ৫০৲ টাকার ভেট দেওয়ার প্রলোভন দেখান হইয়াছিল কিন্তু তিনি ব্যাপার সহজেই অনুমান করিয়া নিয়াছিলেন। অন্যান্য দেব মন্দিরে কোনওপ্রকার জোর জুলুম নাই দুই এক পয়সা করিয়া প্রণামী চড়াইলেই কাজ চলিয়া যায়।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—

সকালে একখানা এক্কা ভাড়া করিয়া বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ও কুণ্ড দর্শন করিতে রওনা হইলাম। এই স্থানটী আমাদের বাসা হইতে অনেক দূর বোধ হইল। এক্কাতেই প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়া গেল।

বশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং নিকটে একটী পাকা কূপও আছে। এসব এখন জীর্ণ অবস্থায়। নিকটেই এক সাধু পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, বাড়ীখানা বেশ ভাল হইয়াছে ইহাতে অনেক লোকের স্থান হইতে পারে। সন্নিকটে একজন সন্ন্যাসী একখানা কুঁড়ে ঘরে বাস করেন।

স্বর্গদ্বার ঘাটেই সকলে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান, দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকেন। ঘাট পাকা করিয়া বাঁধান। বর্ষার সময় এই পাকা ঘাটের সাহায্য নিতে হয়, আমরা যে সময় গিয়াছিলাম তখন ঘাট হইতে অনেক নীচে বালুচড়ের মধ্য দিয়া যাইয়া জলে নামিতে হইত। সকালে ও সন্ধ্যায় রামায়ত বৈষ্ণবগণ রাম ঘাটে বসিয়া মধুর রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যখন স্তোত্র পাঠ করেন তখন ইহা শ্রবণ করিলে মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উৎপন্ন হয় এবং মনপ্রাণ ভগবানকে অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। রাম নাম এখানকার সকল নগরবাসীর মুখে লাগিয়াই আছে। কি আশ্চর্য্য রাম নামের গুণ এমন মোহিনী শক্তি আর কোনও নামের মধ্যে আছে কি না জানি না। এই রাম নামের গুণেই পাথরও সাগরে ভাসিয়াছিল। রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই নগরবাসীদের মধ্যে বেশী। অযোধ্যাতে জৈন সম্প্রদায়েরও কয়েকটী মন্দির আছে। প্রতি বৎসর রাম নবমীর সময় এস্থানে মহাসমারোহের সহিত প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে তাহাতে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এ স্থানে বৈষ্ণবদের ছয়টী ছাউনি আছে, অর্থাৎ—

মুনিবাবার ছাউনি, মণিবাবার ছাউনি, তপেসিজির ছাউনি, (বড়) রঘুনাথ দাসের ছাউনি, রাম প্রসাদ দাসের ছাউনি ও রামশোভা দাসজীর

ছাউনি। সকল ছাউনিতেই বহু শিষ্য আছে। এক একটী ছাউনিতে বিরাট ব্যাপার।

আমাদের পাণ্ডা বিশেশ্বর রাম বাহাদুর ও তাঁহার গোমস্তা রাজ কিশোর বেণী প্রসাদ আমাদিগকে সকল সময়েই তত্ত্বাবধান করিয়াছেন এবং বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

বিকালে পাণ্ডা ঠাকুরকে ৬৲ টাকা দিয়া পদধুলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আর আপত্তি করিলেন না। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া আমরা ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। এবার আর এক্কা কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী নয়। একটা গরুর গাড়ীর মত গাড়ী কিন্তু ইহা মানুষে টানিয়া নেয়, ইহাতেই আমরা বেশ আরামে গিয়াছিলাম। ষ্টেশনে দেখি অনেক লোক ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমরা প্লেটফরমে ঢুকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বারেন্দায় একখানা বিছানা করিয়া শান্তিকে শোয়াইয়া রাখিলাম। দেখিলাম একজন বাঙ্গালী একস্থানে প্লেটফরমের উপর একখানা কাপড় বিছাইয়া শয়ন করিয়া আছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম যে তিনি বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়াছেন এখন কাশী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনিও বলিলেন যে রাস্তা গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু রামনগর হইয়া যাওয়া যায়, তথায় পুলিশ নাই। খরচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে বদরিকাশ্রমে পাণ্ডাকে সোণার ঘড়ি চেন ও নগদ ১২৫৲ টাকা দিয়া মাটি খরিদ করিয়া দিয়াছেন এবং এক জোড়া নূতন বুটজুতা কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন তাহাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে লবণ ভাতই খাইতে হইয়াছিল কোথাও তরকারী পাওয়া যায় না, আর ডালও সিদ্ধ হয় না। আমাদের কিন্তু এত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। জঙ্গলের

তরকারী দিয়াই আমরা বেশ আনন্দে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছিলাম; সে কথা পরে বলিব। রাত্রি একটার সময় গাড়ী আসিল ষ্টেশনে আমাদের অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অযোধ্যা ছাড়িয়া কিছু সময় পরেই আমরা ফয়জাবাদে পৌছছিলাম। এখানেও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে কিন্তু আমরা আর নামিলাম না। পর দিবস সকালে লক্ষ্ণৌ পৌঁছছিলাম।

লক্ষ্ণৌ

যে স্থান এক সময়ে নবাবী আমলে অমরাবতী ছিল সেই স্থানে আসিয়া আমরা সকালে আটটার সময় পৌছছিলাম। ষ্টেশনটী খুব বড় ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম লালা ছেদিলালের ধরমশালা খুব ভাল; আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বিতলে ঘর ভাড়া করিলাম, এক তালাতে ভাড়া লাগে না। উপরের তালায় রোজ এক টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হয়। একখানা বসিবার ঘর, একখানা শয়ন ঘর ও ছাদের অপর দিকে রান্না ঘর, পায়খানা ও জলের কল আছে। ঘরে গলিচাবিছান, চেয়ার টেবিল ও নেওয়ারের খাট আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্য পশ্চিমে দুই শ্রেণীর ঘর আছে ধর্ম্মশালা ও সরাই; ধর্ম্মশালাতে ভাড়া লাগে না, সদাশয় ও পরদুঃখ কাতর ধনীগণ বহু অর্থ ব্যয়ে বড় বড় ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। আর সরাইয়ে ভাড়া নেওয়া হইয়া থাকে। দরিদ্র অথবা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরাই-গুলি সাধারণতঃ অপরিষ্কার। তাহাতে ভদ্রলোক থাকিতে পারে না। আমরা বাজার হইতে চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া রান্না করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া সহর ভ্রমণে বাহির

হইলাম। ঘণ্টা হিসাবে টঙ্গার বন্দোবস্ত করিলাম। মোটের উপর দুই টাকা লাগিল। ১০॥ টার সময় বাহির হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সমস্ত দর্শন করিলাম তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে দিলাম।

লক্ষ্ণৌ গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার জন প্রবাদ যে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার সময় লক্ষ্মণকে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ এইস্থানে স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ নামানুসারে লক্ষ্মণপুর রাখিলেন। পরে কালক্রমে লক্ষ্মণপুরই অপভ্রংশ হইয়া লক্ষ্ণৌতে পরিণত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময়েও এইস্থানে রাজধানী ছিল এবং ইংরাজ রাজত্বের সময়ও এই স্থানের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌ তাহাদের একটী কেন্দ্রস্থল ছিল।

রেসিডেন্সি—প্রথমেই আমরা রেসিডেন্সি দেখিতে চলিলাম। এখন ইহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময় যত গোলাগুলিতে নিরীহ প্রাণীদের জীবনলীলা শেষ হইয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। নবাব সাদৎআলি খান ১৮০০ খৃঃ অঃ এই রেসিডেন্সি তাঁহার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে এইস্থানে ঢুকিতেই Bailey guard gate দৃষ্টি পথে পড়ে এবং কর্ণেল বেলির নাম অনুসারে ইহার নাম হইয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মচারী ছিলেন। রাস্তার দক্ষিণ দিকে রেসিডেন্সি গৃহ। যখন সিপাহীরা নানা স্থান হইতে এই স্থান আক্রমণ করে তখন বিখ্যাত সার হেন্‌রি লরেন্স রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি এস্থানে সকল ইংরাজ নরনারীগণকে প্রায় ৬ মাস সময় আশ্রয় প্রদান করতঃ বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই ১৮৫৭ খৃঃ অঃ ৮ইঞ্চি শেল দ্বারা তিনি আহত হন; এই শেল খিড়কি দিয়া ঢুকিয়া ফাটিয়া যায়। আহত হওয়ার পরে ডাক্তার ফেয়ার

সন্নিকটস্থ তাঁহার গৃহে নিয়া যান কিন্তু তাঁহাকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না। তাঁহার বাস ভবনে এখনও গোলাগুলির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। স্ত্রীলোকগণকে তোষাখানাতে রাখা হইয়াছিল কিন্তু এখানেও একটা গোলা আসিয়া জনৈক রমণীর মাথা উড়াইয়া দিয়াছিল। সেই গোলার দাগ এখনও সেই স্মৃতি উদয় করাইয়া দিতেছে। হেনরী লরেন্সের সমাধির উপর লিখা আছে—"Here lies Henry Lawrence, who lived to do his duty." রেসিডেন্সির নিকটে—watch tower অর্থাৎ এখানে থাকিয়া দূরবিক্ষণের সাহায্যে শত্রুদলের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করা হইত।

তারখানা মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত কুঠরি এখানে স্ত্রীলোক ও ছেলেপেলেরা আশ্রয় নিয়াছিল। তারখানার উপরের কুঠরিতে রেসিডেন্সির সমস্ত স্থান ও সকল ঘরের নক্সা সম্বলিত একটী মডেল রক্ষিত আছে। আমরা গরমের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন তারখানাতে ঢুকিলাম তখন বেশ আরাম বোধ হইয়াছিল। আমাদের গাইড সমস্ত স্থান দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিল। লোকটী বেশ অমায়িক। আমাদের খুব পিপাসা লাগিয়াছিল নিকটে একটী পাকা কুয়া আছে কিন্তু আমাদের সহিত ঘটি কিম্বা রসি না থাকাতে গাইডকে বলিবামাত্র সে আগ্রহ সহকারে জল উঠাইয়া দিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিল। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে তিনি ব্রাহ্মণ কাজেই আমাদের জলপান করিতে আর কোন আপত্তি থাকিল না। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দর্শনি দিয়া আমারা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মচ্ছিভবন—যে উচ্চভূমিতে এখন কিং জর্জ মেডিকাল কলেজ নির্ম্মাণ হইয়াছে তথায় পূর্ব্বে কেল্লা ছিল এবং সন্নিকটস্থ উচ্চ ভূমিকে লক্ষণ টিলা বলে। ইহার উপর আওরেঙ্গজেবের নির্ম্মিত একটী

মসজিদ্ আছে। আমি আর একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। রেসিডেন্সি দর্শন করিবার পূর্ব্বে আমরা যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম কিন্তু সে সময় উহা বন্ধ ছিল, পরে ফিরিবার কালিন আমরা দেখিয়াছিলাম।

ইমামবাড়া—ম'চ্ছভবনের নিকটে নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার ইমামবাড়া। ইমামবাড়া শব্দের অর্থ "Patriarch's place" আউধের শিয়া মুসলমানেরা এই নাম দিয়াছেন। কি বিরাট ভবন! ১৭৮৪ খৃঃ অঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; সেই সময় নরনারীগণের সাহায্যার্থে এই সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সব লোক দিনে কাজ করিলে লজ্জাবোধ করিতেন তাহারা রাত্রিকালে কাজ করিয়া পারিশ্রমিক পাইতেন। এই বিরাট ভবন দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহার গঠন ও তেমনি দৃঢ়। ইহার প্রাচীরের বেধ ১২ ফিট, একটী প্রকোষ্ঠ ১৬৩×৫৩ ফিট এবং উচ্চতা ৪৯ ফিট। এই কক্ষের দুই পার্শ্বে অষ্টভুজ কক্ষ আছে, উহার ব্যাস প্রায় ৫৩ ফিট। কক্ষের ঊর্দ্ধভাগে লাল পাথরের নির্ম্মিত বারেণ্ডা আছে। সমস্ত দ্বিতলটী একটি গোলক ধাঁধা, একবার প্রবেশ করিলে পথপ্রদর্শক সঙ্গে না থাকিলে পুনরায় বাহির হইবার আশা একপ্রকার অসম্ভব। প্রবাদ এই যে নবাব অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের সহিত লুকাচুরি খেলিতেন। মধ্যের বৃহৎ কক্ষের মধ্যে নবাব অসফ্‌উদ্দৌলা চির-নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন এবং সমাধির চতুর্দ্দিগে রৌপ্য নির্ম্মিত রেলিংদ্বারা বেষ্টিত। আর সম্মুখে সোণার ও নকল পাথরে শোভিত পাগড়ি আছে। এখানে কতকগুলি ঝাড় এবং সুবৃহৎ ইমাম্‌বাড়ার সম্মুখে একটী ছোট ইমামবাড়া আছে। ইহাকে হোসেনাবাদ ইমামবাড়া বলে, ইহা মহম্মদ আলী সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহরমের সময় ইমামবাড়াতে আলোক মালায় পরিশোভিত হয়।

রুমিদরজা—অথবা Turkish Gate. ইমামবাড়ার পশ্চিম ধারের তোরণের নাম। এই রুমিদরজার উচ্চতা ৬০ ফিট। ইমামবাড়া এবং রুমিদরজা একই সময়ে দুর্ভিক্ষপ্রপিড়িত নরনারীদিগকে রুটি দেওয়ার জন্য নির্ম্মাণ হইয়াছিল।

হোসেইনাবাদপার্ক—এখানে Clock tower এবং Picture Gallery আছে)। এই ঘড়ির মন্দির ১৮৮১ ইং তৈয়ার হইয়াছে—এবং Picture Galleryতে আউধের নবাবদের তৈলচিত্র আছে। এই গৃহের নিম্নেই একটী পুকুর আছে তাহার পাড় সব বাঁড়ান।

হোসেনাবাদের ইমামবাড়া (The Palace of light)—

আউধের তৃতীয় নবাব মহম্মদ আলী শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সংলগ্ন একটী উদ্যান আছে তাহাতে তাজ মহলের অনুকরণে একটী ছোট তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই তাজের দক্ষিণ ধারে মসজিদ আছে। এই ইমামবাড়ার প্রাঙ্গণের পশ্চিম ধারে একটী অট্টালিকা আছে, তাহার নাম ইমামবাড়া সৌধ। এখানে মহম্মদ আলী শাহ ও তাঁহার মাতা চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন। এই ইমামবাড়া তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং পার্শ্বে আরও ছোট ছোট কক্ষ আছে। মধ্যের হলটী খুব বৃহদাকার অভ্যান্তরিণ প্রকোষ্ঠের ভিত্তি খুব উচ্চ এবং তাহাতে রৌপা নির্ম্মিত একটী তাজিয়া আছে। পার্শ্বের কক্ষের মধ্যে আরও তাজিয়া আছে তাহা মোম ও কাঠের নির্ম্মিত এবং প্রতি বৎসরই ইহা নূতন করিয়া তৈয়ার করান হয়। মেজে শ্বেত ও কাল প্রস্তর নির্ম্মিত। ছাদ এক মিলানে প্রস্তুত; উপরে একটী গিল্টি করা গম্বুজ আছে তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। মধ্যের হলঘরটী একতালা অপর স্থান দ্বিতল। এই দ্বিতলে অনেক প্রকোষ্ঠ এবং

হলের মধ্যে কার্য্যাবলি পরিবেক্ষণ করার জন্য ছোট ছোট খিরকি আছে—তথায় বেগমেরা বসিয়া সকল কার্য্যাবলি দর্শন করিতেন। এই ইমামবাড়ার মাসিক আয় দেড় লক্ষ টাকা। এই ইমামবাড়াও আসফ্‌উদ্দৌলার ইমামবাড়া রক্ষণের জন্য এবং দান ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবাব মহম্মদ আলী শাহ ৩৬ লক্ষ টাকা ট্রাষ্টির হাতে রাখিয়া গিয়াছেন।

জুম্মামস্‌জিদ্‌—হোসেনাবাদ ইমামবাড়ার পশ্চিমে অবস্থিত। মহম্মদ আলী শাহ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে বেগম মুল্কা জেহান কর্ত্তৃক ইহার কার্য্য সমাধা হয়।

ভিক্টোরিয়া পার্ক—এখানে ভিক্টোরিয়ার একটী ব্রঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা লক্ষ্ণৌর মিউনিসিপালিটী তৈয়ার করিয়াছিল।

চক অথবা সহরের বাজার—বাজারের রাস্তা এতই অপরিসর যে দুইখানা গাড়ী পাশাপাশিভাবে যাইতে পারে না। অপরাহ্ণ ২টার পর তথায় গাড়ি যাইতে পারে না—দর্শকেরা হাঁটিয়া এই স্থান দর্শন করিয়া থাকে।

কেইশরবাগ—একটী সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বিতল অট্টালিকাশ্রেণী অবস্থিত। এই সকল গৃহে নবাব ওয়াজাদআলীর বেগমেরা বাস করিত।

এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত একটী সুবৃহৎ অট্টালিকাকে "বারদারী" বলে। ওয়াজাদ আলী সাহ এই ভবন ৮০ লক্ষ মুদ্রা ব্যায়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং প্রমোদভবনরূপে ব্যবহার করিতেন। এখন এখানে সাধারণের সভা সমিতি হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব দ্বারের ফটককে লাখী দরজা বলে অর্থাৎ এই দরজা নির্ম্মাণ

করিতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিগের অট্টালিকায় বিভিন্নদেশীয় রূপসীগণ পত্নীরূপে বাস করিতেন। খোঁজা ও স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। নবাবের প্রায় তিনশত পত্নী ছিল। ইহাদের সহিত সর্ব্বদাই বিলাসে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার এ প্রকার বিলাসিতা আমরা এমন কল্পনাও করিতে পারি না। আর তাঁহার রাজ্যনাশের হেতুই এই বিলাসিতা। বারদ্বারীর উত্তর ধারে লক্ষ্ণৌর যাদুঘর।

লাখদরজার সম্মুখে কইসর-পছন্দ বা রোসন-উদ্দৌলা নামক একটী সুন্দর অট্টালিকা। ইহার সম্মুখে "শেরদরওয়াজা" নামক সিংহদ্বার। সিপাহী বিদ্রোহের সময় নীল নামক একজন সেনাপতি আহত হইয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজেরা ইহাকে "নীলদ্বার" বলেন।

যাদুঘর—এখানে আসামের ডফলাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সেই সুদূর আসামের কথা মনে পড়িল। অপর দিকে নবাব সাদতআলী খান ও তাহার পত্নীর **সমাধি মন্দির**,—তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নীল দ্বারের পূর্ব্বদিকে সাম্রাজ্ঞি **ভিক্টোরিয়ার মার্বল পাথরের প্রতিমূর্ত্তি।**

ছত্রমঞ্জিল—এই প্রাসাদ নসীরউদ্দিন হাইদার কর্ত্তৃক তাঁহার বিবাহিতা পত্নীগণের বাসের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার চূড়াতে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছত্র আছে বলিয়াই ইহাকে ছত্রমঞ্জিল বলে। এখন এখানে united service club (ক্লাব ঘর)। ইহার প্রাঙ্গনের মধ্যে আরও অনেক ঘর আছে। ছত্রমঞ্জিলের সন্নিকট লাল বারদ্বারী সাধারণের পুস্তকাগাররূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

মতিমহাল—ছাদের খিলানের কোনও কারুকার্য্যের জন্য মতিমহাল নাম হইয়াছে কিন্তু এখন আর সেই সব কারুকার্য্য নাই—মতিও নাই সে হিরাও নাই! নবাব সাদৎআলী খান নদীর পারে যে সব প্রাসাদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা তারই অন্যতম। এই প্রাসাদের সম্মুখে বন্যজন্তুর মল্লযুদ্ধ হইত। পরে সিপাহীবিদ্রোহের সময় ১৭ নবেম্বর ১৮৫৭ ইং তারিখে এই স্থানের উপর গোলাগুলি চলিয়াছিল। এখন ইহা বলরামপুরের মহারাজার সম্পত্তি।

সাহনজাফ—গাজিউদ্দিন হাইদার তাহার সমাধির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সেকেন্দার বাগ—নবাব ওয়াজিদআলী খাঁ তাঁহার এক পত্নীর জন্য এই উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রায় ২০০০ সৈন্য এইস্থান অধিকার করিয়া ৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। পরে অবরোধিত হইয়া সকলে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। প্রাচীরে এখনও গোলার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া বেনারসী বাগ, লামার্টিনিয়ার কলেজ, দিলকুসা প্রাসাদ, আলম বাগ, সাত খণ্ড (একটী অসম্পূর্ণ অট্টালিকা), মচ্ছিভবন দুর্গ, উইঙ্গফিল্ড পার্ক, লৌহসেতু, হজরৎবাগ, ক্যানিং কলেজ, গোরস্থান, বেলিগার্ড, ফারহাৎ বক্স, হুজুর বাগ বিবিয়াপুর প্রভৃতি প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য।

আমরা এসব স্থান দর্শনান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ধরমশালায় ফিরিলাম। দরজাতে তালা লাগান ছিল কিন্তু দরজা খোলার পর আমার হাতব্যাগটী খুলিতে গিয়া দেখি ব্যাগ আর খোলে না। তখন মনে সন্দেহ হইল যে কেহ ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিতে গিয়া বোধ হয় ব্যাগের তালাটী নষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তখন ব্যাগটী হাতে করিয়া রাস্তায় বাহির

হইয়া পড়িলাম দেখি কোনও মিস্ত্রীকে দিয়া খোলাইতে পারি কিনা। নিকটেই রাস্তার উপর একজন কারীগর ছিল সে তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল তখন দেখিলাম কিছুই অপহৃত হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া তালা ঠিক করাইয়া নিলাম। পরে ব্যাগটী বাসায় রাখিয়া বাজারে বাহির হইলাম।

আবশ্যকীয় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া যখন রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ধরমশালাতে ফিরিলাম তখন শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত দিবস দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছিল, বিশ্রামের সময় পাই নাই—তাহা ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম ও গত রাত্রির অধিকাংশ সময়ই জাগরণ করিতে হইয়াছিল এই সব কারণে অবসন্নদেহে আহারাদি করিয়া ধরমশালার বারেন্দায় বিছানা করিয়া শয়ন করিলাম। প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম।

লক্ষৌতে কি দেখিলাম? দেখিলাম নশ্বর জগতের স্মৃতিচিহ্ন কালের পরিণাম, কামিনীকাঞ্চনের রঙ্গভূমি আর দেখিলাম অনিত্য সংসারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কয়জন লোক পর কালের ব্যবস্থা করিয়া থাকে? প্রতিদিন দিনমণির উদয়ে আমরা কতই কল্পনা জল্পনা করিয়া থাকি, কতই ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কতই আশাভরসা করিয়া থাকি, কিন্তু দিনের পর যখন নিশার ক্রোড়ে হতচেতনবৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকি, তখন সে সব সংকল্প যে কোথায় চলিয়া যায় তাহার তত্বের আর কি কোন জ্ঞান থাকিতে পারে? প্রতিদিন নিদ্রার সময় সমুদয় বাহ্যবস্তুর বিয়োগ ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিয়াও আমরা নিত্য ও অনিত্য বস্তু চিনিতে পারিতেছি না! পার্থিব ভাব বিস্মৃত করিয়া দিন যাপন করা মানবের একমাত্র লক্ষ্য

বলিয়া বুঝা যায়। দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই প্রধান উদ্দেশ্য এবং বাহ্যিক উন্নতি সাধনই প্রধান ব্রত; নানাবিধ ভাব বর্দ্ধিত হইলে তাহাতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কাজেই আর আত্মার উন্নতি সাধনে কেহ কোনও প্রকার কার্য্য করিয়া সুবিধা পায় না। কামিনীকাঞ্চনের প্রভাবে পরপারের রাস্তা কেহই পরিষ্কার করিতে পারে না। সুখের অন্বেষণে সকলেই ঘুড়িয়া বেড়ায়। জীবনের দিনগুলি শান্তিতে কাটাইবার নিমিত্ত সকলেই আগ্রহ করে। কিন্তু যখনই সংসারে সুখান্বেষণ করিয়া ক্লান্ত বোধ হয় তখনই শান্তির জন্য স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়, আর তখনই ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত হয়।

লক্ষ্ণৌর নবাবগণ যখন বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহারা যদি একবারও পরকালের চিন্তা করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা নির্লিপ্ত সংসারীর অভিনয় করিয়া যাইতে পারিতেন এবং জগতের কত ইষ্ট হইত তাহা বলা যায় না। আসল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা শুধু বিলাসিতার প্রমোদ কানন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নৈমিষারণ্য

১৯ জ্যৈষ্ঠ—

সকালবেলা ৭½ টার সময় লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১১ টার সময় নিমসার ষ্টেশনে পৌঁহছিলাম। আমাদিগকে বালামৌ ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল। নৈমিষারণ্য ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে আমরা হাটিয়া আসিলাম, কঙ্করের রাস্তা ও বালিরাশির উপর দিয়া হাটিতে মাতাঠাকুরাণীর কিছু কষ্ট হইয়াছিল কারণ এই গরমের দিনে এ সব স্থান এত গরম হইয়া যায়

যে তাহার উপর দিয়া খালিপায় হাটিতে যেন ফোস্কা পড়ে। শান্তি ও আস্তে আস্তে হাটিয়া আসিল। বালামৌ জংসনে আমাদিগকে এক বৃদ্ধ পাণ্ডা পাকরাও করিয়াছিল, আমি বলিলাম যে পাণ্ডার দরকার নেই কিন্তু এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এপ্রকার নরম স্বভাব ও ভদ্রব্যবহার যে তাঁহাকে আর এড়াইতে পারিলাম না, সে যাহাই হউক পাণ্ডা থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধাও হইয়াছিল। এই পাণ্ডাঠাকুরের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে, তাঁহার নাম বিষ্ণুর পাণ্ডা টেরা ডাণ্ডা, তাঁহার হাতে একগাছা অষ্টবক্র বংশযষ্টি আছে তাই তাঁহার নাম টেরা ডাণ্ডা। এখানে ইষ্টক ও প্রস্তরের নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে, ২।৩ বৎসর হইল তৈয়ার হইয়াছে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উপরে ও নীচে অনেকগুলি কুঠরি আছে। চরিধারে প্রকোষ্ঠ ও মধ্যে পাথরের বাঁধান বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। জলের জন্য একটী পাঁকা কূপ আছে। মোটের উপর ইহা একটী প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়ী। বন্দোবস্তও উত্তম। রান্না ভিন্ন ঘরে করিতে হয় এবং তাহারও ভাল বন্দোবস্ত আছে।

ধর্ম্মশালার বাহিরের দিগেও প্রকাণ্ড বারেন্দা আছে; তথায় অনেক যাত্রী থাকিতে পারে। দেখিলাম পায়খানার বন্দোবস্তও সুন্দর—দ্বিতলে ও একতালায় উভয় স্থানেই পরিষ্কার ঘর।

রেল হওয়ার পূর্ব্বে এখানে লক্ষ্ণৌ হইতে গোযানে অথবা হাটিয়া আসিতে হইত। বাঘাউলি হইতে ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধান।

পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে ধর্ম্মশালায়ই বরাবর নিয়া আসিলেন। আহারাদির জন্য সব জিনিষপত্র গ্রামের দোকান হইতে খরিদ করিয়া আনিয়া দিলেন। আজ একাদশী বিধায় আমরা কিছু জলযোগ করিলাম। আর শান্তির জন্য পাণ্ডা নিজের ঘর হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন, ডাইল, ও আলুর তরকারী রান্না করাইয়া নিয়া আসিলেন।

বিকালে আমরা ললিতা দেবী দর্শন করিয়া আসিলাম—অদূরেই তাঁহার মন্দির। শান্তি হাটিয়াই এ সকল দর্শন করিল। ধর্ম্মশালার সংলগ্ন আমবাগান আর বালুকারাশি, চতুর্দ্দিকে কেবলই বালি, স্তূপাকারে বালি আর তাহার মধ্যেই আম্রকানন। এখানে হাজার হাজার আম্র বৃক্ষ আছে।

রাত্রিতে কুঠুরির ভিতর আমাদের জিনিষপত্র রাখিয়া তালা দিলাম এবং সংলগ্ন খোলা বারেন্দায় বিছানা করিয়া শয়ন করিলাম। বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল।

দিনের বেলা অত্যন্ত গরম আর রাত্রিতে কেমন স্নিগ্ধ ও আরামজনক। যখন মধ্যে মধ্যে মৃদু হওয়া আসিতে লাগিল তখন আরও স্নিগ্ধ হইতে স্নিগ্ধতর বোধ হইতে লাগিল। এ দেশে ঘরের মধ্যে কেহই গরমের জন্য শয়ন করিতে পারে না, সকলেই চারপা বিছাইয়া বাহিরে অথবা বারেন্দায় শয়ন করে। মশা না থাকাতে আর মশারির দরকার হয় না। দেখিলাম এখানেও অযোধ্যার ন্যায় অনেক বানর।

২০ জ্যৈষ্ঠ—

সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত সমাপন করিতে না করিতেই পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা গোমতি নদীতে স্নান করিতে রওনা হইলাম ধর্ম্মশালা হইতে নদী প্রায় ½ মাইলের উপর হইবে। যাহাকে নদী বলিতেছি ইহা আমাদের দেশের পদ্মা ও গঙ্গার ন্যায় নহে। ইহা একটী ছোট খাল বিশেষ, জল খুব পরিষ্কার। নদীর কিনারায় তরমুজ ও খরমুজার ক্ষেত। স্নান ও তর্পণ করিয়া দেবদর্শন করিলাম। হনুমান, পঞ্চপাণ্ডব, মহাদেব ও রামসীতার মূর্ত্তি আছে—উচ্চ ভূমিতে এই সব অবস্থিত। যেখানে মহামুনি মহর্ষি ব্যাস দেবের

আশ্রম ছিল সেই স্থানটী অত্যন্ত মনোহর, নিকটে অনেক আমগাছ আছে আর স্থানটী খুব নির্জ্জন ও নদীর পারেই অবস্থিত। দধীচি মুনির আশ্রমের স্থানও বেশ নির্জ্জন। এখন আর কিছুই নাই কেবল মাটির স্তূপ ও ছোট ছোট কিছু জঙ্গল এবং একটী ছোট মন্দির আছে। বৃত্রসংহার সময় ইন্দ্র দেবগণ সহ দধীচিমুনির নিকট যাইয়া বজ্র নির্ম্মান করিবার জন্য অস্থি পার্থনা করায় মুনিবর বলেন, "দেবরাজ! আমি নিজ অস্থি তোমাকে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি; কিন্তু কিছু দিনের জন্য অবসর দেও, আমি একবার তীর্থ পর্যাটন করিয়া আসি, কারণ আজও আমার তীর্থপর্য্যটন শেষ হয় নাই।" ইন্দ্র বলিল "হে তপোধন! আর আপনার তীর্থপর্য্যটন আবশ্যক নাই; আমি পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থই এখানে আনায়ন করিয়া দিতেছি" এই কারণে নৈমিষারণ্যে যাবতীয় তীর্থই বিদ্যমান। পঞ্চপ্রয়াগও এখানে বিদ্যমান।

ইহা ছাড়াও এখানে বিশ্বনাথ, গোবর্দ্ধন নাথ মহাদেব, অন্নপূর্ণা, ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি আছে। সোনার কূপ, গোদাবরী, শৃঙ্গমুণির ও সূত মুনির আশ্রম আছে।

এখানে একটী কুণ্ডও আছে ইহাকে পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ড বলিত কিন্তু এখন নৈমিষারণ কুণ্ড বলে। কুণ্ডের চারিধার পাকা বাঁধান ও পারে মহাদেবের মন্দির। এখানে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিলাম। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে তাঁহার হস্তের চিহ্ন কিছুতেই উঠে নাই পরে এই কুণ্ডে প্রক্ষালন করায় দাগ উঠিয়া যাওয়ায় এই বর দেন যে এই কুণ্ডে যে কেহ স্নান করিবে তাহারই সর্ব্বপাপ মুক্ত হইবে। এই নৈমিষারণ্যে গরুড় গজ-কচ্ছপ লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। অনেকে বলে এইস্থান বায়ান্ন পীঠের মধ্যে একটী পীঠ স্থান।

স্থানটী অত্যন্ত মনোহর এবং জলহাওয়া খুব ভাল, আশে পাশে অনেক

আম বাগান। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটী উচ্চ মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম তথায় মহাদেব আছেন আর একজন সাধু তথায় বাস করেন। আমরা আর সেখানে যাইতে পারি নাই।

বাসায় ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইয়াছিল এবং শান্তিরও অনেক কষ্ট হইয়াছিল সে বারংবারই বলিতে লাগিল "বাবা! ক্ষুধা লাগিয়াছে"। মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—

অত্যন্ত গরম পরিয়াছে—আমরা গোমতীতে স্নান ও তর্পণ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম আর আহারাদি করিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় ষ্টেশনের দিগে রওনা হইলাম। রাস্তায় গরমের জন্য মাতাঠাকুরাণী পায়ের তলাতে কতকগুলি কাপড় বান্ধিয়া নিলেন। পাণ্ডাঠাকুরকে বিদায় করা কালীন অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। আমি অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি কিন্তু তাঁহার মত এপ্রকার মিতভাষী ও বিনয়ী পাণ্ডা দেখিলাম না। অল্পতেই সন্তুষ্ট এবং কিসে আমারা সুখী হইব সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা। আমি তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি। এই নৈমিষারণ্যেও বানরের অনেক উপদ্রব দেখিলাম—ঘরের দরজা খুলিয়া বসিবার উপায় নাই। রান্না ঘরের খিড়কির মধ্যে লোহার শিক অথবা জাল দেওয়া নচেৎ আর রক্ষা ছিল না।

আমরা নৈমিষারণ্যে আসিয়া দেখিলাম যে গ্রামের নানাস্থানে—রাস্তার ধারে আমবাগানের মধ্যে ধর্ম্মশালার নিকটে প্রভৃতি স্থানে

ছোট ছোট চালা ঘর তৈয়ারি হইতেছে। ঘর ত ভারি ২ খানা করিয়া ঘরের বেড়া ছোট ছোট খুটার উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বেড়াও নাই ভিটিও নাই। ২।৪ জন বসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না। এইপ্রকার বিস্তর চালা ঘর উঠাইতেছে। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে, এখানে মেলা হইবে কারণ আগামী সোমবার ২০শে জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা, অক্ষয়া (মৌণী) স্নান। দূরদূরান্তর হইতে গ্রাম্য লোকেরা নানাবিধ জিনিষ পত্র নিয়া আসিতেছে। পুলিশেরও আমদানী হইয়াছে। আমরা ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম যে অনেক লোক রেলে আসিয়াছে এবং জিনিষ পত্রও স্তূপাকারে রহিয়াছে।

ধর্ম্মশালাতে নীচের তালায় যে সব লোক ছিল তাহার মধ্যে একজন রাজপুত রমণী, বয়স প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর হইবে, কথায় কথায় বলিল যে সে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম গিয়াছিল। শুনিয়া প্রাণে বল আসিল। তাঁহার নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নিলাম এবং রাত্রিতে অবসর মত বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী শ্রবণ করিতাম। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে একজন ব্রাহ্মণ নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেন দক্ষিণা স্বরূপ তাহাকে চারি আনা পয়সা দেওয়াতেই খুব খুসী হইল।

আমরা হরিদ্বারের টিকেট খরিদ করিলাম। নিমসার হইতে বালামৌ ষ্টেশনে আসিয়া আমরা অন্য গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ হইতে যে গাড়ী আসিল তাহাতে উঠিয়া পর দিবস সকালে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

বালামৌ হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এক রকম ভালই ছিলাম পরে সাজাহানপুর, বেরিলি ও মুরাদাবাদ ষ্টেশন হইতে এত লোক গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ করিল যে বসিবার স্থানের

অভাবে অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিল। পরে শেষ রাত্রিতে এক ষ্টেশনে গাড়ীতে জায়গার জন্ত কতকগুলি লোক প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতি পর্য্যন্ত আরম্ভ করিল। বেগতিক দেখিয়া আমি শান্তিকে কোলে করিয়া রহিলাম। ট্রেন যখন গঙ্গার উপর দিয়া সেতু পার হইতেছিল তখন যাত্রীগণ "জয় গঙ্গামায়িকী জয়" বলিয়া ঘন ঘন ধ্বনি করিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইতে হইল। মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে রাত্রি ভোর হইবে এবং আমরা হরিদ্বার পৌছিব। সকালে আমরা যখন হরিদ্বার পৌছিলাম তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে, বোধ হইল প্রকৃতি হাঁসিতেছে। সূর্য্যোদয়ের সময় পাহাড়ের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। ষ্টেশনের অপর ধারেই পাহাড় আর দূরে গঙ্গার অপর পারের পর্ব্বতমালা আলো ও ছায়ার অভিনব বিকাশ করিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল। এই সব সৌন্দর্য্যের উপর মনোনিবেশ করিবার অধিক সময় পাই নাই।

হরিদ্বার

ট্রেন হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহির হইতেই অনেক পাণ্ডা আসিয়া ঘেড়িয়া ধরিল। আমি বলিলাম আমার পাণ্ডা আছে, তাঁহার নামটী আমার স্মরণ হইতেছে না কিন্তু দেখিলেই চিনিতে পারিব। তবুও আমার অব্যাহতি হইল না। একজন পাণ্ডা আমাদের টঙ্গার সঙ্গেই চলিল। ষ্টেশনে ও রাস্তায় লোকে লোকারণ্য গাড়ী পাওয়াও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একখানা টঙ্গা মিলিল, আর ভাড়াও দ্বিগুণ দিতে হইল। বাসস্থানের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন সূরজমল ঝুন ঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিতেছি

তখন একজন প্রবীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন "কোথাও স্থান পাইবেন না সব ঘরবাড়ী ভর্ত্তি হইয়া গেছে, আমি যেখানে থাকি তথায় দ্বিতলে কুটুরী খালি আছে ভাড়া রোজ এক টাকা করিয়া লাগিবে"। আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস না করিয়া ধর্ম্মশালার অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও স্থান মিলিল না। পরে তাঁহার কথা মতই তাঁহার বাসস্থানে চলিলাম। দেখি সত্যই ঘর খালি আছে। কুটুরী ঠিক করিয়া মাতাঠাকুরাণী ও শান্তিকে গাড়ী হইতে নিয়া আসিলাম। এই বাড়ীটা গঙ্গার পারেই অবস্থিত এবং আমাদেরও বিশেষ সুবিধা হইল। ঐ ভদ্রলোকটী বলিলেন "আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই আপনাদের সঙ্গে এখন যাইতে পারিতেছি না।"

যখন তিনি বাসায় ফিরলেন তখন জানিতে পারিলাম যে ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভদ্রলোক হরিদ্বারে আসিয়া কলেরাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারই সংকারের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার মাতা স্ত্রী ও বড় ছেলে আছেন। শুনিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তবুও ভাবিলাম যে হরিদ্বারের মত স্থানে আসিয়া যাহার মৃত্যু হয় তাহার জন্য আর আক্ষেপ কি? ইহার কত পুণ্যের জোর। কারণ এ স্থান যে সপ্ত তীর্থের অন্যতম।

যথা—"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা।"

এই সব তীর্থস্থানে যাঁহার মৃত্যু হয় তাহার মুক্তির জন্য আর ভাবিতে হয় না, তবে কেন বৃথা আক্ষেপ। এই ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী বল্লভপুর (শ্রীরামপুর)। আর যে ভদ্রলোকটী আমাকে এখানে বাসস্থানের সংবাদ বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাড়ী ছত্র (শ্রীরামপুর)। এই সুদূর

প্রবাসে একজন বাঙ্গালী পাইয়া মনে অনেক বল হইল। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মাসাবধি যাবৎ এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহার অম্লশূলের ব্যারাম। মিরাটে তাঁহার বাসাবাড়ী আছে, তথায় তাঁহার জননী, স্ত্রী, ও ছেলেপেলে আছে। তিনি কমিসরিয়েটে কাজ করিতেন এখন পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। মাস মাস টাকা আসে আর তিনি ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না করিয়া খান। একজন সাধু তাঁহার বর্ত্তন কয়খানা ধৌত করিয়া কিছু জল আনিয়া দিয়া যায় তজ্জন্য তাহাকে মাসিক ৩।৪ টাকা দিতে হয়। আর জলেরও বিশেষ কষ্ট নাই কারণ গঙ্গা খুবই নিকটে। একডাকে এতগুলি বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম এখন হরিদ্বার সম্বন্ধে দু চারিটী কথা বলিব।

এই হরিদ্বার যুক্তপ্রদেশস্থ শাহারণপুর জেলার অন্তর্গত। বৈষ্ণবগণ ইহাকে "হরিদ্বার" এবং শৈবগণ "হরদ্বার" বলিয়া থাকেন। সহরটী শৈবালিক পর্ব্বতের পাদদেশে এবং যেখানে গঙ্গা পর্ব্বতমালা হইতে বহির্গত হইয়া সমতল ভূমিতে পতিত হইয়াছেন সেই স্থানের সন্নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় কনখলে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। অপর পারে চণ্ডী পাহাড় দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাদ্বার মন্দির ও হরি কি চরণ নামক স্নানের ঘাট এ স্থানের প্রধান তীর্থ। এই ঘাটের নাম বিষ্ণু ঘাট, প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মেলা হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত মেলাকে কুম্ভ মেলা বলে। যাত্রীগণ মেলার সময় মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কুম্ভযোগে স্নান করিয়া থাকেন। এই মেলার সময় সময় তিন লক্ষ পর্য্যন্ত লোকের সমাগম হইয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে যাত্রীরা আবশ্যকীয় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া শৈবতীর্থ কেদার নাথে

ও বৈষ্ণব তীর্থ বদরীনারায়ণে গমন করেন। অনেকের পাণ্ডা, কাণ্ডী ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত এখানেই হইয়া থাকে। হরিদ্বারের পাণ্ডারা ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে জোয়ালাপুর নামক স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

হরিদ্বারের নিকট মায়াপুর নামক একটী গ্রাম আছে। ইহাই হয়েন সাং কথিত—"ম-য়ু-লু"। এখানে মায়াদেবীর মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। অনেকে বলেন এই মূর্ত্তি দুর্গা বা শক্তির, আবার অপর কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর। এখানে বৌদ্ধ মূর্ত্তির নিদর্শনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এক সময়ে হরিদ্বার কপিল বা গুপিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ কপিল মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া যে irrigation canal চলিয়া গিয়াছে তাহা এখান হইতে কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তর্পণ ও কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদানই হরিদ্বারের প্রধান কার্য্য। এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ তাপ দূরীভূত হয়।

আমরা বাজার হইতে জিনিষপত্র আনাইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া আসিলাম পরে আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া শ্রীমদ্ ভোলা গিরির সহিত সাক্ষাৎ করিতে রওনা হইলাম। আমি শুনিয়াছি তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ তাই তাঁহার সাক্ষাৎলাভের জন্য এতটা আগ্রহ হইল। তাঁহার শিষ্যও অনেক এবং রোজই তাঁহার নামে পার্শ্বেল আসিতেছে, ফলফলারি ও নানাবিধ জিনিষপত্র তাঁহার শিষ্যেরা অনবরত প্রেরণ করিতেছেন। আমি বিকালে প্রথমে আমার পাণ্ডাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাঁহার নাম পান্নালাল কুন্দনলাল, তাঁহার আবাসস্থল আমার জানা ছিল তাই

তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সালের ভাদ্রমাসে যখন এখানে আসি তখন হরিদ্বারের কাজ করাইয়া দেওয়ার জন্ম ৩৲ টাকা চুক্তি হয় প্রথমেই এক টাকা দেই পরে হঠাৎ আমায় হরিদ্বার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেইজন্ম বক্রী দুই টাকা আর দিতে পারি নাই। সেই কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম এবং আগামী কল্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের ও কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। আমরা তিনজনে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরির সহিত সাক্ষাৎ করার জন্ম বিকালে রওনা হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহার আশ্রম খুঁজিয়া বাহির করিলাম। এইজন্ম অনেক রাস্তা হাটিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে শান্তিকে কোলে করিয়া নেই আবার মধ্যে মধ্যে সে হাটিয়া চলে—এই ভাবেই যাওয়া আসা করিলাম। তাঁহার আশ্রম পাকাবাড়ী এবং দ্বিতল, ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত কিন্তু তিনি সেখানে না থাকিয়া অতি নির্জ্জন ও সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটী ক্ষুদ্র আশ্রমে থাকেন। দেখিলাম তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া একখানা আরাম চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম—তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, বলিলেন "ইচ্ছা হয় এই চেয়ারে অথবা নীচে বসুন"। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে আমি বদরিকাশ্রম যাইতে পারিব কি না, তিনি বলিলেন সে ভগবানের ইচ্ছা যদি যাও তবে কয়েকজন লোকও সঙ্গে নিয়া যাবে। অন্যান্য আলাপের পর তিনি আমাকে একখানা "সদাচার" নামক ছাপান কাগজ দিলেন আর বলিয়া দিলেন যে এইখানা বাঁধাইয়া ঘরে টানাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবার সময় ভূমিকে প্রণাম করিতে বলিলেন। কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় আমার মাতাঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ "মা হায় মা কি হায়" এবং দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে অনুমতি করিলেন। আমি তাহাই করিলাম। ইতি মধ্যে দুই জন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিতও হাসিয়া হাসিয়া অনেক আলাপ করিলেন। দেখিলাম ব্রহ্মচারী বাঙ্গালা, হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষা বলিতে বিশেষ অভ্যস্ত। তাঁহার স্বরও ঠিক পাঞ্জাবীদের মতনই হয়। আমি তাঁহাকে তাঁহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। তাঁহার যে বয়স তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক কম দেখায়। দেখিতে ৬০ বৎসরের উপর বোধ হয় না কিন্তু বয়স প্রায় শতাব্দির নিকট। দাড়ী ও গোঁফ কামান, চোখে রঙ্গিন চসমা আছে। এক চক্ষু দৃষ্টিহীন তাহা আমি চষমার ফাঁক দিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তাই বোধ হয় তিনি চষমা লাগাইয়া থাকেন।

এই ভোলাগিরির সম্বন্ধে আমি আমাদের হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গি শ্রীমৎ রঙ্গতানন্দ ব্রহ্মচারীকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাতে যে উত্তর পাইয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম। এই রঙ্গতানন্দ আবার ভোলাগিরির শিষ্য। তিনি ভোলাগিরির সম্বন্ধে যাহা পরে লিখিয়াছেন তাহা এই "আমার গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ কি না তাহা আমি জানিতে বা চিনিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার এখনও হয় নাই তবে তিনি বিদ্বান ও মহাপুরুষ তাহা আমি জানিয়াছি, তাহা না হইলে বাঙ্গলার কত বড় বড় গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী ১০০০।১৫০০ টাকা বেতন পান তাঁহারা শিষ্য হইতেন না। কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত শারদাসুন্দর পাল এখন পূর্ব্ববঙ্গে মন্ত্রবরূপ তিনি ১৮০০৲ টাকা বেতন পান, তিনিও শিষ্য হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ১০০০—১৫০০ বেতনের অনেক সাহেব ইঞ্জিনীয়ারও

আছে—এ প্রকার লোককে যে শিষ্য করিয়াছেন নিশ্চয়ই তাঁহার ভিতরে কিছু আছে।

"আমি পরপারের কিছুই এজন্মে করিতে পারিলাম না কারণ বরষা শুকাইয়া তরী আরোহণ করিতেছি বা করিতে বাসনা করিয়াছি। দেহী মাত্রেরই ত্রিতাপ-তাপিত দেহে অবিদ্যার (মায়া) কুহকে বন্ধন। এ বন্ধন আপনি কেন? মহা মহা পুরুষেরাও এই পাশ মুক্ত হইতে আশক্ত হইয়াছে। অতএব আমার নিবেদন, অর্থ থাকিতে সংসারে থাকিয়া জনকাদি ঋষিদের ন্যায় দান, জপ, ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি দ্বারা পরপারের রাস্তা পরিষ্কার করিতে থাকেন।"

আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার সরল সুললিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে একজনের চরিত্র দোষণীয় হইলে তাহাকে সৎপথে আনিবার কোনওপ্রকার প্রক্রিয়া তিনি জানেন কি না তদুত্তরে গিরি মহারাজ বলিলেন ইহা আপনা হইতেই শোধরাইয়া যাইবে। একজনকে উপলক্ষ করিয়াই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার ফলাফল এখনও জানিতে পারি নাই।

আমাদের রাস্তায় সর্ব্বনাথ মহাদেব ও বিষ্ণুঘাট দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রিতে আহারাদির পর বারেন্দায় বিছানা করিয়া শয়ন করিলাম।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, অমাবস্যা—

আজ অর্দ্ধকুম্ভযোগ, হরিদ্বার গঙ্গার পার লোকে লোকারণ্য ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতে হয়। কত রকমের দোকান গঙ্গার বাঁধান ঘাটের উপর বসিয়া গিয়াছে, কেহবা মিঠাই তৈয়ার করিতেছে, কেহবা মনিহারী জিনিষ, কেহবা ফলমূল, কেহবা ছবি, লাঠি, ফটো, কেহবা কাপড়,

ভেলকী তামাসা দেখাইতেছে ইত্যাদি রকমের এক প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া গিয়াছে—সে একটী বিরাট ব্যাপার।

যখন ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি অগণিত নরনারী মন্ত্র পাঠ করিতেছে ও স্নান করিতেছে। আমরাও একে একে বিধিমতে সংকল্প, মন্ত্রপাঠ ও স্নান করিয়া গঙ্গাস্তব পাঠ করিলাম পরে আমার পত্নীর অস্থি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। অস্থি নিক্ষেপ করিবার সময় পাণ্ডার লোক হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল "আমার হাতে দিন আমি ফেলিয়া দিতেছি" কিন্তু আমি তাহা দেই নাই। অস্থির সহিত যে স্বর্ণ থাকে তাহা আত্মসাৎ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। পরে আমরা কুশাবর্ত্ত ঘাটে চলিলাম। শান্তি তাহার মাতার উদ্দেশ্যে একটী পিণ্ড দান করিল আর আমার মাতাঠাকুরাণী পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড দান করিলেন। আমি আর পিণ্ডদান করি নাই। গত ১৩২৬ সালেই এই কাজ শেষ করিয়াছিলাম। আমি গঙ্গার ঘাটে ইত্যবসরে তর্পণ করিলাম।

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কিছু মিষ্টি খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা জলযোগ করিয়া পরে আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমভিব্যাহারে কনখল অভিমুখে একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। হরিদ্বারে রেল হইবার পূর্ব্বে যাত্রীরা কনখলে আসিয়া অবস্থান করিতেন এবং কনখল হইতে হরিদ্বারে আগমন করিয়া স্নানতর্পণাদি সমাপন অন্তে পুনরায় কনখলে চলিয়া যাইতেন—তখন হরিদ্বারে থাকিবার জন্য কোন বাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল না এবং হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভীষণ

জঙ্গল ছিল ও ব্যাঘ্রের ভয় ছিল। হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ার পর হইতেই এস্থানের উন্নতি সাধন হইয়াছে।

হরিদ্বারের বাজার হইতে মায়াপুর খাল এক মাইল ব্যবধান। এই খালের মুখ হইতে এক মাইল দক্ষিণ ও খালের পূর্ব্বপার ও গঙ্গার মধ্যে কনখল নামক স্থান অবস্থিত এবং বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। একটী মাত্র রাস্তা ইহা পাথর বাঁধন এবং উভয় পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। অনেকের প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর সুন্দর বাগানও আছে। রাস্তাটী বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন।

কনখলের নিকট গঙ্গা নীলধারা নামে কথিত, অপর ধারের পর্ব্বতের নাম নীল পর্ব্বত। হরিদ্বারের পাণ্ডাবা কনখলেই বাস করিয়া থাকেন এবং সমস্ত বাটীই প্রস্তর নির্ম্মিত তবে মধ্যে মধ্যে ইষ্টকের বাটীও যে না আছে তাহা নহে। অনেক বাটী সুন্দর কারুকার্য্যে নির্ম্মিত। স্থানটী বেশ মনোহর। মহাভারতে কনখলের নাম উল্লেখ আছে। আর কালিদাসের মেঘদূতেও এ স্থানের বর্ণনা আছে। এখানে প্রজাপতি দক্ষের রাজধানী ছিল। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কেদার খণ্ডে এ স্থানের উল্লেখ আছে তাহা পাঠে বুঝা যায় যে এই স্থানে মহাদেব দক্ষরাজার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রথমেই আমরা দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করিতে যাই। এই মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান এবং নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। নিকটেই সতীকুণ্ড—এখানে সতী প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে হোম করিতে হয়। আমরা গঙ্গাজল, বেল ও বিল্বপত্র মহাদেবকে চাড়াইলাম। মন্দিরের নিকটে অনেকগুলি পরিত্যক্ত মন্দির আছে—তন্মধ্যে একটীতে হনুমানজীর পূজা হয়। দক্ষ যজ্ঞ কুণ্ডও পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকেন।

কনখলে আরও সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে কিন্তু এগুলি আধুনিক। লাণ্ডৌরার রাজার দেবালয়টী বেশ সুন্দর। গঙ্গার ধার হইতে পাথর দিয়া গাঁথা একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

এখানে সাধুদের জন্য অনেকগুলি আশ্রম আছে এবং তাঁহাদের জন্য অন্নসত্রেরও বন্দোবস্ত আছে।

পণ্ডিত কেশবানন্দ স্বামীজির আশ্রম, অবধূত চেতন দেবের আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমই প্রধান।

হাটিতে হাটিতে পিপাসা বোধ হওয়াতে আমরা একটী পাকা কূপের জল পান করিলাম। একজন লোক অনবরত পিপাসাতুর যাত্রীদিগকে জল দান করিতেছে, ইহাকে জলসত্র বলে। রাস্তার ধারেই তরকারীর বাজার বসিয়াছিল আমরা কিছু তরকারী খরিদ করি। দেখিলাম হরিদ্বার হইতে তারিতরকারী অনেক সস্তা। সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি।

হরিদ্বারে যাত্রীগণের কর্ত্তব্যতা ও দ্রষ্টব্য বিষয়

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, তর্পণ, শিবপিণ্ডি প্রদক্ষিণ, কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিণ্ডদান, ভীমগোড়া, সপ্তস্রোতা, জ্ঞানগোধরি, সর্ব্বনাথ মহাদেব, সূর্য্যকুণ্ড, বীল্বকেশ্বর শিব, পিতোড়নাথ শিব, মায়াদেবী, ভৈরবনাথ, গৌরীকুণ্ড, চণ্ডীপাহাড়, চণ্ডদেবী, নীলধারা, কপিলস্থান ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান ধর্ম্মশালা

রায়বাহাদুর সুরযমল, রায়বাহাদুর বদরি দাস, মাড়োয়ারী পাঞ্চায়তী ধরম্‌শালাই প্রধান। ইহা ছাড়া অনেক ভাড়াটিয়া বাড়ীও পাওয়া যায়। ধরম্‌শালা যাহার তত্ত্বাবধানে থাকে তাহার পদবী—দারোগা সাহেব। কিছু পয়সা খরচ করিলে এই দারোগা সাহেব খুব খাতির করেন নচেৎ নয়।

সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও আখেরা—

জুনা আখেরা, নির্ব্বাণি আখেরা, নিরঞ্জনী আখেরা, স্বামী ভোলানন্দ গিরির আশ্রম, স্বামী কেশবানন্দাজির আশ্রম, তিরথ নাথের আখেরা, জ্ঞান গোধরি, রাধাগোবিন্দজির মঠ ইত্যাদি।

ব্রহ্মনালের মৎস্যের ক্রীড়া দেখিতে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে যাত্রীরা খাবার জিনিষ জলে ফেলিয়া দিয়া তামাসা দেখিয়া থাকে।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট

নগরের মধ্যে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর একটী কূপ আছে, ইহাকে ব্রহ্মকুণ্ড বলে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে ঘাট তাহাকেই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট বলে। এই ঘাটকে "হর-কি-পাইরি" বা "হরি-কি-চরণ" ঘাটও বলিয়া থাকে। প্রবাদ মহাদেব এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের সকল তীর্থের মধ্যে এই ঘাটই সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বে এই ঘাটের পরিসর ছিল মাত্র ৩৪ ফুট এবং ইহাতে ৩৯টী ধাপ ছিল। কুম্ভমেলার যোগের সময় যাত্রীরা স্নান করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইত যে তাহাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত। সে সময়ে এখানে নানা দেশ হইতে শৈব, বৈষ্ণব, দণ্ডী, পরমহংস, অবধূত, প্রভৃতি নানা

শ্রেণীর সাধু ও গৃহস্থগণ আগমন করিয়া থাকেন। সময় সময় ৪।৫ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া থাকে। ১৭৬০ খৃঃ অঃ যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল তাহাতে গোস্বামী ও বৈরাগী এই দুই সম্প্রদায় ভয়ানক দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, ফলে তাহাতে ১৮০০ শত লোক নিহত হইয়াছিল। আর একবার গোস্বামী ও শিখদের লড়াই হয় তাহাতে প্রায় পাঁচ শত গোস্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৮২০ খৃঃ-অঃ প্রায় ৪৫০ লোক পদদলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভিড় এতই প্রবল হইয়া উঠে যে স্বেচ্ছাসেবকদল ও পুলিশ কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা সত্বেও শান্তি রক্ষা করিতে পারিত না। স্নান করিবার জন্য যাত্রীদের মধ্যে অত্যন্ত কোলাহল হইত তাহার ফলে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অনেক লোক ডুবিয়াও মরিত। এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ করে গবর্ণমেণ্ট ১০০ ফুট পরিসর ও ৬০টী ধাপযুক্ত ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম-কুণ্ডের তলদেশ ইটক দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাত্রীরা যাহাতে গভীর জলে ভাসিয়া না যায় তজ্জন্য কুণ্ডের বাহিরে একটী লোহার বেড়াও দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখে ও গঙ্গার মধ্যে ইটক দ্বারা একটী চড়াও নির্ম্মিত হইয়াছে, একটী ছোট পুলের উপর দিয়া এই চড়াতে যাইতে হয়, তাহাতেও অনেকগুলি ধাপ আছে। ইহাতে যে যাত্রীগণের কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এক সঙ্গে বহু লোক স্নান করিতে পারে। এই ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রীরা মৃত ব্যক্তির অস্থি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই ঘাটের উপর গঙ্গাদ্বার মন্দিরে গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন আছে। গঙ্গাদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ হইতে শ্রেণীবদ্ধভাবে কেবলই মন্দির ও মঠ ও মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের বাড়ী।

কুশাবর্ত্ত ঘাট

এই ঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিতে হয়। তাহাতে পিতৃগণ বিষ্ণুর ন্যায় বিষ্ণুলোক গমন করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন। আমরা দেখিলাম দলে দলে যাত্রীরা পিণ্ডদান করিতেছে। একজন ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে ৮।১০ জনের কার্য্য সমাধা করিয়া অপর দলের কার্য্য আরম্ভ করেন। যাত্রীগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে দান ধ্যান করিয়া থাকে। এখানে কোনও জুলুম নাই। জনৈক ঋষি এ স্থানে সমাধিস্থ হইয়া যোগ সাধনায় রত ছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার কুশ ভাসাইয়া নিয়া যান। ঋষি কোপিত হইয়া গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন। দেবী সুরেশ্বরী কুশ ফিরাইয়া এই বর দেন যে কোন ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে এ স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে তাহার পিতৃগণ বিষ্ণুতুল্য হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিবে। তদবধি এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত ঘাট।

সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দির

এখানে মন্দির মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান আছে। ইহা একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত ও আঙ্গিনার চারি ধারে দ্বিতল অট্টালিকা সমূহ শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই মন্দিরের অনতিদূরে পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া ও পুরাতন মুদ্রা ও পুত্তলিকা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে এক সময়ে মিথিলার বেণ অথবা বীণা নামক রাজার দুর্গ ছিল।

মায়াদেবীর মন্দির

এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহার সন্নিকট বন জঙ্গল ও ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে অনেক অতি প্রাচীন ভাস্কর শিল্প দেখিতে পাওয়া যায় এবং দশম কি একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ক্যানিংহাম সাহেব সিদ্ধান্ত করেন। মায়াদেবীর সর্ব্বশরীর সিন্দুরে আবৃত—আসল মূর্ত্তি দেখা যায় না। পাণ্ডারা দেবীকে ত্রিমুণ্ডধারিণী এবং চতুর্ভূজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, এক হস্তে নৃমুণ্ড এক হস্তে চক্র, এক হস্তে ত্রিশূল, ও অপর হস্তে অভয় দান করিতেছেন।

স্মরনাথের মন্দির

একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীর সঙ্গমস্থানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার দক্ষিণে মায়াপুর, এখানে পুলিশের থানা, ডাক্তারখানা ও ডাকবাংলা আছে।

মায়াপুর খালের উপর যে পুল আছে তাহার অপর পারে খালের আফিস ও সরকারী পরিদর্শন বাংলা আছে। এই খালের মুখে কাঠের ও লৌহবর্ত্ত নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কপাট। এই কপাটের সাহায্যেই খালের জলের কম বেশী করা হইয়া থাকে।

চণ্ডী পাহাড়

গঙ্গার পরপারে এই পাহাড়, তথায় চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সমুদ্রবক্ষ হইতে এই পাহাড় ১৯৩০ ফুট উচ্চ। চণ্ডী পাহাড়ের নিম্ন দিয়া গঙ্গা নীলধারা নামে প্রবাহিতা। এই নীলধারা হইতে গঙ্গার প্রধান শাখা বহির্গত হইয়া এবং হরিদ্বারের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ২ মাইল নিম্নে কনখলের নিকট পুনরায় নীলধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা ও নীলধারার মধ্যে অনেক চড় আছে তাহা বৃক্ষরাজীতে পরিপূর্ণ। সকালে হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে প্রায় অপরাহ্ন হইয়া যায়। নীলধারার ঘাটে দুটী শিব বর্ত্তমান একটী গৌরীশঙ্কর এবং অপরটী বিল্বাকেশ্বর। হরিদ্বার হইতে ১২ ক্রোশ দূরে পিংহোড নাথ শিব আছেন। পথ অত্যন্ত দুর্গম বিধায় অনেকে তথায় যায় না।

ভীমগোড়া কুণ্ড

হরিদ্বার হইতে এক মাইল উত্তরে এবং ৩৫০ ফুট উচ্চ একটী খাড়া পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত। গঙ্গার একটী শাখা হইতে জল আসিয়া এই কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কথিত আছে ভীমসেন পথপ্রদর্শকস্বরূপ গঙ্গার সহিত সমতল ভূমিতে অবতরণ কালে, তাঁহার অশ্বের খুড়াঘাতে এই কুণ্ডটি উৎপন্ন হইয়াছে।

দশাবতারের মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন দশ অবতারের পাথরের মূর্ত্তি সকল বিরাজমান।

কপিলস্থান

এ স্থানে মহর্ষি কপিলের আশ্রম ছিল। একটী কুটীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। হরিদ্বারের অপর নাম কপিলস্থান।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ—

গত কল্য শ্রীযুক্ত হরি বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছিলাম যে আজ গুরুকুল দর্শন করিতে যাইব। এই স্থান হরিদ্বার হইতে প্রায় ৮।১০ মাইল হইবে। রাস্তা খারাপ হইয়া যাওয়াতে এক্কা অথবা টঙ্গা চলে না। আমরা সকলে পদব্রজেই রওনা হইলাম। আমি যেই বাসা হইতে বাহির হইব অমনি শান্তি আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অস্থির হইল। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বাজার হইতে কিছু খেলনা খরিদ করিয়া আনিলাম পরে অনেক প্রকারে তাহাকে বুঝাইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া রওনা হইলাম। শান্তি আমাকে ছাড়া আর কাহারও নিকট থাকিতে চায় না। জন্মাবধি আমাকেই শুধু চিনিয়াছে, সে আমাকেই দুনিয়ার সব মনে করে। আমাকে ছাড়িতে সে অস্থির হইয়া পড়ে, সে মনে করে আমিই তাহার একজন অপর কেহ কিছুই নয়। হরি বাবুও শান্তিকে অনেক প্রকারে শান্তনা করিলেন, যখন সে মাতাঠাকুরাণীর নিকট থাকিতে স্বীকৃত হইল তখন আমরা রওনা হইলাম।

আমরা খাল পার হইয়া হাটিতে আরম্ভ করিলাম। হাটিতে হাটিতে আমরা গঙ্গার অপর পারে যখন পৌছিলাম তখন দেখিলাম হরিদ্বারের কি চমৎকার দৃশ্য, এত মনোহর যে কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। আমরা দুজনেই অনেক সময় পর্য্যন্ত এ স্বর্গদ্বারের অতুলনীয় শোভা

দেখিতে লাগিলাম। কেনেল বিভাগের সড়ক এ পারেও আছে—আমরা সেই রাস্তা ধরিলাম। যখন নীলধারার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় ৯টা বাজিয়াছে। এ খেয়া ঘাট—এখানে নৌকাতে লোকজন ও অনেক গরুর গাড়ী পার হইয়া থাকে। গুরুকুল হইতে কয়েকখানা গরুর গাড়ী আসিয়াছে। এ সব হরিদ্বার হইতে চুনা আনিবে। একজন লোক ও তাহার পত্নী গুরুকুল হইতে ফিরিয়াছে তাহাদের একটী ছেলে তথায় অধ্যয়ন করিতেছে। তাহারা ৫।৬ দিবস তথায় ছিল, দেখিলাম তাহাদের সঙ্গে একটী ট্রাঙ্ক আছে তাহাতে তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি নিয়া গিয়াছিল। রাস্তার দুরত্বের বিষয় এই লোকটিকে ও গাড়োয়ানদের জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল "বাবু রাস্তাতে হাতীর উপদ্রব আছে, আমরা দল বাঁধিয়া যাতায়াত করি একা যাইতে ভয় করে"। হরি বাবু বলিলেন "তথায় গেলে আজ আর আমি ফিরিতে পারিব না, কারণ আমার শরীরে এত সামর্থ নাই যে আমি এখন ১১।১২ মাইল হাটিতে পারি"। যখন অনেক বলিয়াও তিনি স্বীকৃত হইলেন না তখন প্রত্যাবর্ত্তন ছাড়া অন্য গতি নাই। আমি বাসায় মাতাঠাকুরাণী ও শান্তিকে ফেলিয়া অন্যত্র রাত্রি বাস করিতে পারিব না আর তাহারাও অত্যন্ত চিন্তিত হইবে এই সব নানা চিন্তা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। হরিদ্বারের নিম্নে যে গঙ্গা প্রবাহিতা আর নীলধারা এই স্থানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক চড় ইহা প্রস্থে ১ মাইলের কম নয়। ইহার মধ্যে অনেক শিশু গাছ ও ছোট ছোট বেল গাছ আছে। ফিরিবার সময় ঠিক হরিদ্বারের অপর পার ঘাসের উপর বসিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে করিতে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। বেলাও অনেক হইয়াছিল—শান্তির জন্য ভাবিতে লাগিলাম, পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

বিকালে ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখিতে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। হরিদ্বারের ষ্টেশন হইতে দক্ষিনে ২ মাইল ব্যবধান। একখানি একা করিয়া তথায় পৌছিলাম পরে একা ওয়ালাকে বিদায় করিয়া ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এ আশ্রম দেখিবার উপযুক্ত। এখানে অনেক অল্পবয়স্ক ছাত্র আছে এবং সকল কার্য্যাদি বেদোক্ত মতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। আশ্রমের বন্দোবস্ত বেশ প্রশংসনীয়। ব্রহ্মচারী বালকদের দেখিলে প্রাচীনযুগের ঋষিদের আশ্রমের কথা যাহা পুরাণে শুনিয়াছি তাহাই মনে পড়ে। এখানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও হাস্পাতাল আছে। খালের জলেই ছেলেরা স্নান করে। আশ্রমের মধ্যেও স্নানাগার আছে। রন্ধনশালায় এক বিরাট ব্যাপার।

ফিরিবার সময় আর একা পাইলাম না। পদব্রজে আসিতে আসিতে যখন হরিদ্বার পৌঁছিয়াছি তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—রাস্তাতে একজন অপরিচিত লোক আমাকে বলিল "শুনিলাম আপনারা হৃষীকেশ যাইতেছেন, তথায় যাইবেন না কারণ ওলাউঠায় লোক মরিতেছে"। অনুসন্ধানে জানিলাম এ লোকটী কলেরা হাস্পাতালের কম্পাউণ্ডার, তিনি আমাকে কি করিয়া চিনিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম। হরিদ্বারে কলেরাতে লোক মরিতেছিল এবং গঙ্গাজল পান করিতে নিষেধ করিয়া নোটিস্ জারিও হইয়াছিল। আমরা পাকা কূপের জল খাইতাম। একজন হিন্দু পানিওয়ালা নিযুক্ত করিয়াছিলাম সে দুই বেলা আসিয়া বাসনপত্র ধুইয়া দিত আর কূপ হইতে জল আনিয়া দিত।

—————

হৃষীকেশ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—

আজ সকালে হরিদ্বার ত্যাগ করিব এইরূপ মনস্থ করিয়া পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল মোটরে হৃষীকেশ যাইব তাহাতে ভাড়াও অল্প হইবে আর ট্রেণে যাওয়ার ও বারংবার নামাউঠা করিবার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইব। কিন্তু তাহা হইল না। মোটর আসিতে অনেক দেরী হইয়া গেল। অগত্যা নিরুপায় হইয়া আমরা ষ্টেশনে চলিলাম এবং যথা সময়ে হৃষীকেশ রোড্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে হৃষীকেশ ৮ মাইল, টঙ্গাতে যাওয়া যায় রাস্তাও খুব ভাল। একখানা টঙ্গা ৪৲ টাকা ভাড়া নিল। আমরা ৺সত্যনারায়ণ দেবের মন্দিরের নিকট টঙ্গা রাখিয়া বিগ্রহ দর্শনার্থে অবতরণ করিলাম। মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত ৺সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি, দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। এখানে যাত্রীদের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে, জলের বন্দোবস্তও ভাল। খাদ্য দ্রব্যাদির দোকানও আছে। সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। ক্রমশঃ বিবিওয়ালা ও উত ধর্ম্মশালা অতিক্রম করিয়া আমরা যখন হৃষীকেশে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। প্রথম আমরা কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালার কর্ম্মচারীরা খুবই খাতির করিল। একটী ঘর নির্দ্ধারিত করিয়া সতরঞ্চ ও গালিচা বিছাইয়া দিল এবং জলের জন্য দুইটী বড় পিতলের কলস আনিয়া দিল। ধর্ম্মশালার মধ্যেই একটী বৃহৎ পাকা কূপ আছে তাহাতে অনবরত জল উঠাইতেছে। ধর্ম্মশালা বহু যাত্রীতে

পরিপূর্ণ, সমস্তই পশ্চিম দেশীয়। যখন শুনিলাম এখানেও কলেরাতে লোক মরিয়াছে তখন আর তথায় অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। টঙ্গা হইতে তখনও মালপত্র নামান হইয়াছিল না এবং মাতাঠাকুরাণী ও শান্তি বাহিরে রাস্তাতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে আমরা ইনস্পেক্‌সন্ বাঙ্গালায় যাইয়া হাজির হইলাম। ব্রিটিশ গাড়োয়ালের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের হুকুমনামার একখানা পত্র আমার সঙ্গেই ছিল।

এই স্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। ডিব্রুতে থাকিতে আমি ব্রিটিশ গাড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার পৌড়িতে ডেপুটী কমিশনারের নিকট একখানা পত্র লিখি। তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে আমি হরিদ্বার হইতে কেদার বদরী ভ্রমণ করিয়া রাম নগর হইয়া ফিরিতে ইচ্ছা করি এবং যে সব স্থানে সরকারী বাঙ্গালা আছে তাহাতে থাকিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি। তাহার উত্তরে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

এই পত্রের বলেই ইনস্পেক্‌সন্ বাঙ্গালাতে উপস্থিত হইলাম। অদূরে বাঙ্গলার চৌকিদার ছিল সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমরা জিনিষপত্র ঠিক করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। এই বাঙ্গলা হৃষীকেশ প্রবেশ দ্বারেই রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। চতুর্দ্দিক খোলা এবং নিকটে জনমানবের সংশ্রব নাই। গঙ্গার পরপারে আকাশ স্পর্শ করিয়া হিমালয় দাঁড়াইয়া আছে। আমরা গঙ্গাতে একে একে স্নান করিয়া আসিলাম—প্রথমে মাতাঠাকুরাণী পরে আমি ও শান্তি। গঙ্গার ঘাট বাঙ্গলা হইতে ২ মিনিটের পথ এবং ভাল রাস্তা নাই ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। এ রাস্তায় খুব কম লোকই যাতায়াত করিয়া থাকে। যাহারা ইনস্পেক্‌সন্

বাঙ্গলায় থাকে তাহারা ত আর গঙ্গার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখে না কাজেই রাস্তাও আর ভাল হয় না। এই ঘাটের নাম ত্রিবেণী ঘাট। কারণ গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন। এখানে দেখিলাম একজন সাধু গঙ্গার মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আর দুইজন ঘাটের উপরে সাধন ভজনে নিমগ্ন আছেন। নদীতে জল খুব কম। দুই তিন খানা ছোট চালা-ঘরও আছে তথায় পাণ্ডারা যাত্রীদের কাজ করাইয়া থাকেন। এখানেও হরিদ্বারের ন্যায় নদীতে বড় বড় মাছ আছে। এখানেও অনেক বাঁদর আছে।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমি বাজারে বাহির হইলাম। দোকান অনেক রকমের আছে—আবশ্যকীয় সমস্তই পাওয়া যায়। তরকারী দুষ্প্রাপ্য এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার মূল্যও অধিক।

হরিদ্বারে ও হৃষীকেশে সকলেই বলিতেছে এবার বদরীনারায়ণের যাত্রা বন্ধ। যাহারা পৌড়ীর ডেপুটী কমিশনারের নিকট হইতে হুকুম আনাইতে পারে তাহারা যাইতে পারে নচেৎ কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। লক্ষ্মণ ঝোলাতে একজন সব ইনস্পেক্টার একজন হেডকনষ্টেবল ও ১২ জন কনষ্টেবল আছে। ভাবিলাম ব্যাপার গুরুতর। আমার নিকট অনুমতি পত্র ত নাই তবে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের যে একখানা পত্র আছে তাহাই সম্বল। আগামী কল্য লক্ষ্মণ ঝোলার দারোগার সহিত সাক্ষাৎ করাই ঠিক করিলাম যদি যাইতে দেয় ভালই নচেৎ এই বিখ্যাত স্থানটা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিয়া ফিরিব। রাত্রিতে কয়েকখানা পত্র লিখিলাম।

আজ রাত্রিতে দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না হওয়াতে চন্দ্রমা অল্প সময় পরেই অস্তমিত হইলেন। পরে অন্ধকার—এই অন্ধকারে আর ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস হইতেছে না। খোলা ময়দানের মধ্যে একখানা

ঘর, নিকটে জনপ্রাণীও নাই চীৎকার করিলেও কাহার সারাশব্দ পাওয়া যাইবে না। দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শুধু পোকার ঝিঁ ঝিঁ রব হইতেছিল। এমন সময় মাতাঠাকুরাণী একটি ব্যাঘ্রের গল্প করিলেন, কোন এক স্থানে ঘরের দরজা ঠেলিয়া ব্যাঘ্র ঘরে ঢুকিয়াছিল, তাহাতে আমাদের ভয়ের মাত্রাটা একটু, আমি একটু বলি কেন বিলক্ষণই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বাহ্য প্রস্রাবের বন্দোবস্ত সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে (Bath room) থাকাতে আমাদের কোন অসুবিধা হইল না। রাত্রিতে নিদ্রা যে ভাল হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কারণ মধ্যে মধ্যে যখন ঘুম ভাঙ্গিত তখন কান পাতিয়া শুনিতাম যে বাহিরে কোন শব্দ হইতেছে কি না। মনের ভয় ছাড়া আর কোন বাহিরের ভয়ভয় নাই এবং রাত্রিও ভোর হইল।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ—

সকালে বাঙ্গলার চৌকীদারকে বলিলাম যেএক জন কুলি ডাকিয়া দাও—আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রিকে নিয়া লক্ষনঝোলা যাইতে হইবে। কিছু সময় পরেই কুলি উপস্থিত হইল, ভাড়া ঠিক হইল যাতায়াতে এক টাকা। হৃষীকেশ হইতে রওনা হইয়া রাস্তায় প্রথমেই চন্দ্রভাগা নদী পার হইলাম। নদী শুক্না—কোথাও জল নাই। গঙ্গার উপকূলে অনেকগুলি আশ্রম, তথায় সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন। কিছু দূরে "কৈলাস" আশ্রম তথায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি ও মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এখানে দেখিলাম একদল "পশ্চিমা" তাহাদের মধ্যে কাহারও গোয়ালীয়র কাহারও বা আযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বাড়ী। এই দলে ১৬।১৭ জন ছিল তাহারা বদরিকাশ্রম

যাইতে পারে নাই, পুলিশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে আমি যদি যাইতে অনুমতি পাই তবে তোমাদের মধ্যে হইতে ৩।৪ জন লোককে আমার সঙ্গে নিতে পারিব। আমার মাল বহনকারী কুলী হইয়া যাইতে হইবে। কয়েকজন রাজি হইল। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়াই লক্ষ্মণঝোলা রওনা হইলাম। রাস্তা চলিতে চলিতে অপর একখানা মন্দির দেখিলাম তথায় শত্রুঘ্ন ও বদ্রীনাথের মূর্ত্তি আছে।

এখানে একখানা বড় রকমের মনিহারী জিনিষের দোকান আছে। এ পর্য্যন্ত একা, টঙ্গা ও মোটর গাড়ী আসিতে পারে পরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর দিয়া ১॥০ মাইল চলিয়া লক্ষ্মণঝোলায় যাইতে হয়।

এ স্থানের ঠিক পরপারে স্বর্গাশ্রম নামে একটী আশ্রম অল্প দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। খেয়া নৌকাতে পার হইতে হয়, পয়সা লাগে না। দেখিলাম ২।৩ জায়গায় পর্ব্বতগাত্রে গোফা নির্ম্মাণ করিয়া সাধুরা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কয়েকখানা পর্ণশালাও আমাদের নয়নগোচর হইল, এখানে কমণ্ডলুধারী সাধুরা বাস করিয়া থাকেন।

ইহার পরই চড়াই আরম্ভ হইল—এ চড়াই খুব বেশী নয় অর্দ্ধ মাইল কি তিন পোয়া মাইল হইবে এবং চড়াইয়ের উপরে একটি জলছত্র আছে। এই চড়াইর পর আবার অর্দ্ধমাইল রাস্তা উৎরাই চলিয়া লক্ষ্মণঝোলার নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে রঘুনাথ ও লক্ষ্মণজীর মন্দির আছে। এই মন্দির একটি উচ্চ চত্বরের উপর নির্ম্মিত। রাবণ বধের পাপক্ষয় নিবন্ধন রামচন্দ্র হৃষীকেশে ও লক্ষ্মণ এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার নিকটে আরও ছোট ছোট মন্দির আছে।

লক্ষ্মণঝোলার দক্ষিণ পার্শ্বে ধ্রুব বা দ্রোণ ঘাট ও নিম্নে একটী কুণ্ড আছে। লক্ষ্মণঝোলায় একটী লৌহ নির্ম্মিত ঝোলান সেতু, পড়িয়া যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই। এই প্রকার সেতু হিমালয়ের মধ্যে অনেক আছে। পূর্ব্বে এখানে দড়ির ঝোলা ছিল। ১৮৭৮ খৃঃ অঃ রায় বাহাদুর শ্রীযুত সুরজমল শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া বদরিকাশ্রম দর্শনে যাওয়া কালীন এই সেতুর ভীষণতা দর্শন করিয়া পুত্রকে একটী পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আদেশ করেন পরে উক্ত শেঠ বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে লৌহ নির্ম্মিত ঝোলান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যে যাত্রীদের কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পূর্ব্বে এই সেতু পার হইতে পারিলেই যাত্রীরা বদরিনারায়ণ দর্শন লাভের আশা করিতে পারিত। এই সেতু এখন এত মজবুত যে ইহার উপর দিয়া এখন ঘোড়া গাধা পর্য্যন্ত মাল বোঝাই লইয়া নির্ভয়ে পার হইয়া যায়। সেতুর মাঝখানে কাষ্ঠের তক্তা বিছান আছে এবং যাহাতে কোনও দুর্ঘটনা না হয় তাহার জন্য দুই ধারে তারের বেড়া আছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই সেতু প্রথম খোলা হয়।

দড়ির ঝোলা প্রস্তুত করিতে হইলে দুইগাছা খুব মোটা দড়ি সমান্তরাল ভাবে দুইটী শক্ত খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক থাকে তাহাতে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের প্রান্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে দড়ি দ্বারা উক্ত মোটা দড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবধান অল্প অল্প দূরে থাকে যেন সহজেই পা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। ইহা ঠিক একখানা সিঁড়ির ন্যায় দেখা যায়। ইহার উপর পা দিয়া পার হওয়ার সময় দুই হাতে দুই ধারে ধরিবার জন্য দুই গাছা শক্ত রশি এপার ওপারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

পার হওয়ার সময় দুই বগলের মধ্যে দুই হাতে শক্ত করে ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। এই সময় ঝোলা ঠিক ঝোলার মতই, দুলিতে থাকে, তবে পড়িয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। ইহা অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি যে পাহাড়ীরা নির্ভয়ে পার হইয়া যাইতেছে—কিন্তু আমাদিগকে অতি সন্তর্পণে পার হইতে হয়। এই প্রকার ঝোলা হিমালয়ের মধ্যে দুই স্থানে পার হইয়াছি। সে সব কথা সময় মত বলিব।

লক্ষণঝোলায় যাইতে বাম ধারে বিস্তর সমতল জমি আছে এখানে বাসমতী নামক সুগন্ধি ধান্য উৎপন্ন হয় এবং ছোট একটী গ্রাম ও বিষ্ণুর মন্দির আছে। লক্ষণঝোলাতে একটী ডাক্তারখানা, গ্রাম্য ডাকঘর ও ফাঁড়ি আছে।

আমরা পুলপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন পুলিসের কনষ্টেবল পাহাড়ায় আছে। যাত্রীদিগকে পরপারে যাইতে দেয় না। আমাদেরও বাধা দিল কিন্তু যখন বলিলাম যে দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিব তখন আর কোনও আপত্তি করিল না। আমরা গঙ্গামাঈকী জয় বলিয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম। ঠিক পুলের মাথাতে পুলিশের আড্ডা। দারগাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং পত্রখানা দেখাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে চাহিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যদি না করে তবেই আক্কেল গুড়ুম। এত রাস্তা হবে বৃথাই আসা হইল কিন্তু দারগা সাহেব পত্রখানা পড়িয়া যখন বলিলেন "আপ্ জানে সেক্তা হায়" তখন আনন্দে আটখানা হইয়া গেলাম। আমি তাঁহাকে জানাইলাম কাণ্ডী ঝাঁপান কিছুরই বন্দোবস্ত করি নাই। এই সব বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিব। দারগা সাহেবকে সেলাম করিয়া রওনা হইলাম। এবার আর পুল পার না হইয়া ভাগীরথীর বাম তীর দিয়া

চলিতে আরম্ভ করিলাম, ইচ্ছা স্বর্গাশ্রম দর্শন করিয়া বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করিব। চলিতে চলিতে দেখিলাম ভাগীরথীর তীরে একজনের বাসোপযোগী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্ম্মিত কুটীর সাধুদের সাধন ভজনের জন্য রহিয়াছে। দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। এ প্রকৃত তপোভূমি। স্থানটী নির্জ্জন। এই সব কুটীরকে গৃহ না বলিয়া মন্দির বলাই সঙ্গত। সকলগুলিই গঙ্গার পবিত্র তীরভূমিতে অবস্থিত। একদিকে উচ্চপর্ব্বত নালা ও অপরদিকে ভাগীরথী—আর এই উভয়ের মধ্যস্থলে তপোভূমি। পাঠক পাঠিকাগণ একবার মনের মধ্যে কল্পনা করিয়া দেখুন ইহা ভূস্বর্গ কিনা। আমরা স্বর্গাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ইহা একজন বাঙ্গালী সাধুর কীর্ত্তি। সাধুটীর বয়স ৩০/ বৎসর। তাঁহার নাম শ্রীমৎ আত্ম প্রকাশ। শুনিলাম তাঁহার জন্মভূমি কুমিল্লা জিলায়। পূর্ব্বে তিনি কালীকম্বলী বাবার হৃষীকেশস্থ ধর্ম্মশালায় ছিলেন পরে রামনাথজীর সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে ভিন্ন আশ্রম করিয়াছেন। তিনি একখানা গালিচায় বসিয়া আছেন সামনে একখানা থালাতে যাত্রীরা ইচ্ছামত টাকা দিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীমৎ আত্মপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর অনুরোধে বোম্বাইর শেঠ মহারাজ রাম ভগৎ ডালমিয়া টাকা এখানে গঙ্গার তীর দিয়া ২ মাইল বিস্তৃত জমি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে দান করিয়াছেন এবং সাধন ভজনের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এখানে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। আর একখানা মন্দির আছে তাহাতে রামেশ্বর মহাদেব ও গঙ্গাজী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরখানা ত্রিতল এবং ঠিক ভাগীরথীর উপরেই অবস্থিত। এখানে যে কুণ্ড আছে তাহাকে রামকুণ্ড বলে। আমরা দর্শনান্তে খেয়া পার হইয়া গঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন প্রায় ১১টা

বাড়িয়াছে, রাস্তা এত গরম হইয়াছে যে খালি পায় চলা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। পায় তলায় যেন ফোস্কা পড়িয়া যায়। আমি আমার মোজা জোড়া খুলিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীকে দিলাম, তাহাতে তাঁহার কতকটা আরাম হইল বটে কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে যখন বালুর উপর এ মোজাতেও মানাইল না, তখন তিনি পায় কাপড় জড়াইয়া দিলেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই জুতা পরা দরকার নচেৎ হাটিয়া যাওয়া যায়না। খালিপায় পাথরের রাস্তাতে পায়ের তলা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। হরিদ্বার ও হৃষীকেশে কাপড়ের দড়ির তলা বিশিষ্ট এক প্রকার ক্যাম্বিসের জুতা পাওয়া যায় তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। আমি হৃষীকেশে সেই দিনই কাপড়ের জুতা মাতাঠাকুরাণীর জন্য খরিদ করি। বাসায় ফিরিতে বেলা ১১॥৹টা বাজিল। পরে স্নান আহারের বন্দোবস্ত করিলাম।

বিকালে শান্তির জ্বর হইল। মনে বড়ই ভাবনা হইল। সঙ্গে ঔষধ ছিল তাহা দেওয়াতে জ্বর ছাড়িয়া গেল। গোয়ালীয়ার জিলায় তিন জন লোক আমার সঙ্গে কুলী হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। আমি তাহাদিগকে আমার নিকটই স্থান দান করিলাম। মনে করিলাম ইহাতে উভয়েরই সুবিধা হইবে। তাহাদেরও বদরিনারায়ণ দর্শন হইবে এবং আমিও তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইব। একবার লক্ষণঝোলার পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই হয়, তখন আর ধরে কে? এই সব লোক রাত্রিতে বাঙ্গলায় শয়ন করিত আর দিনের বেলা বেড়াইয়া বেড়াইত—তাহারা আহারের বন্দোবস্ত অন্যত্র করিয়াছিল। এই তিনজন লোক পাইয়া মনে অনেক বল হইল।

বিকাল বেলা বাজার ঘুরিয়া আসিলাম ও কালীকমলী বাবার

ধর্ম্মশালায় কাণ্ডী ও ঝাঁপানের জন্য চেষ্টা করিলাম। এখানে অনেক কুলী থাকে। যাত্রীদের সন্ধানে তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়।

ঝাঁপানের কোনই সন্ধান মিলিল না কারণ রাস্তা বন্ধ হওয়াতে কুলীরা সকলেই স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশালার একজন কর্ম্মচারী বলিল যে দেরাদুন হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে তাহাতে ৩।৪ দিন সময় লাগিবে। বাজারে বেড়াইতেছি এমন সময় একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন যে প্রমথ বাবু বদরিকাশ্রম যাইবেন তিনি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিতেছেন এখন বাসায় নাই লক্ষণঝোলা গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম প্রমথ বাবু ফিরিলে তাঁহাকে ইনস্পেকসন্ বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দিবেন। এই বাঙ্গালীটি আর কেহ নহে আমাদের সাধুজী। তাঁহার বিষয় পরে বলিব।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—

সকালে আমার নিকট ২ জন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল—একজন কেদারনাথের ও অপর জন দেবপ্রয়াগ ও বদরিনারায়ণের তাঁহারা আমাকে বিস্তর আশা ভরসা দিলেন এবং কাণ্ডী ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া গেলেন। যাত্রার উপযোগী কিছু জিনিষপত্র খরিদ করিয়া আনিলাম। ঝাঁপানের কোনই বন্দোবস্ত করা গেলনা—পাণ্ডারা বলিলেন যে দেবপ্রয়াগে কাণ্ডী ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন তথায় অনেক কুলী পাওয়া যায়।

দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আমার মাল বহনের জন্য একটী ঘোড়ার বন্দোবস্ত হইবে। এই ৪৪ মাইল রাস্তার জন্য তাহার মজুরী ঠিক হইল ১০৷৷০ টাকা প্রতি ৵৫ সেরে এক টাকা। দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ সান্যাল এবং দেরাদুনের Trigonometrical Survey

of India আফিসের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার দেব, বি, এ, দয়া করিয়া আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন। প্রমথ বাবু বলিলেন যে ১৬ দিন পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া এবং বারংবার হরিদ্বার ও দেরাদুন দৌড়াদৌড়ি করিয়া পৌড়ীর ডেপুটি কমিশনারের হুকুমনামা আনাইয়াছেন। আর টেলিগ্রামে তাঁহার ১০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। তাঁহার সহিত তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী, পত্নী, দুইজন শ্যালিকা ও একজন শ্যালীর কন্যা (বয়স প্রায় ৩০ বৎসর) আছেন। তাঁহারা সকলেই হাঁটিয়া যাইবেন কেবল নিজের বৃদ্ধা মাতার জন্য একখানা ঝাপান হরিদ্বার হইতে ১৫০৲ টাকায় ঠিক করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা কেদার বদরী ভ্রমণ করিয়া পুনরায় হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ১ জন মাল বহনকারী কুলিরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাহারা প্রতিদিন ৮০৲ হিসাবে নিবে।

আজ পাল্কীর খবর নাই। আমি স্নানের জন্য গঙ্গার দিকে রওনা হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম আমার হরিদ্বারের বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানা একাতে গেটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া আমি দৌড়িয়া গেলাম এবং তাঁহার জিনিষপত্র বাঙ্গলাতে আনিয়া রাখিলাম। স্নান করার সময় যখন গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম একজন সাধু এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে গোলাকার ভাবে ঘুঁটের ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আর একখানা বস্ত্রদ্বারা মস্তক ও শরীর ঢাকিয়া বসিয়াছেন। অন্য একজন সাধু গঙ্গার মধ্যে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। দেখিয়া বড়ই ভক্তি হইল। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে এই ভাবেই কঠোর তপস্যা করিতে হয় নচেৎ তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

এত আর আমাদের বাজ দর্শন নয় যে একখানা টিকেট করিয়া রেলে চাড়িয়া পরে মোটর হাঁকাইয়া রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া একখানা কার্ড পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। ধর্ম্ম লাভ করা যেমন কঠিন আবার তেমন সুগম।

বিকালে কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালার একজন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া একখানা ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলাম, ইহাতে মনেও অনেক আনন্দ হইল। আমাকে দিয়া যদি কাহারও যৎকিঞ্চিৎ উপকার হয় তবে এ হতভাগা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।

আমি কি প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহা অনুসন্ধান করার জন্য প্রমথ বাবু পুনরায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন। আমাদের ঠিক হইল আগামী কল্য সকালে যাত্রা আরম্ভ করিব।

বাজিতে হরিপদ বাবু তাঁহার ইকমিক কুকারে খিচড়ী পাক করিয়া আমাকে কিছু ভাগ দিলেন। এখানে হৃষীকেশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা দরকার।

যে সব যাত্রী হরিদ্বারে কাণ্ডী ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত করিতে পারে না তাহাদিগকে এখানে সব ঠিক করিয়া নিতে হয়, নচেৎ রাস্তাতে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমি তাহার জন্য বিশেষ ভুক্তভোগী। রাস্তাতে বন্দোবস্ত করিলে অর্থও অনেক বেশী ব্যয় হয়, অপর কুলী দ্বারা সুবিধা মত কাজও পাওয়া যায় না। কাণ্ডী ও ঝাঁপান আরোহীর শরীরের পরিমাণ দেখিয়া ভাড়া সাব্যস্ত হয়। যাহারা কৃশাঙ্গ তাহারা কাণ্ডীতে যাইতে পারে ইহা খাসিয়াদের খাবার ন্যায়, একজন লোক পিঠে করিয়া নিয়া যায়। আর কাণ্ডীতে মালপত্রও বহন করা হয়। ঝাঁপান পাহাড়ীদের চতুর্দ্দোল, ইহা অনেকটা আমাদের দেশের ডুলির মত, চারিজন কুলিতে বহন করিয়া থাকে।

ডাণ্ডী—ইহাও এক প্রকার চতুর্দ্দোল কিন্তু ইহাতে চেয়ারের মত বসিয়া থাকা যায় এবং অনেক আরামজনক কিন্তু বিস্তর ব্যয় সাপেক্ষ। ইহাও চারিজন কুলিতে বহন করিয়া থাকে। কাশী নরেশের ম্যানেজার যখন বদরিকাশ্রম গিয়াছিলেন তখন তাঁহার ডাণ্ডী ৮ জন কুলি বহন করিয়াছিল এবং আরও ৮ জন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিত। তাহারা অদল-বদল করিয়া বহন করিত। এই ভাবে কুলিরও অনেক কষ্টের লাঘব হয় আর আরোহীও শীঘ্র গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে। মোট কথা কুলিরা রাস্তা চলিতে চলিতে যে অনেক স্থানে বিশ্রাম করে তাহা আর দরকার হয় না।

ইহারা সকলেই যাত্রীদিগকে মেহেলচৌরা পর্য্যন্ত লইয়া যায়—অথবা হৃষীকেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে প্রকার বন্দোবস্ত হয় সেই ভাবেই কাজ পাওয়া যায়। মেহেলচৌরী গাড়োয়াল রাজ্যের শেষ সীমা। কাজেই গাড়োয়ালের কুলিরা আর অগ্রসর হয় না। এ স্থানে পৌঁছিয়া পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। একজন পুলিশের হেড কনষ্টেবল আমাদের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। কোনও বেগ পাইতে হয় নাই।

নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ছাড়া ঝাপানওয়ালা, কাণ্ডীওয়ালা ও কুলিকে নিম্নলিখিত হিসাবে পুরস্কার দিতে হয়।

(১) দৈনিক প্রত্যেককে দুই পয়সা করিয়া জলপানি।

(২) কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, ত্রিযুগী নারায়ণ, কালীমঠ ও তুঙ্গনাথ এই পাঁচ তীর্থে প্রত্যেককে একসের করিয়া খিচুড়ী অথবা তন্মূল্য। একসের করিয়া চাউল দিলেও হয়। ইহাতে বার আনা হইতে এক টাকা পড়ে।

(৩) যদি কোনদিন রাস্তা না চলা যায় তবে একসের করিয়া আটা অথবা তন্মূল্য।

(৪) এই পাঁচ তীর্থে প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া বক্‌সিস্।

(৫) যাত্রা শেষ হইলে ইচ্ছানুযায়ী পুরস্কার।

যাত্রার প্রারম্ভে যে রসিদ লিখা হয় তাহাতে এই সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া থাকে। যে রসিদ লিখে তাহাকে চারি আনা দিতে হয়। ইহা তাহার মুহুরীগিরির পুরস্কার। যে এই রসিদ লিখিয়া দেয় তাহাকে "চৌধুরি" বলে এবং সকল রসিদ দেবনাগরীতে মুদ্রিত ত্রিফর্দ কাগজে হয়, যাত্রী ও কাণ্ডীওয়ালার সম্পূর্ণ নাম ও ধাম সহ তাহাদের স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দেওয়া হয়।

একজন কাণ্ডীওয়ালা ৩০ সেরের কম মাল বহন করিতে চাহেনা। ঝাঁপানের ভাড়া, আমাদিগকে ২২৫ হইতে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছিল। ডাণ্ডীর ভাড়া ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক। আর একখানা ডাণ্ডী খরিদ করিতেও অন্ততঃ ৩০৲ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। অন্যান্য বৎসর ইহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে পাওয়া যাইত। কাণ্ডীর ভাড়া ৫০।৬০ টাকা লইয়া থাকে। মাল বহন করিতে মণ প্রতি ৬০৲ টাকা দিতে হইয়াছিল। এ বৎসর যাত্রা বন্ধ থাকাতে সকল বিষয়েই দেড়গুণ বা দ্বিগুণ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও তদ্রূপ। আমরা নিম্নলিখিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়াছি।

		হৃষীকেশ	কেদারনাথ	বদরিকাশ্রম
দুগ্ধ	প্রতিসের	।৵০	০	।৶০
লবণ	„	•	।/০	•
অড়হর ডাইল	„	।০	৸০	৸০
চিনি	„	১৲	১৵০	১।০

আলু	"	।০	০	০
চাউল	"	॥০	১ৎ	১ৎ
ঘৃত	"	২॥০	৪ৎ	৪ৎ
পুরী	"	১ৎ	৸০	৸৵০-১।০
আটা	"	॥০	৸০	৸০

কেরসিন তৈল—এক লণ্ঠন তৈল ত্রিযুগী নারায়ণে ॥০ আনা পয়সা লাগে।

দুগ্ধ কোথাও বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। ঘৃত সর্ব্বত্রই ভাল খরিদ করিয়াছি।

১লা বৈশাখ হরিদ্বারের মেলার পর যাত্রীরা কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া থাকেন। সকলে হৃষীকেশে বিশ্রাম করেন আর অনেক যাত্রী লক্ষণঝোলা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে যে সব মন্দির আছে তাহা দর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেদার ও বদ্রীনাথের যাত্রী সংখ্যা প্রতি বৎসর ৫০ হইতে ৬০ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গত বৎসর (১৩২৭ সন) বদরিকাশ্রমের যাত্রী সংখ্যা ৪৭০০০ হইয়াছিল। বদরিকাশ্রমে সকল যাত্রীর নাম লিখা হয়। অলকানন্দা ও ঋষিগঙ্গা পার হইয়া যেই আমরা বদরীনারায়ণের পুরীতে প্রবেশ করিলাম তখন দেখিলাম একখানা খাতা লইয়া একজন লোক বাজার দ্বারের বারেণ্ডায় বসিয়া সকলের নাম ধাম লিখিতেছে।

হরিদ্বার হইতে তিন প্রকার যাত্রী গমন করিয়া থাকে।

(১) যাহারা গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহারা দেবপ্রয়াগ হইয়া তিহরি (৩১ মাইল) তার পরে ধরাসু হইয়া যমুনোত্তরী যায় এবং উত্তরকাশী আসিয়া গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসে। ফিরিবার সময় মসুরী হইয়া দেরাদুন আসিয়া রেল ধরে।

(২) কতক যাত্রী দেরাডুন পর্য্যন্ত রেলে চলিয়া তথায় কাণ্ডীওয়ালা সংগ্রহ করিয়া যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া বুড় কেদার হইয়া ত্রিযুগীনারায়ণ দিয়া বাহির হইয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া রামনগর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই শেষোক্ত যাত্রা অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য। এইরূপ পর্য্যটনে প্রায় ২ মাস সময় লাগিয়া থাকে।

(৩) কেদার ও বদরী দর্শন করিয়া পাঞ্জাবের যাত্রীরা হরিদ্বারে আসিয়া রেল ধরেন আর পূর্ব্ব অঞ্চলের যাত্রীরা রামনগর যাইয়া রেলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কুলিরা মেহেলচৌরী নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দেয় পরে অন্য বন্দোবস্ত করিয়া রামনগর আসিতে হয়। মেহেলচৌরীর পর হইতে আলমোরা জিলার আরম্ভ হইয়াছে।

কুলিরা অগ্রিম টাকা কিছু লয় পরে মধ্যে মধ্যে তাহারা টাকার জন্য বড় বিরক্ত করে এবং না দিয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় নাই। অবশিষ্ট টাকা মেহেলচৌরীতে পরিশোধ করিতে হয়। ইহাদের সহিত চুক্তি করিয়া লিখাপড়া করিয়া নেওয়াই কর্ত্তব্য নচেৎ বিপদে পড়িতে হয়। যাত্রীপথে প্রধান প্রধান স্থান গুলিতে কাণ্ডী ও ঝাঁপান পাওয়া যায় কিন্তু খরচ কিছু অতিরিক্ত পড়ে। মধ্যে মধ্যে ঘোড়াও ভাড়া পাওয়া যায়। সকল স্থানেই একজন করিয়া "চৌধুরি" আছে। সে রসিদ লিখিয়া দেয়।

আমাদের ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাঙ্গলার সন্নিকটেই রামচন্দ্রের মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখে একটী কুণ্ডে যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডকে কুব্জাকুণ্ড অথবা ঋষিকুণ্ড বলে।

এই মন্দিরের নিচেই ত্রিবেণীঘাট। এখানে বড় বড় মাছ আছে। যাত্রীরা তাহাদিগকে খাবার দিয়া থাকেন। এখানেও হরিদ্বারের ন্যায় হিংসা নাই, তাহারা মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না।

বাজারে কয়েকখানা কাপড়, জামা, তৈজস পত্র ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। তরকারী দুর্মূল্য এবং পাওয়াও কঠিন। দুই একখানা মণিকার দোকানও দেখিলাম। যাহা কিছু দরকার সকলই এখানে পাওয়া যায় তবে হরিদ্বার হইতে মূল্য অনেক অধিক।

এখানে দুইটী ছত্রই উল্লেখযোগ্য। একখানা কালীকম্বলী বাবার ও অপরখানা পাঞ্জাবী ছত্র। এই পাঞ্জাবী ছত্রের বাড়ীখানা খুব বৃহৎ। এই সুন্দর অট্টালিকাটী পাঞ্জাবের শিখেরা চাঁদা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও বড় বড় ধর্ম্মশালা ও কয়েকটী আশ্রম আছে। ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি, ধনরাজ গিরিজি ও ভাবগ্রাহিজীবাবাজী প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ও চরণ দাসের ধর্ম্মশালায় অনেক সাধু মহাত্মা স্ব স্ব সাধন ভজনে রত থাকেন।

কালীকম্বলী ও পাঞ্জাবী ছত্র হইতে সাধন করিবার জন্য পর্ণকুটীর, পাতিবার জন্য মাদুর ও কম্বল, জলপাত্র বা কমণ্ডলু এবং কৌপীন গামছা ও বহির্ব্বাস, গেরুমাটী, সাবান, জ্বালানী তৈল, গায় মাখিবার তৈল প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত ও এই দুই ছত্র হইতে হইয়া থাকে। কয়েকজন সাধুকে দেখিলাম রুটি ও ছোট পিতলের বাটীতে করিয়া কিছু ডাইল তাঁহাদের পর্ণকুটীরে নিয়া যাইতেছেন। পাঞ্জাবী ছত্রটী একটী অন্ন ছত্র এবং বন্দোবস্তও ভাল। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বৃহৎ মন্দির আছে তথায় শিখ ধর্ম্মমতে পূজাদি হইয়া থাকে। পীড়িত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একটী ডাক্তারখানা ও থাকিবার জন্য বিস্তর প্রকোষ্ঠ আছে। পরিভ্রমণকারী সাধু সন্ন্যাসীদিগকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। যাত্রীদের রন্ধনের জন্য সারি সারি অনেক উনান আছে, তাঁহারা নিজেরাই রন্ধন করিয়া আহার করিয়া থাকেন। খাদ্যদ্রব্যের জমা খরচ করিবার জন্য লোক

নিযুক্ত আছে। আমরা যে সময় গিয়াছিলাম তখন তথায় কলেরার প্রকোপ ছিল এবং কয়েকজন লোকও মারা গিয়াছিল।

রামনাথ কালীকম্বলী বাবার কৃপায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে হরিদ্বার ও হৃষীকেশের মধ্যে 'সং' নামক নদীর উপর লোহার টানাসেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে, হরিদ্বার ও হৃষীকেশের মধ্যে উত্তম রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, কারণ পূর্ব্বে গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা ছিল, এবং মহাপুরুষের চেষ্টায় সত্যনারায়ণ হইতে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ হইয়া কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ২৫ স্থানে বৃহৎ ধর্ম্মশালা ও মধ্যে মধ্যে কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। হৃষীকেশের ধর্ম্মশালাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আর এখানেই সকল স্থানের হেড্ আফিস। পাঞ্জাবী ছত্রের ন্যায় এখানেও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। এই কম্বলী ছত্রের পার্শ্বে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—একটী ঘরে ডাক্তারী এবং অপর একটী ঘরে কবিরাজী চিকিৎসা হইয়া থাকে। সকল যাত্রীককেই এখান হইতে ঔষধাদি বিতরণ করা হয় এবং হিমালয় ভ্রমণের সময় এখান হইতে আবশ্যকীয় কিছু ঔষধ সঙ্গে দেওয়া হইয়া থাকে। এ প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত থাকাতে যে কত যাত্রীর প্রাণ রক্ষা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কালীকম্বলী বাবা যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হইতে পারে না। এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। পূর্ব্বে এইরূপ কত শত পরমহংসদেব হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। আমরা কাঞ্চন হারাইয়া কাচে মজিয়াছি। ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়া নিজে মজিয়াছি ও দেশকে মজাইতেছি। এখন ধর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাত্রার প্রারম্ভে এই কম্বলী ছত্র হইতে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে যাত্রীরা রাস্তার সকল ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতে পারেন এবং পাতিবার জন্য গালিচা ব্যবহার করিতে পারেন। এই

ছাড়পত্র না থাকিলে যদিও যাত্রীরা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতে পারেন কিন্তু ব্যবহার করার জন্য গালিচা দেওয়া হয় না। প্রমথ বাবু এই ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রতি ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষকে পত্র দেওয়া হয় এবং আমরাও পাতিবার জন্য সকল স্থানেই গালিচা এবং কেদার ও বদরিকাশ্রমে গায় দেওয়ার জন্য কম্বল পাইয়াছিলাম। অন্য স্থানে ধর্ম্মশালার কম্বলের দরকার হয় নাই। আমাদের সঙ্গে যে সব বিছানা ছিল তাহাতেই চলিয়া যাইত। এখানে দেখিলাম কতকগুলি পুরাতন ডাণ্ডী ও ঝাঁপান রক্ষিত হইতেছে। যাত্রীদের মধ্যে যাহাদের দরকার তাহারা এখান হইতে খরিদ করিয়া নিয়া থাকেন।

পাঞ্জাবী ছত্রের নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের একটী সেবাশ্রম আছে। হরিদ্বার ও হৃষীকেশের বাজারে বাঁশের লাঠি বিক্রয় হয়। প্রতি যাত্রীককেই একখানা করিয়া ৪ হস্ত লম্বা লাঠি খরিদ করিতে হয় নচেৎ পথ চলিতে পারিবে না। এত চড়াই উৎরাই করিতে হয় যে বংশযষ্টি ব্যতিরেকে প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

সকলকেই কেনভাসের জুতা পরিয়া রাস্তা চলিতে হয়। প্রতি জোড়া ৷৵০ বা ৸৴ আনায় পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে জুতা আনিলে কিছু দিন যায় নচেৎ ৭।৮ দিনেই এই কাপড়ের জুতা ছিঁড়িয়া যায়। আমার মাতাঠাকুরাণীর ৫ জোড়া জুতার দরকার হইয়াছিল। আমার চামড়ার জুতা ছিল তাহা সত্বেও এক জোড়া কাপড়ের জুতা গুপ্তকাশীতে খরিদ করি, তাহা এক সপ্তাহের অধিক ব্যবহার করিতে পারি নাই। চামড়ার জুতায় শেষে ফোস্কা পরে ও ঘা হইয়া যায়। Water proof coat ও oil cloth বা বর্ষাতি সঙ্গে থাকা দরকার নচেৎ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এ প্রকার কষ্ট হয় যে রাত্রিতে ভিজা কাপড়ে থাকিতে হয় ও ভিজা বিছানায় শয়ন করিতে হয়। পাহাড়ীরা গুলিসূতা,

সূচি ও বেল্দির জন্য যাত্রীদের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করে তাই কতকগুলি সূই সুতা ও বেল্দি সঙ্গে থাকা দরকার।

মোজা সকলেরই ব্যবহার করা দরকার নচেৎ পায় এক প্রকার ছোট ছোট পোকায় কামড়ায় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা হইয়া যায়। একটা ছাতাও দরকার; রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ হইতে দুইটী ছাতা খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম পরে গুপ্তকাশীতে অপর একটী খরিদ করি। গরম কাপড় সঙ্গে রাখিতে হয়। অন্য স্থানে দরকার নাও হইতে পারে কিন্তু কেদার নাথ ও বদরিকাশ্রমে এই সব না হইলেই নয়, নচেৎ শীতে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা।

এখানে পোষ্ট আফিস, পুলিশের থানা ও ইনস্পেক্‌সন্ বাঙ্গলা আছে।

কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা—

পাহাড়ে আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে আটা, চাউল, ডাইল, লবণ মরিচ, ঘৃত, তৈল, সকল চটিতেই পাওয়া যায়। মশলার গুঁড়া সঙ্গে থাকা ভাল, তাহাতে বিস্তর সুবিধা হয়। কাঁচকলা কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। গাছ অনেক আছে কিন্তু অনেকেই বিক্রয় করিতে চায় না। পাহাড়ীরা পাকাইয়া তাহা পয়সায় একটা অথবা দুই পয়সায় একটা হিসাবে বিক্রয় করে। কলার মোচা কশ্চিৎ পাওয়া যায় অনেক চটিতেই আমরা আলু পাই নাই। তরকারীর এত অভাব যে আমরা রাস্তা চলিতে চলিতে শাক পাতা সংগ্রহ করিতাম এবং তাহাই আমাদের প্রধান তরকারীর কাজ করিত। শাকের মধ্যে বেথো, পুনর্ণভা, ডাঁটা, ঢেকিয়া আর পাতার মধ্যে কুমড়া পাতা

নালা চটির নিকট মাঠের মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অরহর ডাইল ছাড়া অন্য ডাইল আমরা পাই নাই। বেসন সঙ্গে থাকা দরকার। প্রমথ বাবুরা কিছু সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কোনও কাজ দেয় নাই। আমার মাতাঠাকুরাণী গোপেশ্বরের চটিতে ।৵৹ আনা সের হিসাবে কিছু খরিদ করিয়াছিলেন। হলদির গুঁড়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। চিনি ও গুড় সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, বড় বড় চটিতে পাওয়া যায় তাহাও অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হয়। আমরা সর্ব্বদাই চিনি সঙ্গে রাখিতাম। নিজে চা খাই এবং সঙ্গে একটী শিশু ছেলে আছে কাজেই মূল্যের দিগে না ভাবিয়া জিনিষের জন্য ভাবনা করিতাম। গরুর দুগ্ধ কদাচিৎ পাওয়া যায়। মহিষ দুগ্ধ সকল চটিতেই মিলে। পেড়া ও মিঠাই বড় বড় চটিতে পাওয়া যায়। ছোলা ভাজা গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত সকল স্থানেই মিলে। কেদার নাথ ও বদরিকাশ্রমে যে ছোলা ভাজা পাওয়া যায় তাহা চিবান যায় না—বড় পুরাতন ও শক্ত হইয়া থাকে। পিপুল কুঠিতে আমরা গরম জিলাপী ও পুরী খরিদ করিয়াছিলাম, তথায় লাড্ডু ও পেড়া বেশ ভাল রকমের পাওয়া যায়। অগস্ত্যমুনির নিকট আমরা বিস্তর কাগজি লেবু সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

পিচ্‌ ফল ও ন্যাসপাতি আমরা কর্ণপ্রয়াগের পর অনেক স্থানে ক্রয় করিয়াছিলাম। যোশীমঠে এক প্রকার ফল পাওয়া যায় তাহাকে গোবী ফল বলে এবং খাইতেও বেশ সুস্বাদু; ইহা লিচুর মত বড় হয়।

পাহাড়ের রাস্তা চলিতে সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রবল বোধ হয় যে ১০টার পর হইতে বিকালে ৩টা কি ৪টা পর্য্যন্ত পথ চলা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে এবং ঘামে সমস্ত জামা ভিজিয়া যায়। কিন্তু রাত্রিতে কোথাও গরম বোধ হয় না, পক্ষান্তরে একখানা গরম চাদর অথবা কম্বল ব্যবহার করিতে হয়।

হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কেদারনাথের রাস্তায় গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত—এবং বদরিনাথের রাস্তায় হনুমান চটি পর্য্যন্ত দিবাভাগে মাছির উপদ্রব এত অধিক যে কোনও খাবার জিনিষ না ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া সমস্ত জিনিষপত্র এমন কি বিছানাপত্রও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। স্থিরভাবে দিনের বেলা কোনও চটিতে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে একটী মাছিও নাই। হিমালয়ের রাস্তায় কোথাও রাত্রিতে মশার উপদ্রব নাই। আমাদের মশারির দরকার হয় নাই। এক প্রকার ক্ষুদ্র মক্ষিকা আছে তাহাদিগকে ঘোড়া বলে, ইহারা দংশন করিলে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং ছোট ছোট ঘা উৎপন্ন হয়। আর এক প্রকার ছারপোকা আছে তাহাদিগকে "পিশু" বলে ইহাদের উকুনের মত রং কিন্তু সাদা। ময়লা কাপড়ে ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। ছারপোকা সর্ব্বত্র নাই। গোপেশ্বরে একটী আবর্জ্জনাপূর্ণ চটিতে রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল তথায় ইহারা অনেক উপদ্রব করিয়াছে। আর কর্ণপ্রয়াগের পর উজ্জ্বলপুর নামক ছোট একখানি চটিতে এই ছারপোকার জন্য সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই—ছটফট করিয়া কাটাইয়াছি ও মধ্যে মধ্যে বাহিরে গিয়াছি। লণ্ঠনের আলোতে সমস্ত রাত শাশুকে পাহারা দিয়াছি, যেন উহাকে ছারপোকায় কামড়াইতে না পারে। এই রাত্রির কথা দীর্ঘকাল মনে থাকিবে—জীবনে এই প্রকার আর কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। মাতাঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ ঘুমাইতে পারিয়াছিলেন এবং শরীরের গ্লানিতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবরে সহ্য করিয়াছিলেন। বিছুর ভয় শ্রীনগরে অধিক। বৃষ্টির সময় জোঁকের উপদ্রবও মধ্যে মধ্যে ভুগিতে হয়।

এখন চটির কথা বলিব।

এইগুলি খোলা বারেন্দা বিশেষ, ঘরগুলি লম্বা, দেওয়াল পাথরের গাথনি ও উপরে শ্লেট পাথর ও মাটি। কাঠের উপর পাথরগুলি বেশ সাজাইয়া দিয়াছে। কোন কোন চটিতে দেখিলাম উপরে এত ভার পড়িয়াছে যে তাহা প্রায় পড়ে পড়ে হইয়া আছে। কোন কোন স্থানে ইহা ছাপ্পর বিশেষ। যে সব স্থানে ধর্ম্মশালা আছে তাহা পাকাঘর, খোলাও বা টিনের ছাদ বিশিষ্ট। মোটের উপর চটি অপেক্ষা ধর্ম্মশালায় থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং সুবিধাজনক। চটির এক পার্শ্বে চলিওয়ালার দোকান। কোনটিতেই দরজা নাই, তিনধারে দেওয়াল ও একধার খোলা এবং সারি সারি উনুনে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রথম আমরা দ্বিতল চটি পাইয়াছিলাম। তাহা ছাড়া গুপ্তকাশী, গৌরীকুণ্ড, কেদার নাথ, ওখীমঠ, লালসাঙ্গা (ধর্ম্মশালা), পিপল কোঠী, যোশীমঠ, হনুমান চটি (ধর্ম্মশালা) এই সব স্থানের চটিগুলিও দ্বিতল ও বেশ আরামে থাকা যায়। কালীকম্লী বাবার সকল ধর্ম্মশালাই দ্বিতল এবং পাকা বাড়ী। ধর্ম্মশালার বারেন্দায়ও আমরা থাকিতাম। কুঠরীগুলি অন্ধকার ও বায়ু চলাচল সহজে করিতে পারে না। শুনিলাম প্রতি বৎসরই প্রত্যেক চটিতে একজন করিয়া সরকারী মেথর নিযুক্ত থাকে কিন্তু রাস্তা বন্ধ হওয়াতে আমরা কোন চটিতেই মেথর দেখি নাই। মাত্র শ্রীকোট চটিতে একজন মেথর দেখিয়াছিলাম। চটির নিকটবর্ত্তী হইলেই ময়লার এত দুর্গন্ধ বাহির হইত যে বুঝিতে পারিতাম নিকটে চটি আছে। ঘর ভাড়া কিছুই লাগে না, তবে দোকানীর নিকট হইতে খাবার জিনিষপত্র খরিদ করিতে হয়, নচেৎ থাকিতে দেয় না। চটিওয়ালা যাত্রীদিগকে, ঘড়া, পিতলের হাঁড়ি, ও থালা যোগাইয়া থাকে, তাহার জন্য কিছু দাবী করে না।

কয়েক স্থানে আমরা ঘর ভাড়া দিয়াছি, কারণ সকল জিনিষপত্র আমাদের সঙ্গে থাকিত, কাজেই দোকানীর নিকট হইতে কিছু খরিদ করিতাম না। দুই তিন চটিতে জিনিষপত্র সঙ্গে থাকা সত্বেও চটিতে পৌঁছিয়া চাউল, ডাইল ইত্যাদি খরিদ করিতে হইয়াছিল। এ বৎসর সকল চটিই এক রকম বন্ধ কারণ যাত্রীক নাই—প্রতি চটিতে একখানা কোথাও বা দুইখানা দোকান খোলা ছিল। এই সব কারণে সর্ব্বদাই আমাদের খাবার জিনিষপত্র সঙ্গে রাখিতে হইয়াছে।

সঙ্গে পাণ্ডা অথবা তাহার গোমস্তা থাকিলে তাহাদের দিয়া রন্ধন কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। তা ছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে। কাণ্ডীওয়ালা বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়, তজ্জন্য তাহাকে অতিরিক্ত পুরস্কার দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহাকে দিয়া রন্ধন কার্য্যও করাইয়া নেওয়া যায় তবে তাহাকে খাইতে দিতে হয়। কাণ্ডী ও ঝাঁপান ওয়ালাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ ও ছত্রী আছে।

নোট প্রধান প্রধান স্থানে ভাঙ্গাইতে পারা যায় কোথাও বা বাটা দিতে হয়। নিম্নলিখিত স্থানে নোট ভাঙ্গান যায়। দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, কেদারনাথ, ওখীমঠ, লালসাঙ্গা, পিপলকোটী, যোশীমঠ, বদারিকাশ্রম, নন্দপ্রয়াগ কর্ণপ্রয়াগ। প্রমথ বাবু গোপেশ্বরেও নোট ভাঙ্গাইয়াছিলেন। টাকা পয়সা কোমরে থলিয়ার মধ্যে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। চটির দোকানদারেরা এবং কাণ্ডী ও ঝাঁপান ওয়ালারা নোট গ্রহণ করে না।

কর্ণপ্রয়াগের পর হইতে চটির অবস্থা খুব খারাপ দেখিয়াছি তবে মধ্যে মধ্যে ভাল চটিও পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহা সংখ্যায় খুব কম। নন্দপ্রয়াগ হইতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ভাল চটি নাই বলিলেও হয়। চোখাটীয়ার পরে চটির অবস্থা একেবারেই খারাপ।

যাত্রা

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—

গত রাত্রিতে আমরা এবং হরিপদ বাবু ইনস্পেকসন্ বাঙ্গলায় বারেন্দায় বিছানা করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম, ভিতরে অত্যন্ত গরম। আমরা শুইয়াছি তখনও ঘুম আসে নাই এমন সময় মাতাঠাকুরাণী বলিলেন যে তাঁহাকে কি যে যেন পায় আঙ্গুলে কামড়াইল, অমনি বাতি দিয়া বিছানা দেখিলাম কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমরা মনে করিলাম বিচ্ছু হইবে। তাহার জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল—রাত্রিতে আর ঘুমাইতে পারিলেন না—অধিকাংশ রাত্রিই ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইলেন। সকালে বেদনার উপশম হইল।

পূর্ব্বদিনের বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ৭টার সময় যাত্রা করিলাম। আমার সহিত মাতাঠাকুরাণীও গেল। হরিপদ বাবু বলিলেন তিনি স্বর্গাশ্রমে কিছুদিন থাকিবেন। তিনিও আমাদের সহিত রওনা হইলেন। যে তিনজন কুলি রাখিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন অমত প্রকাশ করাতে ফিরিয়া গেল।

অপর দুইজনের মধ্যে একজন আমাদের বিছানা বহন করিল আর একজন শান্তিকে কোলে করিয়া চলিল। অন্য মাল একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া দিলাম। প্রমথ বাবুরা কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলাম। প্রমথবাবুর সঙ্গে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী, পত্নী, দুইজন শ্যালিকা ও একজন শ্যালীর কন্যা, (কলিকাতা করপোরেসনের একজন ইঞ্জিনিয়ারের পত্নী)। আর তাঁহাদের সঙ্গে আছেন একজন সাধুজী (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে), এখন তাঁহার নাম

রঙ্গতানন্দ ব্রহ্মচারী। হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার গুরুজী শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি তাঁহাকে ভগ্ন বস্ত্র দান করিয়া এই নাম দিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে বহন করিয়া নিতে প্রমথ বাবু হরিদ্বার হইতে একখানা ঝাঁপান ও মাল বহন করিতে ২ জন কুলি বন্দোবস্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা একদলে কুলি সমেত মোট ১৯ জন হইলাম। আর দেবপ্রয়াগের পাণ্ডা ও তাহার একজন গোমস্তা কৃষ্ণা আমাদের সঙ্গে চলিল।

কেদারনাথের পাণ্ডা লক্ষণঝোলা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন পরে হরিদ্বারে ফিরিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া গেলেন যে তাঁহার ভ্রাতা গুপ্তকাশীতে আসিয়া আমাদিগকে কেদারনাথ নিয়া যাবেন।

প্রমথ বাবুর সঙ্গে যে সাধুজী চলিয়াছেন তাঁহার জন্মস্থান পালং (ফরিদপুর) এর অন্তর্গত: বিলাসখান গ্রামে। বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী আছেন। তিনি এখন সংসার ত্যাগী নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। টাকা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার পত্নী ও কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের বিয়োগের পর হইতেই তিনি উদাসীন। ধর্ম্ম কর্ম্মে উন্নতিসাধন করিতে হইলেই মনকে সংসার চিন্তা হইতে বিরহিত করিতে হইবে। মনকে অগ্রে স্বাধীন করিতে পারিলে হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উদারতা লাভ হয়। সংসারে অনাটন থাকিলে সংসারীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। এই সাধুজীরও তাহাই ছিল। ইহাতে মানুষের মতিচ্ছন্ন উপস্থিত হয়, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নষ্ট হয় এবং চিত্তবৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারে না; মোটের উপর মানবকে মনুষ্যত্ব বিহীন করিয়া ফেলে। যে সংসারে কাজের লোক তাহার সকল আনন্দও বিলুপ্ত হয় এবং তাহাকে জড়-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলে। এই অনটনে পড়িয়া সে এতদূর হীনপ্রভ হয় যে তাহাকে অন্য কিছুতেই এ

প্রকাশ করিতে পারেনা। এখন আমার সাধুজী সর্ব্বত্যাগী। এই লোকটীকে সঙ্গে পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। প্রমথ বাবু লালতারা বাগের আশ্রম হইতে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। লক্ষণঝোলায় উপস্থিত হইয়া সেতু পার হইয়া দেখিলাম যে দারগা সাহেব তথায় নাই, তিনি হৃষীকেশ গিয়াছেন এবং না আইসা পর্য্যন্ত আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিব না। আমরা থানার সম্মুখে বসিয়া আছি এমন সময় আমার বিছানা বহনকারী লোকটাকে বলিলাম যে তুমি অগ্রসর হইয়া যাও কি জানি দারগা আসিয়া হিন্দুস্থানী লোক দেখিয়া আপত্তিও করিতে পারে, ঘোড়াওয়ালা ও যে লোকটা শান্তিকে কোলে করিয়া আনিয়াছিল তাহারা সঙ্গে থাকিল। নিকটেই ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আমরা তথায় যাইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। আমাদের এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হরিপদ বাবু স্বর্গাশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সহিত একবার শেষ দেখা করিয়া যাওয়ার জন্য পাণ্ডার লোকটীকে দিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র পাঠাইয়া দিলাম। স্বর্গাশ্রম লক্ষণঝোলা হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। তিনি পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিলেন। আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার হিন্দুস্থানী লোকটী হেড কনষ্টেবলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। সে বলিল এই লোকটা কেন? হরিপদবাবু ও প্রমথ বাবু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে অন্য কুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহাকে আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি কিন্তু জমাদার সাহেব বলিয়া গেলেন দারগাকে রিপোর্ট করিবেন। আমরাও ঠিক করিলাম দেখা যাউক কি হয়—সময় মত বিধি ব্যবস্থা করিব।

হৃষীকেশ ও লক্ষণঝোলার মধ্যে একটী ঋষিকুল বিদ্যালয় আছে।

মহর্ষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—এই আশ্রমটী এখন এখানকার ধর্ম্মশালায় অবস্থিত এবং মোহন্তবাম উদারজীর (ফলাহারী বাবা) চেষ্টায় খোলা হইয়াছে। এখানে দেখিলাম ছোট ছোট সকল বালকেরা পূর্ব্বকালের আর্য্যঋষি সন্তানদের ন্যায় অধ্যয়ন করিতেছে। কতগুলি ছেলে আছে তাহা আমার স্মরণ হয় না তবে ৩০।৪০ জনের মত দেখিয়াছিলাম। এখানে ব্যকরণের তিন বিষয় এবং ন্যায় ও বেদান্ত শিক্ষা দান করা হয়। পাটিগণিত, ইতিহাস এবং ভূগোলও পড়ান হইয়া থাকে।

এই মহর্ষিকুলের উন্নতি কামনা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। যে যাহা চাঁদা দিতে পারেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ম্যানেজার, মহর্ষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, লক্ষ্মণঝোলা, পোঃ হৃষীকেশ এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে হয়।

অপরাহ্ন ৪।০ ঘটিকার সময় আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। আমরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম যে দলে আমরা অনেক লোক এই ভিড়ের মধ্যে সেই পূর্ব্বোক্ত লোকটাকে দিব তবে বোধ হয় আর পুলিশের লোক ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে না এবং বাধা বিঘ্নও ঘটাইবে না। দারগাকে সেলাম করিয়া আমরা থানার সম্মুখ দিয়া চলিয়া আসিলাম কেহ কোনও প্রকার আপত্তি করিল না, আমাদেরও আপদ কাটিয়া গেল। হরিপদ বাবু, হরেন্দ্র বাবু ও কেদারনাথের পাণ্ডার লোক কিছু দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পরে তাঁহারা বিদায় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হরিপদ বাবুকে বিদায় দেওয়ার কালীন আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। এ জীবনে বোধ হয় আর এই বন্ধুটির সহিত দেখা হইবে না। এখনও তাঁহার সহিত পত্র আদান প্রদান করিতেছি। তাঁহার পত্র পাইলে মনে যে

কত শান্তি পাই তাহা বলিতে পারি না। বদরীনারায়ণ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখে রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

চটির বিবরণ

গরুড়—২ মাইল পরে গরুড় চটি পৌঁছিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। এখানে দেখিলাম কলার বাগান, নেবুর ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছ আছে, চটিতে কয়েকখানা ঘর কিন্তু দোকান নাই। একটী সুবৃহৎ চৌবাচ্চা আছে, তাহাতে সাঁতার কাটা যাইতে পারে নিকটের ঝরণার সহিত পাইপ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বদরিনারায়ণের কয়েকজন যাত্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহাদের সঙ্গে ঝাঁপান প্রভৃতি আছে। পরে রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় ফুলবাড়ী চটিতে উপস্থিত হইলাম।

ফুলবাড়ী—আজ আমাদের হিমালয় ভ্রমণের প্রথমদিন অতিবাহিত হইল। রাস্তা পর্ব্বতের গাত্র দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ডান ধারে ভাগীরথী। রাস্তা প্রায় ৪ হাত প্রশস্ত। চটির ঘড় কয়খানা খালি পড়িয়া আছে। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে—টিনের চাল ও পাথরের দেওয়াল তথায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নিকটেই গঙ্গা তথায় আমরা হাতমুখ ধুইয়া আসিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী খিচুড়ী পাক করিয়া দিলেন। তাহাই আহার করিয়া আমরা খোলা প্রাঙ্গণে শয়ন করিলাম। এই ধর্ম্মশালার একধারে একজন লোক বাস করে তাহার গরু আছে। তাহার নিকট হইতে চারি আনা পয়সা দিয়া অর্দ্ধ সের দুগ্ধ খরিদ করিলাম।

২য় দিবস, রবিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ—

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা গঙ্গাকে পিছনে ফেলিয়া হিউলিনদীর পার দিয়া রওনা হইলাম।

গুলায়—গুলার চটিতে কয়েক খানা ঘর মাত্র আছে, লোকজন নাই।

মোহন—হিউলিনদীতে টানা লৌহ সেতু পার হইয়া অল্প অল্প চড়াই ভাঙ্গিয়া মোহন চটিতে উপস্থিত হইলাম। এই চটির ঠিক নিম্নে হিউলিনদী। শান্তিকে যে কুলিটা নিয়াছিল সে আর অগ্রসর হইতে একেবারেই নারাজ হইয়া পড়িল। এ স্থানে এখন কোথায় লোক পাই—লোকটার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম আমাদিগকে বিদায় দিয়া সে একাই রওনা হইবে। পরে তাহাকে স্তুতি মিনতি করিয়া এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া অনেক কষ্টে রাজি করিয়া রওনা হইলাম। এখান হইতেই প্রকৃত চড়াই আরম্ভ হইল। মোহনচটিতে পৌছাইবার পূর্বে চলিতে চলিতে দেখিলাম পার্শ্বপার্শ্বে স্থানে স্থানে পাইপ হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। পর্ব্বতের উপরিভাগস্থিত ঝরণার জল হইতে পাইপ বসাইয়া পথশ্রান্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছোট বিজনী—ছোট বিজনী চটিতে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় বিশ্রাম করিলাম—শরীর বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে। এই চটি পর্ব্বত গাত্রে অবস্থিত এবং এখানেও পাইপের জলের বন্দোবস্ত আছে। আমার মাতাঠাকুরাণী ও প্রমথবাবুর পরিবারবর্গ পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। বিশ্রামান্তে তাঁহারা রওনা হইলেন। আমি, শান্তি ও প্রমথ বাবু কিছু সময় বিশ্রামান্তে রওনা হইলাম। রাস্তাতে দেখিলাম বেল গাছের বন—ছোট ছোট অনেক পরিপক্ক বেল গাছে

ঝুলিতেছে। আমরা কতকগুলি আমাদের বংশ যষ্ঠি দ্বারা পারিলাম। কিছুদূর চলিয়া বদ্রীর ফেরৎ একদল যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন আমরা "জয় বদরীবিশাল লালাকি জয়" "জয় কেদারনাথকী জয়" ইত্যাদি স্বরে আহ্বান করিলাম। প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। বড় বিজনী চট পৌঁছিবার পূর্ব্বে সরকারী বাংলা। একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। বাংলার নিকটে কোথাও নাই জল। জলের দরকার হইলে চটিতে আসিতে হয়।

বড় বিজনী—বড় বিজনীতে আমরা ১১৷৷০টার সময় উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। আমরা সকলেই একখানা দ্বিতল চটিতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম আর প্রমথ বাবুর মাতা-ঠাকুরাণী অন্যস্থানে তাঁহার রান্নার যোগার করিলেন। তিনি নিজ হস্তে রান্না করেন, অপর এমনকি তাঁহার পুত্রবধুর হাতের রান্নাও খান না এবং অপর লোক যে ঘরে থাকে সে ঘরেও রান্না করেন না। এইসব কারণে সমস্ত রাস্তায় তাঁহাকে নিয়া প্রমথ বাবুর অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। একখানা চটির ঘর গতকল্য আগুণে ভস্মসাৎ হইয়াছে তাহার স্তুপীকৃত ভস্ম এখনও পড়িয়া আছে।

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় পুনরায় রওনা হইলাম। আজ আমাদের প্রথম চড়াই হইল। এ প্রকার চড়াই কেদার নাথ ও তুঙ্গনাথ ছাড়া আর কোথাও নাই। এখানে ঘৃত তিন টাকা সের। প্রাকৃতিক দৃশ্য এখান হইতে খুব সুন্দর। দূরে পাহাড়ের গায় গ্রামগুলি অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল।

কুণ্ড—কুণ্ড চটিতে সাপের ভয় ও জলাভাব। গত বৎসর এখানে একজন যাত্রীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল। চটির সন্নিকটে রাস্তায় জলছত্র আছে এবং মহিষের দধি ও গরম দুগ্ধ ক্রয় করিতে পাওয়া

যায়। আজ প্রথম দিনের চড়াই ও উৎরাই রাস্তাতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্তবোধ হইতে লাগিল। চড়াই উঠিবার সময় ঘন ঘন নিশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ঘন ঘন স্পন্দনে সকলকেই ক্লান্ত করিয়া ফেলে। আর উৎরাই এর সময় মনে হয় যেন উপর হইতে কেহ ধাক্কা মারিতেছে। বিজনী চটির প্রায় ২ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি কালীকম্বলী বাবার একটী জলছত্র আছে। আমরা তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে পুনরায় গঙ্গার দর্শন লাভ করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। এখান হইতে বহু নিম্নে গঙ্গাকে একটী অতি ক্ষুদ্র খালের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। এই স্থান হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল।

বান্দর—বান্দর চটিতে সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার লণ্ঠনে তৈল ছিল না। চটিওয়ালার নিকট হইতে ৵০ আনার সামান্য তৈল ক্রয় করিয়া বাতি জ্বালিলাম। এখানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে তাহার পাদদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য বান্ধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চটি ঠিক গঙ্গার উপরে অবস্থিত।

৩য় দিবস, ৩০ জ্যৈষ্ঠ—

অতি প্রত্যূষে রওনা হইয়া একটী পাহাড়ের চড়াইতে উঠিতে থাকি। এক মাইল উপরে কালীকম্বলী বাবার একটী জলছত্র আছে, তথায় কিছু সময় বিশ্রামান্তে আবার উৎরাই করিতে করিতে দেখিলাম একটী লোকের বুকের উপর একটী প্রকাণ্ড স্ফোটক হইয়াছে। লোকটা কষ্টে রাস্তা চলিতেছে, সে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে। যে সব কাষ্ঠের স্লিপার গঙ্গা দিয়া ভাসিয়া যায় তাহা স্থানে স্থানে আটকাইয়া যায়—

এই গুলিকে ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্য ঠিকাদার আছে। এই প্রকার বিস্তর স্লিপার গঙ্গা বক্ষে ভাসিয়া যাইতে দেখিলাম।

শুনিলাম গঙ্গোত্তরীর নিকট হইতে বড় বড় গাছের স্লিপার তৈয়ার করিয়া গঙ্গা দিয়া ভাসাইয়া দেয় এবং হরিদ্বারের নিম্নে ইহাদিগকে ধরা হয়। এই লোকটিকে বলিলাম যদি তুমি আমার সহিত নিকটবর্ত্তী চটিতে যাও তবে তোমার এই স্ফোটক কাটিয়া দিতে পারি, ইহাতে বেদনার উপশম হইবে এবং শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে। লোকটী স্বীকৃত হইল।

মহাদেব—পরে মহাদেব চটিতে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রোপচার করি ও ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিলাম যে হৃষীকেশ যাইয়া কালীকম্বলী বাবার হাস্পাতালে ঔষধ লাগাইবে। এখানে কয়েকখানা ঘর ও মহাদেবের মন্দির ও ডাকের বাক্স আছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক মাইল ব্যবধানে সরকারী ডাকবাংলা ও জলসত্র আছে।

সিমলা—ঝাঁপান ওয়ালাদের বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা সিমলা চটিতে আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকিবে কিন্তু আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম সব শূন্য, লোকজন কিছুই নাই। চটির ঘর কয়খানি মাত্র আছে—লোকও নাই জনও নাই। ঝাঁপান ওয়ালাদের উপর বড়ই বিরক্ত বোধ হইল। আর শাস্ত্রীকে যে লোকটা কান্ধে করিয়া আনিতেছিল সেও নাই। মনে বড়ই ভয় হইল। আমরা অনুমান করিলাম যে এই চটি শূন্য থাকাতে বোধ হয় সামনের চটিতে যাইয়া তাহারা অপেক্ষা করিতেছে।

এক স্থানে দেখিলাম রাস্তাটী ঠিক খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া গিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া এ ভাবে রাস্তা করা হইয়াছে যেন রাস্তার

উপরে পাহাড় ছাতার ন্যায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর রাস্তার কিনারে নদীর ধারে পাথর দিয়া সামান্য দেওয়াল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কাহারও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার পাথরের প্রাচীর দেওয়া রাস্তা হিমালয়ের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি। মোটের উপর যাত্রীদের সুবিধার জন্য যতটা সম্ভব করা হইয়াছে।

আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর হাটিতে ইচ্ছা করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলিতে আরম্ভ করিলাম। শান্তির জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মনে হইল সে বোধ হয় এখন কাঁদিতেছে, কুলিরা সকলেই অপরিচিত। এই সময় প্রবল রৌদ্রের তেজ, এবং পিপাসাও খুব বোধ হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি জলসত্র আছে, তথায় আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। যে লোক জল দিতেছিল সে বলিল নিকটে আর ঝরণা নাই। একস্থানে দেখিলাম পাহাড়ের গা হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে, সাধুজীর কমণ্ডলু যদিও খুব ছোট, তাহা পূর্ণ করিতে প্রায় ১৫।২০ মিনিট সময় লাগিল। আমি এই কমণ্ডলু নিজের হাতে রাখিলাম— ক্রমাগত চড়াইয়ের রাস্তায় চলিতে চলিতে এত পিপাসা বোধ হইতে লাগিল যে মনে হইল সব জলটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলি কিন্তু আবার ভয় হইল জল ফুরাইয়া গেলে কোথায় পাইব তাই ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জিহ্বা ভিজাইতে ভিজাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় ২ মাইলের পর এক স্থানে দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড আম্র বৃক্ষ, আর পাইপ হইতে হু হু করিয়া জল পড়িতেছে। তথায় কিছু সময় বিশ্রামান্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইতে চটি দেখা যায়।

কাণ্ডী—কাণ্ডী চটিতে পৌঁছিয়া প্রথমেই ডাক দিলাম "শান্তি"! সে অমনি একখানা দ্বিতল ঘরে দাঁড়াইয়া আমাকে "বাবা" বলিয়া

উত্তর করিল। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রাস্তার কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

এখানে পরিষ্কার জলের ঝরণা হইতে অবিশ্রান্ত প্রবলবেগে জল পড়িতেছে। আমরা স্নান ও আহারাদি করিতে করিতে বেলা প্রায় শেষ হইল। এখানে কয়েকখানা ঘর ও দোকান পাট আছে। চটির নিকটে শ্রীগোপাল জিউর মন্দির, ধর্ম্মশালা, তাহার পর একটী উচ্চ স্থানে ডাক্তারখানা। এখান হইতে সম্মুখের গ্রামগুলির দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। বোধ হয় যেন বিধাতা স্তরে স্তরে গ্রামগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

এই চটিতে অনেক কাঁচকলা গাছের বাগান ও আম্র বৃক্ষ আছে। নিকটে অনেক গ্রাম। গ্রামের গরুগুলি দলে দলে পর্ব্বতের উপর চড়িয়া বেড়ায় আর ঝরণার জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করে।

আজ আর বাহির হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বেলাও প্রায় অবসান আর জিনিষপত্র বান্ধাবান্ধি করিতেও সময় লাগিবে। প্রমথ বাবুর দলে অনেক লোক হাতাহাতি কাজ করিতে কাহারও গায় বাঁধে না কিন্তু আমি একা। আমার মাতাঠাকুরাণীকে বাঁন্ধাবাঁন্ধির ভার বড় একটা দিতাম না। বিছানা বাঁন্ধা, বাসনপত্র ও টোপলা টুপলি বাঁন্ধা এবং তাহা বস্তার মধ্যে ভরা এই সব এক চলুস্থূল ব্যাপার। বিরাট ব্যাপার হইলেও বাধ্য হইয়া করিতে হইত। একবার সকালে আর একবার অপরাহ্নে। প্রমথ বাবু বলিলেন আমি সাহায্য করিতেছি এক সঙ্গেই চলুন। তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলাম এবং পরে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণীকে পূর্ব্বেই প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত রওনা করিয়া দিয়াছি। সঙ্গে এত গুলি মেয়ে লোক থাকাতে রাস্তা চলিতে

সকলেরই অনেক কষ্টের লাঘব হয়। দুই মাইল প্রায় সোজা রাস্তায় চলিয়া পরে উৎরাই আরম্ভ হইল। মধ্যে এক স্থানে ঝরণা আছে তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া নিলাম। এক মাইল উৎরাইর পর ব্যাস গঙ্গার উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু পার হইলাম। অনেক রাত্রি হইয়াছে—অষ্টমীর জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা সর্ব্বদাই অন্ধকার। গঙ্গা ও ব্যাস গঙ্গার সঙ্গমস্থল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৪১৪ ফিট উচ্চ আর হরিদ্বার হইতে ৪৯ মাইল। সেতুর প্রান্তভাগ হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, একটী দেবপ্রয়াগ ও অপরটী নাজিরাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ব্যাসঘাট—এই স্থানটী একটী উপত্যকা। এখানে বেদব্যাস তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানের নাম ব্যাসঘাট। ব্যাস-দেবের মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি আছে। আমরা কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমাদের পৌছিতে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। আজ আমরা ১৪ মাইল হাটিয়াছি। এ স্থানটী বড়, অনেকগুলি ঘর, ধর্ম্মশালা ও ডাকঘর আছে। আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। চটির ঘরগুলিও দ্বিতল। আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলের বারেন্দায় বিছানা করিলাম। অনেক গরম বোধ হওয়াতে প্রথমে ভাল ঘুম হয় নাই।

৪র্থ দিবস, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ—

প্রত্যুষে ব্যাসদেবের মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এই নির্জ্জন প্রদেশে ঘণ্টাধ্বনি কি মধুর বোধ হইতে লাগিল। আমরা একে একে সকলেই মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। যেস্থানে মহর্ষি ব্যাস কতকাল তপস্যা করিয়াছিলেন সেস্থানে আসিয়া যে মাথা লুটাইতে

পারিব তাহা কখনও ভাবি নাই। হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরে কত শত লোক রজোরাশি স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে কত শান্তি অনুভব করিয়াছেন তাহা কে বলিবে।

আমরা প্রণামান্তে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সঙ্গমস্থলে (ব্যাস-প্রয়াগে) সকলেরই স্নান তর্পণ করা কর্ত্তব্য। সেতুর নিকটে একটী শিব মন্দির আছে এবং তাহার নিকটে ব্যাসগঙ্গা ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। ধর্ম্মশালার নিকটে যে সমতল ক্ষেত্র আছে তাহাতে গমের চাষ হইয়া থাকে।

আমি আমার মাতাঠাকুরাণীকে সুই সুতা ও বোতাম দিয়া বলিয়া দিলাম যে এসব পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোক অথবা ছেলেপেলেদের দিতে হইবে। ব্যাসচটি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে আর একখানা ব্যাসদেবের মন্দির আছে ইহা অত্যন্ত প্রাচীন এবং মন্দিরে ব্যাসদেবের পুত্র হইতে প্রপিতামহ পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের বিগ্রহ আছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রঘুনাথজীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মন্দির এখনও নির্ম্মাণ হয় নাই। এই স্থানটী বেশ নির্জ্জন, একজন সাধু তথায় বাস করেন। আম গাছ, নেবুর বাগান ও কলা গাছ আছে। সাধুকে বলাতে আমাদিগকে কয়েকটা নেবু দিলেন। রাস্তা চলিতে চলিতে স্থানে স্থানে সারি সারি আম্র বৃক্ষ দেখিলাম।

উমরাসু—৫ মাইল দূরবর্ত্তী উমরাসু চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলাম। দ্বিতলঘর এবং জলের পাইপ আছে। জল বেশ পরিষ্কার ও সুস্বাদু। চটির মধ্যে গঙ্গার ধারে সারি সারি আম্র বৃক্ষে অনেক ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে কিন্তু এখনও পাকে নাই।

সাউরু—এই চটি খালি পড়িয়া আছে—একখানা নামে মাত্র দোকান আছে। এখানেও বিস্তর আম গাছ দেখিলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেবপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম।

দেবপ্রয়াগ

প্রায় এক মাইল দূর হইতে দেবপ্রয়াগের দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। এ প্রকার দৃশ্য ত জীবনে আর কখনও দেখি নাই। সহরের এ প্রকার পরম সুন্দর দৃশ্য হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও নাই। ভাগীরথীকে বোধ হইতে লাগিল ইহা যেন একটী খাল সমানভাবে প্রায় এক মাইল রাস্তা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে আর পাহাড়ের গায় গ্রামগুলির সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। লাল, কাল, সাদা ঘরগুলি দূর হইতে দেখিলে ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা নিজের হস্ত কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই ঘরটী দ্বিতল এবং পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ আছে। আমরা বারেন্দায় গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর আমাদের বিছানা পাতিলাম। বারেন্দার সংলগ্ন অন্ধকারময় ছোট প্রকোষ্ঠে আমাদের জিনিষপত্র রাখিলাম। প্রমথবাবুর মাতা ভিতরে শয়ন করিলেন। বাতাস বন্ধ হওয়াতে বারেন্দার মধ্যেই আমাদিগকে গরমে অস্থির করিয়া উঠাইল কিন্তু প্রমথবাবুর মাতা কুঠুরীর ভিতরই শয়ন করিলেন। এই প্রকোষ্ঠে বায়ু চলাচল একেবারেই নাই। ছোট একটী খিরকি আছে তাহাও প্রায় তিন হাত উর্দ্ধে।

দেবপ্রয়াগ গঙ্গা এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানে অনেকগুলি দোকান পাঠ আছে। এপার বৃটিশ গাড়োয়ালের অন্তর্গত—এখানে সরকারী বাংলা, ডাকঘর, তার অফিস, থানা ও ধর্ম্মশালা আছে।

এখানে অনেকগুলি দোকান আছে। ছাতা, জুতা, কাপড়, প্রভৃতি সকল জিনিষপত্রই পাওয়া যায়। ভাল মিষ্টান্নের দোকানও কয়েকখানা আছে। এখানে পানের দোকান নাই তবে একজন লোক মধ্যে মধ্যে মুরাদাবাদ হইতে ডাকে পান আনাইয়া থাকে এবং তাহাই বিক্রয় করে। হৃষীকেশ হইতে যে পান আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া যাওয়াতে পানের তালাস করি এবং পয়সায় একটী করিয়া ছয় আনার পান খরিদ করি। ইহার পর হিমালয়ের মধ্যে আমরা আর কোথাও পান পাই নাই। পানর পরিবর্ত্তে শুপারি ও লৈজন খাইয়াছিলাম। সঙ্গে হরিতকী, লৈজন, শুপারি, ইত্যাদি মশলা থাকা দরকার কারণ এ সব সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। শুপারি মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়।

আমরা যে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম তাহা অলকানন্দার বামতীরে "বা" সহরে অবস্থিত। ইহা বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত এবং এ স্থানেই ডাকঘর ও থানা। অলকানন্দার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ তীরে দেবপ্রয়াগ। নদী পার হওয়ার জন্য লৌহনির্ম্মিত ২৮০ ফুট দীর্ঘ ঝুলান সেতু আছে।

দেবপ্রয়াগ সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৫৫০ ফুট উচ্চ এবং সংযোগ স্থানের জল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৪৮৩ ফুট উচ্চ। এই স্থান টিহরী রাজের অন্তর্গত একটী সবডিভিসন। এখানে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার কাচারী আছে। টিহরী রাজের ব্যয়ে একখানা সরকারী ডাক্তারখানা আছে, তথায় একজন সব-এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন আছেন। "বা" এবং দেবপ্রয়াগ

উভয় স্থানেই ভাল ভাল দোকান আছে, দেবপ্রয়াগে রামচন্দ্রের একটী বৃহৎ মন্দির আছে। এখানে বদ্রীনাথের পাণ্ডারা বাস করিয়া থাকেন। যাত্রীদের থাকিবার জন্য পাণ্ডারা তাহাদের নিজের বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। "বা" সহর হইতে বদ্রীনাথের রাস্তা অলকানন্দার তীর দিয়া গিয়াছে আর দেবপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দার তীর দিয়া একটি দুর্গম পথ গাড়োয়ালের বর্ত্তমান রাজধানী টিহরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। টিহরী এখান হইতে প্রায় ২৫ মাইল।

এখানে সকল পাণ্ডারই বাসাবাটি আছে কিন্তু তাহাদের ঘর নিকটবর্ত্তী গ্রামে। এখানে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডা আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, সৌরাষ্ট্রী ও দাক্ষিণী ব্রাহ্মণই অধিক। এখানে "বা" সহরে এক খানা মুসলমান দোকান দেখিলাম কিন্তু দেবপ্রয়াগে মুসলমান নাই।

হৃষীকেশ হইতে যে ২ জন লোক আমার সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা আমার জিনিষ পত্র ধর্ম্মশালায় রাখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। অপর একজন পাণ্ডার নিকট চলিয়া গেল। পর দিবস দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবপ্রয়াগে ছিল পরে তাহারা কেদার কি বদরী নারায়ণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের সহিত আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

৫ম দিবস, ১লা আষাঢ়—

সকালে উঠিয়া আমরা পাণ্ডা শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ও শ্রীযুক্ত রাম রতনের সহিত দেবপ্রয়াগে রওনা হইলাম। অলকানন্দার সেতু পার হইয়া দেবপ্রয়াগ পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে অনেক দোকান, রাস্তা প্রস্তর দিয়া বাঁধান। সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি জলের কি ভীষণ গর্জ্জন। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলের নাম দেবপ্রয়াগ। এই স্থানে উভয় নদী ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ধাবিত

হইয়া এক স্থানে সংযোগ হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিয়াছে। কি প্রবল জলের স্রোত, কি উচ্ছৃঙ্খল বেগ তাহা না দেখিলে মনে ধারণা হইতে পারে না। জলের উপর বহু ফেন ভাসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এই সঙ্গম স্থানে একখানা প্রকাণ্ড শিলা আছে তাহাই কাটিয়া সিঁড়ি বানান হইয়াছে। স্নান করিবার জন্য সিঁড়ির দুই ধারে দুইটী মোটা মোটা লৌহ নির্ম্মিত শিকল আছে, তাহাই ধরিয়া সকলে স্নান করিয়া থাকেন। একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই।

সঙ্গম স্থানে আমরা স্নান ও তর্পণ করিলাম। আমি নদীর কিনারায় বসিয়া তর্পণ করিতেছি এমন সময় বোধ হইল নদীতে কি একটা আমার নিকটে আসিয়াছে আমি শঙ্কিত হইয়া পিছনে সরিয়া আসিলাম। একজন লোক বলিল এটা মাছ। এখানেও যে মাছের নির্ভীকতা আছে তাহা জানিতাম না। পরে পিণ্ডদান করিয়া যখন এই সব পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলাম তখন দেখিলাম কত বড় বড় মাছ কিনারে আসিয়া তাহা খাইতেছে। কোনও প্রকার ভয় নাই। ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ২।৩টা উঠাইয়া আনা যায়। এখানেও হরিদ্বারের ন্যায় হিংসা নাই। অযোধ্যাতে দেখিয়াছিলাম কচ্ছপের খেলা আর এখানে দেখিলাম মাছের খেলা। আমি কয়েকটী মাছকে স্পর্শ করিলাম এবং গিন্নিকেও করাইলাম কিন্তু সে ভয় পায়। সঙ্গমস্থলে নামিবার সিঁড়ির উপরে কতটুকু সমতল স্থান আছে। পাথর কাটিয়া এই স্থানকে সমতল করা হইয়াছে এবং ইহার বাম পার্শ্বে একটী পাথরের ছোট প্রকোষ্ঠ আছে তাহার অভ্যন্তরে ৮।১০ জন লোক দাঁড়াইতে পারে। ইহার মধ্যে বসিয়া আমি ও প্রমথ বাবু পিণ্ডদান করিলাম।

আরও কিছু উপরে শিলার মধ্যে একটী চরণ-চিহ্ন আছে। তাহাকে

লোকে বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন বলিয়া থাকে। নদীর জল খুব ঠাণ্ডা। সঙ্গমস্থলে অলকানন্দা প্রায় ১৪২ ফিট ও ভাগীরথী প্রায় ১১২ ফিট চওড়া। সঙ্গমের পর গঙ্গা প্রায় ২৪০ ফিট চওড়া। অলকানন্দার উপর পূর্ব্বে দাড়ির পুল ছিল কিন্তু গোহনা বন্যায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর গত ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে নৈনিতাল নিবাসী জনৈক মহাত্মা ৫,০০০ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গাড়োয়ালে যে পঞ্চপ্রয়াগ আছে তাহার মধ্যে এই স্থান একটী প্রধান তীর্থ। এখানে স্নান, তর্পণ, মস্তক মুণ্ডন, পিতৃগণের পিণ্ডদান ও ভোজ্যদান করা কর্ত্তব্য। সঙ্গমস্থানে দুইটী কুণ্ড আছে—একটী ভাগীরথীর উপর ইহাকে "ব্রহ্মকুণ্ড" বলে ও অপরটী অলকানন্দার উপর এবং ইহাকে "বশিষ্ঠকুণ্ড" বলে। ভাগীরথীর নীচের দিকে "রামকুণ্ড" নামক একটী কুণ্ড আছে। ২ মাইল ব্যবধানে "বেতাল শিলা", "বেতালকুণ্ড" "সূর্য্যকুণ্ড", "কুসুম মালিকা", "ইন্দ্রদ্যুম্ন" বিদ্যমান আছে। এখানে বিশ্বেশ্বর মহাদেব ও বগলার মন্দির আছে। বগলার মন্দির অনেক উচ্চে অবস্থিত। এখানে কেহ যায় না এবং পূজাও হয় না। আমরা সঙ্গমস্থল হইতে ফিরিবার সময় একটী শিব মন্দিরে গেলাম, তথায় শিবলিঙ্গ আছে। পরে রামচন্দ্রের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহা বড় বড় প্রস্তরের নির্ম্মিত একটী বৃহৎ মন্দির এবং সুবৃহৎ চত্বরের উপর অবস্থিত। মন্দিরের মস্তকে একটী শুভ্র গম্বুজ, একটী স্বর্ণময় গোলক ও চূড়ায় সুশোভিত। অনেকে ইহার বয়স ১০০০ বৎসর অনুমান করেন। টিহরীর রাজা মন্দিরের অধিকারী ও মন্দিরে অনেক ধন সম্পত্তি আছে। টিহরী রাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষ এখানে প্রেরিত হইয়া থাকে। মন্দিরের আয় ব্যয় টিহরীরাজ দেখিয়া থাকেন এবং পুরোহিতও তিনি নিযুক্ত করেন।

সঙ্গম স্থান হইতে মন্দিরে উঠিতে অনেকগুলি সিঁড়ি পার হইতে হয়। আমরা উপরে উঠিয়া চত্বরের অভ্যন্তরস্থিত বারেন্দাতে কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। পরে বিগ্রহ দর্শন ও ও প্রণাম করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। তথায় গণেশ, দুর্গা ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব সময়কার শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

বাসায় ফিরিবার সময় শান্তিকে কৌটা প্রভৃতি খেলিবার সামগ্রী খরিদ করিয়া দিলাম। এখানে ভাল ঘৃত পাওয়া যায়—একটা টিনে কিছু ঘৃতও সঙ্গে রাখিলাম।

ধর্ম্মশালাতে জলাভাব বোধ হইত—অলকানন্দার জলে হাত মুখ ধোয়া চলিত এবং খাবার জল প্রায় সিকি মাইল দূরবর্ত্তী ঝরণা হইতে আনা হইত। এই ঝরণা হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে কাজেই এক কলস জল আনিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইত। রাস্তায় দেখিয়াছিলাম অনেক স্থানের ঝরণা শুকাইয়া গিয়াছে। অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই তাই জলাভাব ও গাড়োয়ালে দুর্ভিক্ষ। ধর্ম্মশালা হইতে অলকানন্দার জলও অনেক নীচে, নিকটেই ঘাট। নদী হইতে উপরে উঠিতে সকলেরই বিলক্ষণ হাঁপাইতে হয়।

বিকালে ওপারে ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা করিলাম তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণীর জন্য ১৭৫৲ টাকায় কেদার বদরি হইয়া মেহেলচৌরা পর্য্যন্ত একখানা ঝাঁপান বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। "চৌধুরীর" নিকট লিখাপড়া করিয়া রসিদ লইলাম।

এখানে "বা" সহরে সামান্য সমতল ভূমি আছে কিন্তু দেবপ্রয়াগে একেবারেই নাই। পর্ব্বতগাত্রে যে ঢালু স্থান তাহার উপরে সকল

বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাড়ীগুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানালা নাই, যেন একটা সিন্দুক। এখানকার সমস্ত বাড়ী গুলিতে শ্লেট পাথরের ছাদ এবং বাহিরের দেওয়ালে লাল, সাদা রং দেওয়াতে দূর হইতে অত্যন্ত মনোরম দেখায়। প্রায় সকল বাড়ীগুলিই দ্বিতল।

৬ষ্ঠ দিবস, ২রা আষাঢ়—

আজ একাদশী, আমাদের রান্না হইবে না কিন্তু শান্তিকে ত দুইটী ভাত খাওয়াইতে হইবে তাই প্রমথ বাবুর তরফ হইতে শান্তির আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমরা সঙ্গমস্থলে যাইয়া স্নান, তর্পণ ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলাম। অপরাহ্নে টিহরী রাজের ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩ জন কুলির বন্দোবস্ত করিলাম। একজন শান্তিকে নিবে অপর ২ জন মালপত্র নিবে। দেবপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত ১১৲ ভাড়া ঠিক করিয়া লিখাপড়া করাইয়া নিলাম। এখন এখানে কুলি পাওয়া কঠিন কারণ যাত্রী রাস্তা বন্ধ হওয়াতে সকলেই স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তিন জন বাঙ্গালী সাধু বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং আজ এই ধর্ম্মশালাতে আহারাদি করিতেছেন। আহারান্তে তাঁহারা এখনই আবার হৃষীকেশ অভিমুখে চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের নিকটে রাস্তার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলাম।

৭ম দিবস, ৩রা আষাঢ়—

দেব প্রয়াগে আসা অবধি অনেকগুলি রোগী দেখিলাম। কাহাকেও কিছু কিছু ঔষধ বিতরণ করিলাম আর কাহাকেও বা ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিলাম। এখানে আসিয়া থলিকা দিয়া একটা কাঁধে ঝোলাইয়া

নেওয়ার জন্ত একটা কাপড়ের থলিয়া সেলাই করাইয়া নিলাম। ইহাতে আমার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কান্ধে ঝোলাইয়া কিছু কিছু জিনিষ ইহার মধ্যে ভরিয়া নিতাম। এ সব রাস্তাতে দরকার হইত।

আহারান্তে আমরা যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অনেক দেরী করিয়া ঝাঁপানওয়ালারা আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন পীড়িত হওয়াতে তাহাদের দেরী হইয়াছে। ঝাঁপানে তাহারা একখানা কম্বলের অধিক নিতে চায় না তজ্জন্য তাহাদের সহিত বাদানুবাদ হইল। মাতাঠাকুরাণী ঝাঁপানে উঠিয়াই ভীতা হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে তিনি এ প্রকার যানে কখনই যাইতে পারিবেন না। সর্ব্বদাই পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা এবং এক সময় একধারে কাত হইয়া পড়েন। তিনি কয়েক হস্ত চলিয়াই "গেলাম" "গেলাম" রবে চীৎকার আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন যে হাঁটিয়া যাইবেন। তিনি ত নামিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার যষ্টি গাছা হস্তে করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। এই ঝাঁপানওয়ালাদিগকে কুড়ি টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। তাহা এখন কি করিয়া আদায় করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে প্রমথ বাবু ও আমি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া টাকা আদায় করিলাম। সকলেই চলিয়া গিয়াছেন আর দেরী না করিয়া আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। অলকানন্দার তীর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এক মাইল ব্যবধানে একটী নূতন স্কুল খোলা হইয়াছে তথায় আমরা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলাম।

রাণীবাগ—৭॥ মাইল ব্যবধানে রাণীবাগ চটিতে পৌঁছিতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। এ প্রকার রাস্তা চলা সঙ্গত নয় কারণ মধ্যে মধ্যে জঙ্গল আছে তথায় হিংস্রক জন্তুও থাকিতে পারে। রাস্তাতে

আসিবার সময় দেখিলাম কোতলা নামক স্থানে সরকারী বাংলা। এই চটিতে জলাভাব। রাত্রিতে প্রমথ বাবুর পরিবার যে রুটি তৈয়ার করিলেন তাহাই ভাগ পাইলাম।

যে ঝাঁপানওয়ালাকে দেবপ্রয়াগে বিদায় দিয়া আসিয়াছিলাম রাত্রিতে দেখি সে এই চটিতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। আমি যদি বলি তবে সে এখনও ঝাঁপান নিয়া আসিতে পারে। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী যখন আর তাহাতে উঠিবেন না তখন আর দরকার মনে করিলাম না।

৮ম দিবস, ৪ঠা আষাঢ়—

প্রত্যূষে হাত মুখ ধুইয়া রওনা হইলাম।

রামপুর—চটিতে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এখানে কেহবা স্নানও করিলেন। এখানে একটী পার্ব্বত্য নদী আছে। চটির ঘরগুলি সবই খালি পড়িয়া আছে। দুগ্ধ পাওয়া যায়, দোকানদার বিক্রয় করে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে একটী লৌহ সেতু পার হইয়াছিলাম। এই চটির পর আমরা একটী সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখান হইতে পর্ব্বত দূরে সরিয়া গিয়াছে। শস্য ক্ষেত্রগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে আমের গাছ আছে। কয়েকটী কাঁচা আমও আমার থলির মধ্যে পুরিলাম।

প্রমথ বাবুর শ্যালীর কন্যার পায় আঘাত লাগাতে পায় ব্যাথা হইয়াছিল। তাঁহার হাঁটিতে অত্যন্ত কষ্টকর হওয়াতে তিনি ঝাঁপানে উঠিলেন আর প্রমথ বাবুর মাতা হাঁটিয়া চলিলেন। কিন্তু বিবকেদার চটির এক মাইল ব্যবধান থাকিতে তিনি প্রায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। একে ত প্রখর রৌদ্রের তেজ তাহার উপর রাস্তা এত গরম হইয়াছে

যে হাঁটা অত্যন্ত কঠিন। তাহার উপর তিনি পার্ব্বত্য রাস্তা হাঁটিয়া চলিতে একেবারেই উপযুক্ত নন। রাস্তাতে ঝরণা সব শুকাইয়া গিয়াছে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বিশ্বকেদার—আমরা বেলা ১২টার সময় বিশ্বকেদারে উপস্থিত হইয়া প্রমথ বাবুর মাতার জন্য ঝাঁপানওয়ালাদিগকে অনেক মিনতি করিয়া পুনবার পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যখন আসিলেন তখন দেখিলাম তাঁহার মুখ চোখ একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। তিনি শুইয়া থাকিলেন। আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটির অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। একখানা ঘর তাহাও ক্ষুদ্র, স্থানাভাব। ঘরখানা দ্বিতল, সিঁড়ির একধারে আমাদের ও অপরধারে প্রমথ বাবুদের আহারাদির বন্দোবস্ত হইল। খাণ্ডব (খ. চুংচম্) নামক একটী পার্ব্বত্য নদী অলকানন্দায় মিলিয়াছে—কাজেই এই স্থানের নাম চুংচম্ প্রয়াগ। এই সঙ্গম স্থলে বিশ্বকেদার শিবালয় আছে। চুংচম্ নদীর উপর একটী লৌহ সেতু পার হইয়া আমরা এই চটিতে আসিয়াছি। নদীতে জল খুব সামান্য, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। জলও পরিষ্কার। চটির নিম্নে অলকানন্দা। এই স্থানে নদী এ প্রকার প্রশস্ত যে হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও এ প্রকার নাই। সকলেই অলকানন্দায় স্নান করিয়া আসিলেন কিন্তু আমি শাস্তিকে সঙ্গে করিয়া এই চুংচম নদীতে স্নান করিয়া আসিলাম। আহারান্তে আমরা রওনা হইবার পূর্ব্বে বিশ্বকেদার শিবলিঙ্গ দর্শন করিবার মানসে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির মধ্যে বহু পুরাতন একটী শিবলিঙ্গ, মেঝের উপর খোদিত চরণ চিহ্ন ও পদ্ম আছে। মন্দিরটী ছোট ও বহু পুরাতন। নিকটে অনেকগুলি প্রস্তরের মূর্ত্তি ও শিল্পের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে অর্জ্জুন দেবাদিদেব

মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের বন পর্ব্বের কৈরাত অধ্যায় এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। সোমবার অমাবস্যা হইলে এখানে অনেক ধুমধামের সহিত পূজা আর্চ্চা হইয়া থাকে। এখান হইতে ২।৩ মাইল ব্যবধানে খাণ্ডব বন। অর্জ্জুন এখানে খাণ্ডব বন দাহন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের বন্যায় এই স্থানের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

এই চটির সম্মুখে অলকানন্দার পরপারে মার্কণ্ডেয়-গঙ্গা নামক একটী জলস্রোত অলকানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন। নিকটে টিহরী রাজের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে এবং একটী রাস্তা টিহরী রাজধানী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার কিনারা দিয়া টেলীগ্রাফের লাইন পৌড়ী হইতে শ্রীনগর হইয়া টিহরী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বিল্বকেদার হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত সমতল রাস্তা, বোধ হইল যেন আমরা গ্রাম্য রাস্তা দিয়া হাটিতেছি। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম অলকানন্দার উপর একটী লৌহ নির্ম্মিত টানা সেতু আছে। টিহরীর রাস্তায় এই সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। যখন আমরা একটী গ্রামের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম তখন দেখি দলে দলে বালক বালিকারা নাচিয়া নাচিয়া সুন্দর স্তোত্র পাঠ করিয়া সুঁই সুতা ও বেণ্ডী ভিক্ষা করিতেছে। এই স্তোত্র বেশ সুমিষ্ট বোধ হইতেছিল। আমি একখানা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি, ইহা এই ভাবেই পড়িয়াছিল।

সোনামণি যোগী করে রামজিকা সেবা
পাথর মে পানি পড়ে রোজে না ভিজে
খাওএত যে খিচুড়ী বাতাওয়ে মেওয়া॥

এখানে বিস্তর সমতল ভূমি ও সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে

আমরা সূর্য্যাস্তের সময় ধীরে ধীরে শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে অলকানন্দা কিছু প্রশস্ত।

চলিতে চলিতে আমরা সরকারী রাস্তা হইতে গ্রাম্য রাস্তায় সামান্য দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীশ্রী৺ কমলেশ্বরশিবের মন্দিরে আসিয়া পড়িলাম। একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী একটী বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে দ্বিতল অট্টালিকা। মন্দিরের বাহিরে একটী বৃহৎ পিত্তলের ষাঁড় আছে। একটী দ্বিতল কামরায় পাণ্ডারা শঙ্করাচার্য্যের বেদি দেখাইয়া থাকেন। সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। যে মোহন্ত মহারাজের জিম্মায় এই মন্দির তাঁহার অনেক জমিদারী আছে।

দ্বিতলে অনেকগুলি কামরা। এই মন্দির হইতে অলকানন্দা কিছু দূরে এবং প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত একটী চড়া। এই চড়া পার হইয়া অলকানন্দার কিনারে শঙ্কর মঠে যাইতে হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃত্তিনন্দ তথাকার ম্যানেজার। মন্দিরে নারায়ণ ও লক্ষ্মী, হনুমান, গরুড়, জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি আছে। নিকটে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তাহার তলদেশ পাথর দিয়া বাঁধান।

কমলেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইতে রাস্তায় একখানা মাইল বোর্ড আছে তাহাতে এক ধারে লিখা শঙ্করমঠ ও অন্য ধারে কমলেশ্বর শিবের মন্দির।

এদেশের বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রার্থনা করিয়া ঘৃতের প্রদীপ হস্তে করিয়া বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে কমলেশ্বর শিবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে সমস্ত রাত্রি জাগরণে সমর্থ এবং যাঁহার ঘৃতের প্রদীপ উষাকাল পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে তাঁহারই প্রার্থনা পূর্ণ হয়।

এখানে কুলি এজেন্সি আছে, তথায় প্রমথ বাবু ও আমি গিয়াছিলাম কিন্তু সেখানেও সুবিধা করিতে পারিলাম না। বিকাল বেলা দেখি আমাদের কেদারনাথের পাণ্ডা কোথা হইতে ৪ জন ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত ১৫।০ টাকা ভাড়া ঠিক হইল। থানার নিকটে কয়েক খানা মুচির দোকান আছে তথায় জুতা তৈয়ার করিতেছে। আমি নিজের, মাতাঠাকুরাণীর ও শান্তির জন্য ৩ জোড়া জুতার ফরমাইস দিলাম। সকালে ফরমাইস দিয়া বিকালে নিয়া আসিলাম। এই জুতা ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমে কেষ্টরঅয়েল মাখিয়া নিতে হয় নচেৎ পায় ফোস্কা পড়ে। আমার দেখা দেখি প্রমথ বাবুও ২ জোড়ার অর্ডার দিলেন। যে জুতা নিয়াছিলাম তাহা আর পায় দেওয়া আমাদের ভাগ্যে হয় নাই। মাতাঠাকুরাণী এক বেলা পায় দিয়া দ্বিতীয় বেলায় খালি পায় হাটিতে আরম্ভ করিলেন, আমার জুতা জোড়া সাবধানে বস্তার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু পরে তাহা চোরে চুরী করিয়া নিয়াছে, আর শান্তির জুতা এখনও আছে।

এ সব বাজে কথা লিখিতে গিয়া আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই আসল কথা আর কিছুই নহে উদরের সংস্থান। বাজার হইতে চাউল, ডাইল, তরকারি ইত্যাদি খরিদ করিয়া আনিয়া নীচের এক খানা ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত করা হইল, আর আমরা ধর্ম্মশালার বারেন্দায় বসিয়া আহার করিলাম। আজ যখন বিশ্রাম কোথাও যাইতে হইবে না তখন রাত্রে ও ভাতের বন্দোবস্ত হইল।

ভারতবর্ষের উত্তরে দুইটী শ্রীনগর আছে, একটী কাশ্মীরের রাজধানী এবং অন্যটী গাড়োয়ালের পুরাতন রাজধানী। কাশ্মীর রাজধানীর তুলনায় এস্থান কিছুই নয়। যেমন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য। পূর্ব্বে যখন এখানে

রাজধানী ছিল তখন খুব সমৃদ্ধিশালী সহর ছিল এখন কিন্তু কিছুই নেই তবে হিমালয়ের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এস্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখান হইতে ইংরাজের হেড কোয়ার্টার পৌড়ী ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্র বক্ষ হইতে শ্রীনগর ১৭০৬ ফিট উচ্চ এবং অলকানন্দার বাম-তীরে অবস্থিত। পুরাতন রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। লালসাঙ্গা হইতে ৩॥০ মাইল উপরে সিনকা চটি এবং তথা হইতে আরও এক মাইল উপরে বিরহি গঙ্গা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের ৫।৬ মাইল উপরে একটা পর্ব্বত ধ্বসিয়া যাওয়াতে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে নদীর জলস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যায়। তাহাতে এই নদীর মধ্যে এত জল জমিয়া যায় যে তাহাতে প্রায় ২০।২৫ মাইল ব্যাপী একটি হ্রদের সৃষ্টি হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটা নালা করিয়া জলস্রোত নিঃসরণ করিতে পারা যায় কিনা তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যদি কখনও এই জল পর্ব্বত গাত্র ভেদ করে তাহা হইলে অলকানন্দার তীরবর্ত্তী স্থানের লোকদের অতিশয় ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অধিবাসীদিগকে নদীর তীর হইতে অন্ততঃ ২০০ ফিট সরিয়া যাইতে নোটিশ জারি করেন। সকলস্থানে সংবাদ দেওয়ার জন্য টেলিগ্রাফ লাইন ও করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে পারেনা। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ২৫ আগষ্ট তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রবল বেগে এই হ্রদের জল চতুর্দ্দিক ভাসাইয়া চলিল। পূর্ব্বে সাবধানতা অবলম্বনে লোকের জীবন ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সকল অট্টালিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্মশানে পতিত হইল। কেবল কমলেশ্বরের মন্দির এই জল প্লাবনেও ধ্বংস হইল না। রাজ ভবনের কোনও চিহ্ন নাই, সেই স্থানে এখন কৃষিক্ষেত্র।

আধুনিক নগরটীর ভিতর শিশু বৃক্ষ পরিশোভিত সুন্দর প্রশস্ত পাকা রাস্তা এবং রাস্তার দুই ধারের বাড়ী গুলি অধিকাংশই দ্বিতল এবং প্রস্তর নির্ম্মিত। উপরের ছাউনি শ্লেট পাথরের। নিম্নতলে দোকান এবং নানা প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়, বাসন পত্র, জুতা, ছাতা, অয়েলক্লথ, হালইকরের দ্রব্য, কাপড়, কম্বল প্রভৃতি অনেক জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। এখানে ২।৩ খানা মুসলমানের দোকান ও আছে। তা ছাড়া কয়েক ঘর মুচি আছে তাহারা জুতা তৈয়ার করে। এখানে থানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, হাস্পাতাল, ধর্ম্ম শালা, ডাকবাংলা, কুলি এজেন্স ও উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এখানে পঞ্চপাণ্ডবের একটী পুরাতন মন্দির আছে। তথায় নারদের ও একটী অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে কয়েকটী দেব মন্দির আছে। তাহাতে—মহাদেব, লক্ষ্মী নারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মী, গঙ্গা, গরুর, হনুমান, কংশমর্দ্দিনা আছেন। সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অলকানন্দার অপরপারে চন্দ্রাকিল নামক একটী পাহাড়ে একটা প্রকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষের নিকট কালিকাদেবীর যজ্ঞ বেদী আছে। প্রবাদ এখানে পূর্ব্বে নরবলি হইত। শঙ্করাচার্য্য পাথরটী নদী গর্ভে ফেলিয়া দিয়া নরবলী নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীনগরের নিকটে অষ্টাবক্র পর্ব্বত, এখানে অষ্টাবক্র মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে কুমায়ুন ও নেপালের রাজা গাড়োয়াল আক্রমণ করেন। শত্রু সৈন্যকে বাধা দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। তাই গাড়োয়ালের রাজা দেরাদুনে পালাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তিনি তথায় ও থাকিতে পারিলেন না। পরে লাণ্ডোরার রাজার

সাহায্যতায় ১২,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি আর ফিরিলেন না, যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শনসা ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লর্ড হেষ্টিংস গুর্খাদিগকে গাড়োয়াল হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ব্যায়স্বরূপ গাড়োয়ালের অনেক অংশ ইংরাজ রাজ গ্রহণ করিলেন। এই অংশের নাম বৃটিশ গাড়োয়াল আর অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন গাড়োয়াল নামে অভিহিত। স্বাধান বলিয়া নেপাল বা ভোটানের মত স্বাধীন নয়। অলকানন্দার পূর্ব্ব পারে ইংরাজের অধিকার এবং পশ্চিম পাব গাড়োয়াল রাজের সীমানা। এই বর্ত্তমান শ্রীনগর ইংরাজের রাজ্যে অবস্থিত। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে সুদর্শনসা বর্ত্তমান টিহরী রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে ৩২ মাইল দূরে টিহরীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

আর ইংরাজেরা ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পৌড়ীতে আড্ডা ফেলিলেন। সেখানে একটা রেজিমেণ্ট বসিল, আফিস আদালত সমস্তই সেখানে স্থাপিত হইল এবং একজন ডেপুটী কমিশনারের পীঠস্থান হইল, কেবল শ্রীনগরে হাস্পাতাল থাকিল।

শ্রীনগরে পৌঁছিয়া প্রমথ বাবু ও আমি ঠিক করিলাম বদরিনারায়ণের পাণ্ডার গোমস্তা যে কৃষ্ণা আমাদের সঙ্গে হৃষীকেশ হইতে আসিয়াছে তাহাকে আর রাখিবনা কারণ সে যে টাকা পাইবে তাহা ত আর পাণ্ডা ঠাকুর নিজের ঘর হইতে দিবেন না। আমাদের নিকট হইতে প্রকরান্তরে আদায় করিবেন। তাহাকে বলা হইল যে তুমি চল পাণ্ডার নিকট চলিয়া যাও, আমাদের তাঁহার লোকের দরকার নাই, আমরা নিজের বিষয় নিজেরাই দেখিয়া নিতে পারিব, নচেৎ আমার কাণ্ডীওয়ালা হইয়া শান্তিকে নিয়া চল। সে পাণ্ডার নিকট ফিরিয়া যাইতে নারাজ কারণ

তাহার সঙ্গে টাকা নাই। তাই আমাদের কথামত কাণ্ডীতে করিয়া শান্তিকে নিয়া যাইতে স্বীকার করিল। আমরা বাজার হইতে ২৲ টাকা দিয়া একটা কাণ্ডী খরিদ করিয়া আনিলাম। কৃষ্ণা আমাদের রান্নার বাসনপত্র পরিষ্কার করিত কিন্তু উচ্ছিষ্ট বর্ত্তন ধরিত না আর পথ চলিবার সময় কিছু কিছু জিনিষ বহন করিয়া নিত।

এখন হইতে কোটদ্বার প্রায় ৫৮ মাইল, পৌড়ী হইয়া যাইতে হয়। নাজিরাবাদ হইতে কোটদ্বার পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে। পাঞ্জাবের যাত্রীরা প্রত্যাবর্ত্তনকালে পৌড়ী হইয়া কোটদ্বার যাইয়া রেল ধরে। পৌড়ীতে মাল বহনকারী ঘোড়া পাওয়া যায় এবং রাস্তার মধ্যে মধ্যে সরকারী বাংলা ও আছে। বিকালে সামান্য বৃষ্টি হইল।

এখানে বৃশ্চিকের ভয় খুব বেশী। তাই আমরা ভাল করিয়া বিছানা পত্র দেখিয়া নিলাম। ধর্ম্মশালায় আজ বোম্বাইর একজন অবস্থাপন্ন লোক সপরিবারে কেদার বদরী দর্শন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ঝাঁপান ছিল কিন্তু ঝাঁপানওয়ালাদের বিদায় দিয়া এখান হইতে নূতন ঝাঁপান বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীও দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার দলের লোকজন রওনা হইয়া গেল এবং তাঁহারা বিল্বকেদার চটিতে যাইয়া রাত্রি বাস করিবেন। আর এই ভদ্রলোকটী রাত্রি প্রায় ৮টার সময় আহারাদি করিয়া রওনা হইলেন। রাস্তা ভাল, ভয়ের কোনও কারণ নাই।

১০ম দিবস, ৬ই আষাঢ়—

আমরা প্রত্যূষে রওনা হইলাম। প্রায় ১১০ মাইল যাওয়ার পর দেখিলাম যে একটী পার্ব্বত্যনদীর সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা অনেক

কষ্টে ও অতি সন্তর্পনে নদী পার হইয়া পরপারের উচ্চ তীরে উঠিলাম। শ্রীনগর হইতে সুকারতো চটি পর্য্যন্ত সমতল রাস্তা। অলকানন্দার বাম তীর দিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে গ্রাম। দেখিলাম অলকানন্দা দিয়া বহু তক্তা ভাসিয়া যাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে পাথরে লাগিয়া এক এক স্থানে অনেক জমাট বাঁধিয়াছে। আমরা পুনর্ণভা শাক রাস্তার কিনারা হইতে সংগ্রহ করিলাম। প্রমথবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ, সাধুজী, মাতাঠাকুরাণী ও আমি যে যেখানে পাইলাম তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম।

সুকারতো—চটিতে পৌঁছিয়া আমরা সকলেই বিশ্রাম করিলাম। তথায় দেখি মাহষের গরম দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং চটিওয়ালা মিঠাই তৈয়ার করিতেছে। আমরা কিছু কিছু জলযোগ করিয়া নিলাম। বিধবারা কিছুই খাইলেন না। হরিদ্বার হইতে ৮৩ মাইলষ্টোনের নিকট একটী খুব বড় ঝরণা আছে। তথায় আমরা অনেক সময় বিশ্রাম করিলাম।

ভট্টিসেরা—আমরা এই চটিতে ১০টার সময় পৌঁছিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। চটির মধ্য দিয়া একটি পার্ব্বত্য নদী চলিয়া গিয়াছে। জল খুব পরিষ্কার ও সুস্বাদু। প্রমথবাবুরা একখানা ঘরে আশ্রয় নিলেন আর আমরা অপর একখানাতে গাঁঠরি নামাইলাম। দোকানদারকে বলিলাম যে আমাদের সঙ্গে চাউল ডাইল আছে। এই কথা বলাতে সে আর আমাদিগকে স্থান দিতে চায় না। তখন বাধ্য হইয়া তাহার নিকট হইতে চাউল ডাইল খরিদ করিলাম। দুই পয়সায় লাকরি ও দিল। মাতাঠাকুরাণী স্নান করিয়া আসিয়া রান্না আরম্ভ করিলেন। আর আমি নদীতে সাবান দিয়া আমার সার্ট ও কাপড় পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে। সামনে একটী ভীষণ ১

মাইল চড়াই এবং চড়াইয়ের উপরে **চণ্টিখাল** নামক স্থানে সরকারী ডাকবাংলা, জল ছত্র ও কুলি এজেন্সি আছে। এখান হইতে নিচের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। এই চড়াই উঠিতে সকলেরই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল। জলছত্রের নিকট বসিয়া জলপান ও কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম।

এখানে একজন পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক ডাণ্ডীতে আসিলেন। তিনিও বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই আমার প্রথম ডাণ্ডী দর্শন। ইহাতে বেশ আরামে বসিয়া থাকা চলে, পা দুখানা বেশ লম্বা করিয়া মেলিয়া দেওয়া যায়। ঠিক যেন ইজি চেয়ার। ২ মাইল উৎরাইএর পর আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে খাংরা চটিতে পৌছিলাম।

খাংড়া—প্রমথবাবুর আরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁহাকে নিষেধ করিলাম। এদিকে দেখি মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল এখনই বৃষ্টি আসিবে। আর সামনের চটিতে বাঘের ভয় আছে। এখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন বৃদ্ধ একখানা বড় পাথরের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত আলাপে অবগত হইলাম যে তিনি এখানেই সাধন ভজন করিতেছেন। কাশীতেও দীর্ঘকাল ছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কাশী ছাড়িয়া এখানে কেন সাধন ভজন করিতেছেন? তিনি বলিলেন "এ উত্তরাখণ্ড, এ সাধন ভজনের জায়গা, এখানে থাকিবনা ত কোথায় থাকিব?" সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পৌড়ীর ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একখানা ডাণ্ডীতে আরোহন করিয়া পর্ব্বত উপরিস্থিত সরকারী ডাক বাংলাতে যাইতেছেন।

প্রমথবাবুরা রুটী তৈয়ার করিলেন আর আমার মাতাঠাকুরাণী খিচুড়ী পাক করিয়া দিলেন। শান্তির আর খাওয়া হইল না। সন্ধ্যার কিছু পরই ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার জন্য এক বাটি খিচুড়ী রাখিয়া

দেওয়া হইল। আহারাদির পর সকলেই শয়ন করিয়াছেন। কৃষ্ণা এখন শান্তির কাণ্ডাওয়ালা হইয়াছে তাহাকে আমাদের নিকটে শোয়াইয়াছি। আমার বংশদণ্ডটী আমার বিছানার নিকটে রাখিয়াছি, কি জানি যদিই রাত্রিতে দরকারে হয়। সকলে ঘুমাইতেছে আমি শুইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি এবং নিজের অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছি এমন সময় চটির অন্য একখানা ঘর হইতে কলরব উঠিল "হৈ" "হৈ"—সকলেই হৈ হৈ করিতেছে—চটিতে বাঘ আসিয়াছে। আমি উঠিয়া বসিলাম এবং একহস্তে আমার লাঠি ও অপর হস্তে শান্তিকে ধরিলাম। আমি বিছানায় বসিয়াই চিৎকার আরম্ভ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মাতাঠাকুরাণী প্রমথবাবু, তাঁহার পরিবারবর্গ ও আমাদের কুলীরা সকলেই চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। সে এক বিষম ব্যাপার। সকলের চিৎকারে বোধ হয় পশুরাজ চম্পট দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ এই প্রকার গোলমালে কাটিল। পরে বাহির হইয়া অন্যান্য ঘরে জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় বাঘ আসিয়াছিল। কিন্তু কেহ বাঘ দেখিয়াছে তাহা আর প্রকাশ হইল না! প্রকাশ না হইলেও ভয়ে ভয়ে আমরা পুনরায় শয়ন করিলাম। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে রুদ্রপ্রয়াগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাঘে অনেক লোক মারিয়াছে। কাজেই সকলের মনেও ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। সে যাহা হউক রাত্রিতে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই।

১১ দিবস, ৭ আষাঢ়—

ভোরে ৬টার সময় রওনা হইয়া চটির নিকটস্থ কাঠের সেতু পার হইয়া চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এক মাইল চড়াইএর পর ১ মাইল উৎরাই পরে নারকোটি চটি। এখানে গরম দুধ

ক্রয় করিলাম—চটিতে জলের পাইপ আছে। একজন দোকানদার আছে কিন্তু সকল ঘরই খালি পড়িয়া আছে। চটিওয়ালা বলিল এখানে রোজ রাত্রে বাঘ আসে। স্থানটাও এমন যে দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়।

চটির তিন ধারে পর্ব্বত ও জঙ্গল এবং সম্মুখ দিয়া একটা পার্ব্বত্য জলের নালা চলিয়া গিয়াছে তাহাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া আবার চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল এই ভাবে চলিয়া একটা পর্ব্বতের উপরে আসিলাম, এ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য খুব সুন্দর, আকাশ পরিষ্কার। উত্তর দিকে দেখি তুষার-মণ্ডিত বিশাল পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন ঐ কৈলাস পর্ব্বত। এখানে একটী জলছত্র আছে। পরে উৎরাইএর রাস্তায় গোলাপরায় চটি এবং সমতল রাস্তায় বেলা ১১টার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম। দূর হইতেই রুদ্রপ্রয়াগ দেখা যাইতেছিল।

রুদ্রপ্রয়াগ

আমরা সরকারী ডাকবাংলা, ডাকঘর, দোকান-পাট ইত্যাদির নিকট দিয়া চলিয়া আসিয়া অলকানন্দার উপর দিয়া লৌহ সেতু পার হইয়া কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখান হইতে সঙ্গম স্থান নিকটে। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থান, পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে একটী তীর্থ। সঙ্গমস্থানের জল সমুদ্র বক্ষ হইতে ১,৯১২ ফিট উচ্চ। ধর্ম্মশালাটী বৃহৎ, দ্বিতল এবং অলকানন্দার ঠিক পারেই অবস্থিত। জলের কি ভীষণ স্রোত! দেবপ্রয়াগে

ও বিষ্ণুপ্রয়াগে যে প্রকার প্রবল স্রোত তাহা অপেক্ষাও এখানকার স্রোতবেগ অত্যন্ত প্রবল। মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে অলকানন্দা কি প্রবল বেগে বড় বড় পাথরে আছাড় খাইয়া অতি বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটিতেছেন! আবার যেই সাক্ষাৎ অমনি শান্ত ভাব ধারণ করিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন।

সঙ্গমস্থলের অপর পারে ডাকবাংলা, ডাকঘর ও কয়েকখানি দোকান এবং সঙ্গমের পারে বৃহৎ ধর্ম্মশালা ৩ খানা দোকান, রুদ্রনাথ, নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেবের ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। প্রবাদ আছে যে এখানে মহাদেব দেবর্ষি নারদকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। রুদ্রনাথ মহাদেবের মন্দির হইতে পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া নির্ম্মিত একটী খাড়া সিঁড়ি সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সোপান শ্রেণী অত্যন্ত কদর্য্য। এখান হইতে একটী রাস্তা অলকানন্দার বাম তীর দিয়া কর্ণপ্রয়াগ হইয়া বদরিকাশ্রম আর একটী রাস্তা মন্দাকিনীর বাম তীর দিয়া কেদারনাথ অভিমুখে গিয়াছে। এখান হইতে কেদার নাথ ৪৫ মাইল, বদরিকাশ্রম ৮৬ মাইল ও হরিদ্বার ১৪ মাইল।

আমরা সঙ্গমে সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান ও পরে তর্পণ করিয়া দেবতা দর্শন করিলাম। পাণ্ডা শ্রীতারা দত্ত আমাদের সকল কাজ করাইলেন। এখানে মাত্র একজন পাণ্ডা দেখিলাম।

ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটী বাড়ীতে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনান্তে অপরাহ্ণ ৫টার সময় রওনা হইলাম। এই ধর্ম্মশালায় লোকেল বোর্ডের একজন হেল্থ অফিসার বাস করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে অগস্ত্যমুনিতে থাকিতে নিষেধ করিলেন কারণ তথায় কলেরা আছে।

আমরা মন্দাকিনীর পার দিয়া কেদার অভিমুখে অগ্রসর হইতে

লাগিলাম। রাস্তা অপরিসর ও মধ্যে মধ্যে সামান্য চড়াই ও উৎরাই ও অনেক ঝরণা আছে। ৫ মাইল দূরবর্ত্তী ছাতোলী চটিতে সন্ধ্যার সময় পৌঁছিলাম।

ছাতোলী—এই চটির আগে একখানা চটি আছে কিন্তু তাহা শূন্য পড়িয়া আছে। গত বৎসর একজন সন্ন্যাসীকে একটা ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু মারিতে পারে নাই। রুদ্র প্রয়াগে কয়েকজন লোক ব্যাঘ্র হস্তে নিহত হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ রুদ্র প্রয়াগে এবং তাহার কয়েক মাইল ব্যবধানের মধ্যে ব্যাঘ্রের অনেক অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলাম। এখানে ও বিলক্ষণ ভয় আছে। চটিতে দোকানদার রাত্রিতে থাকে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দোকান বন্ধ করিয়া গ্রামে চলিয়া যায়। আমাদের পাণ্ডা শ্রীদাতারাম পণ্ডিতকে বলিলাম তিনি যখন তাঁহার রুটি তৈয়ার করিবেন তখন আমার জন্যও কয়েকখানা করিয়া দিবেন। তিনি আর আপত্তি করিলেন না। যথা সময়ে আমরা আহারাদি করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। প্রমথ বাবুর সহিত পরামর্শ করিলাম কাণ্ডীওয়ালা ঝাঁপানওয়ালা ও মালবহনকারী কুলীদের নিকটে শয়ন করাইতে হইবে কারণ রাত্রিতে কখন বাঘ আসে তাহার ঠিক নাই। বাঘ যে প্রত্যহ রাত্রিতে আগমন করে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই কারণ দোকানদারের ভাবেই ইহা বুঝিয়াছিলাম। দেখিলাম আমাদের পাণ্ডাঠাকুর ও পাহাড়ীয়া কুলিরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের ত কথাই নাই। চটির ঘরখানা দ্বিতল হইলেও অনেক সাহস হইত কিন্তু ইহা যে একেবারে মাটির সহিতই মিলিয়া গিয়াছে। আমাদের ঘরের সামনে আর একখানা ঘর তাহার স্লেট পাথরের চালে আমাদের চটির সম্মুখভাগ প্রায় অর্দ্ধেক ঢাকিয়াছে কিন্তু দুই ধারে ফাঁক আছে। এক ধারে প্রমথ বাবু,

তাঁহার ঝাঁপানওয়ালা ও কুলিরা অপর ধারে আমরা। পাণ্ডাজি আমাদের নিকট বিছানা করিলেন। কৃষ্ণাকে সামনে রাখিলাম। শান্তি একবারে দেওয়ালের কিনারে তৎপর মাতাঠাকুরাণী ও পরে আমি সম্মুখের দিকে রহিলাম। সাধুজি আমাদের নিকটে একটা দেওয়ালের আড়ালে বিছানা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রমথ বাবু তাঁহাকে তাঁহাদের সামনে রাখিলেন। ইহাতে আমার বড়ই বিরক্ত বোধ হইল, আমি আর কিছু বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম: প্রমথ বাবুর নিজের ভাই কি অপর কোন আত্মীয় হইলে কি তাহাকে এই ভাবে এই ভীষণ স্থানে বাঘের আশা করিয়া তাহাকে বডিগার্ড করিয়া রাখিতে পারিতেন? এই গৃহত্যাগী পুরুষকে প্রমথবাবু যে ভাবেই দেখুন না কেন আমি কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর যখন সাধুজি আমার বিছানার নিকট তাঁহার বিছানা পাতিতেন তখন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া যে কত আনন্দ উপলব্ধ করিতাম ও কত সময় কাটাইতাম তাহা আমি এখনও সেই হিমালয়ের ক্ষণকালের সুখের কথা ভাবিয়া থাকি। সেই সুখে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই, ভোগ পিপাসা নাই, আছে শুধু বদরিনারায়ণ দর্শনের আশা বুকে বান্ধিয়া সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ। কত সময় সাধুজি তাঁহার বিষাদময় জীবনের ইতিহাস বলিতেন এবং তাঁহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিত, সেই দিন আর নাই সেই দিন বোধ হয় আর আসিবেও না, আর প্রমথ বাবুর সাধও হইবে না এই প্রকার নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল একজন গৃহত্যাগী সাধুকে তাঁহার বডিগার্ড করিয়া ব্যাঘ্র ভীতিপূর্ণ স্থানে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুখের স্বপ্ন দেখেন।

আমার লণ্ঠনটা সামনে রাখিয়া দিলাম এবং লাঠিগাছাও হাতের কাছে রাখিলাম। প্রমথ বাবুকে বলিলাম যে তাঁহার ৬ জন কুলির মধ্যে ১ জনকে আমাদের ধারে রাখিতে কিন্তু তাহাদিগকে বলা সত্ত্বেও কেহই আমার নিকট আসিল না।

আমার কুলি ছোকরা ৩ জন অন্যত্র শয়ন করিয়াছে। পাণ্ডার চাকরটী নিকটে রহিল। এইভাবে ভয়ে ভয়ে কোনও প্রকারে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। আজ অন্ধকার থাকিতেই সকলে গাত্রোত্থান করিলাম এবং হাত মুখ ধুইয়া ৪॥০ টার সময় রওনা হইলাম। আজ আর আমার চা খাওয়া হইল না। শান্তি শেষ রাত্রিতে উঠিতে চায় না। সেও অনিচ্ছায় উঠিল। আমরা সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

১২ দিবস, ৮ই আষাঢ়—

ছাতোলী হইতে **রামপুর** ২॥০ মাইল—রাস্তা সমতল পরে ৩॥০ মাইল ব্যবধানে অগস্ত্যমুনি চটি।

অগস্ত্যমুনি

এখানে অগস্ত্যমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই এই চটির নাম অগস্ত্যমুনি হইয়াছে। স্থানটী সুন্দর বিস্তীর্ণ সমতল স্থানে মন্দাকিনীর বাম উপকূলে অবস্থিত। চটির সংলগ্ন একটী প্রাঙ্গনের মধ্যে মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একটী কল্পিত মূর্ত্তি, বারেন্দায় ও নিকটে আরও অনেক মূর্ত্তি আছে—নবগ্রহের মুখ, নরসিংহ মূর্ত্তি, গণেশ, নারদের মূর্ত্তি, শৃঙ্গী ঋষির মূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরে আটপল বিশিষ্ট একটী স্তম্ভ, তাহার মস্তক ও তলদেশ চৌকা ধরণের। মস্তকের চারিধারে চারিটী

চক্র আছে। এখানে প্রস্তর নির্ম্মিত কতকগুলি চক্র ও পদ্ম আছে। চটির সব ঘরগুলি একতালা ও আবর্জ্জনাতে পরিপূর্ণ। এখানে একটী গ্রাম্য ডাকঘরও আছে। আমরা এচ চটিতে অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে দেখিলাম জাল দিয়া কয়েকজন লোক মন্দাকিনীতে মাছ ধরিতেছে।

সাউরী—বেলা ১১টার সময় সাউরী চটিতে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিলাম। চটির নিকটে একটা বড় ঝরণা এবং জলের স্রোতে গম ভাঙ্গা কল আছে। একটী দ্বিতল ঘরে আমরা আশ্রয় নিলাম। এখানে মন্দাকিনী কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। শান্তির কাণ্ডীওয়ালা কৃষ্ণা আস্তে আস্তে চলে এবং ঘন ঘন বিশ্রাম করে কাজেই আমি সকলের পিছনে পড়িয়া থাকি আর শান্তিকে ফেলিয়া আমি আগেও যাইতে পারি না। এই জন্য সকালে কি বিকালে আমাদের দলের সকলে চটিতে পৌঁছিবার অনেক পরে আমি যাইয়া হাজির হই। বৈকালে রওনা হইয়া অল্প দূরে একখানা সুন্দর বাগানের মধ্যে শিব মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দাকিনীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে আমরা চন্দ্রানদীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। নদীতে সেতু নাই কয়েকখানা তক্তা ফেলিয়া রাখিয়াছে তাহার উপর দিয়াই সকলে পার হয়। অল্প জল।

চন্দ্রাপুরি—নদী পার হইয়া আমরা চন্দ্রাপুরি চটিতে উপস্থিত হইলাম। একজন লোক আমাদের নিকট হইতে মাশুল আদায়ের চেষ্টা করিল কিন্তু আমরা দেই নাই। আমরা বলিলাম যে কেহ এ প্রকার কোনও হুকুম নামা দেখাইতে পারে যে সকল যাত্রীকেই মাশুল দিতে হইবে তবে আমরা দিব। নচেৎ দিব না। শুনিলাম এই ভাবে মাশুল আদায় করিয়া চন্দ্রা নদীর উপর সেতু তৈয়ার করিবে।

হিমালয় ভ্রমণের সময় অনেক প্রকার ছোট বড় সেতু পার হইয়াছি কিন্তু কোথাও মাশুল দিতে হয় নাই। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর আছে এবং দধি, দুগ্ধ, মিষ্টি প্রভৃতি সকল জিনিষই পাওয়া যায়। এখানে চন্দ্রা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গার মন্দির আছে। আমরা দেবদর্শন করিয়া সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ভিরি—৩ মাইল দূরবর্ত্তী ভিরি চটিতে একটী দ্বিতল ঘরে রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই ঘরটী ঠিক মন্দাকিনীর উপরে এখানে নদীর উভয় পারেই কতকগুলি ঘর আছে। একখানা বড় রকমের মুসলমানের দোকান আছে তথায় কাপড়, জুতা প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। আমি রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণীর জন্য ২ জোড়া কেনভাসের জুতা খরিদ করিলাম। লণ্ঠনে তৈল না থাকায় এক লণ্ঠন তৈল ।৵০ আনা দিয়া ক্রয় করিলাম। গত রাত্রিতে বাঘের ভয়ে ভাল ঘুম হয় নাই। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল। এখান হইতে রুদ্র প্রয়াগ ১৮ মাইল। এই চটিতে পৌছিবার পূর্ব্বে রাস্তার কিনারে একখানা লৌহ কর্ম্মকারের দোকান আছে তথায় একজন লোক বলিল "বাবু কেদারনাথ যাইতেছেন এখান হইতে তাম্র বলয় ও আংটী ক্রয় করিয়া নিন্, কেদারনাথকে স্পর্শ করাইয়া এই সব ধারণ করিতে হয়"। আমি তাম্র বলয় ও আংটী খরিদ করিলাম। এই আংটী আর কিছুই নয়, একখানা মোটা তামার পাৎ সিকি ইঞ্চি চওড়া করিয়া কাটিয়া বেকাইয়া নিয়াছে। আর বলয় অনেকটা ছেলেপেলের রুলির মত।

এখান হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়াছে, একটী মন্দাকিনীর বাম তীর দিয়া উখীমঠ আর একটী ডান তীর দিয়া গুপ্তকাশী।

১৩শ দিবস, ৯ই আষাঢ়—

আমরা মন্দাকিনীর উপর দিয়া লৌহ সেতু পার হইয়া দক্ষিণ পার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইতে রাস্তা পর্ব্বতগাত্র দিয়া, একধারে খাড়া পাহার অপর ধারে মন্দাকিনী। রুদ্র প্রয়াগ হইতে আমাদের সহিত দুই জন পাণ্ডা আসিতেছিলেন তাঁহারা হরিদ্বারে যাত্রীর জন্য গিয়াছিলেন কিন্তু যাত্রী না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহারা বামধারের একটা খাড়া পাহাড়ে উঠিলেন। এখান হইতে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাম শোণিতপুরে চলিয়া যাইবেন। গ্রাম ৪।৬ মাইল দূর হইবে। কতটা দূর আমাকে বলিয়াছিলেন এমন আমার স্মরণ হইতেছেনা, কিন্তু গুপ্তকাশী হইতে শোণিতপুর অল্প রাস্তায় ৩ মাইল দূর। এই প্রকারে আমরা কুণ্ড চটি পরিত্যাগ করিয়া একটা চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। চড়াইএর উপর একস্থানে দেখিলাম পাহাড় হইতে জল পড়িতেছে এবং নিকটে একখানা গ্রাম। এখানে গাছতলায় কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। রক্ষাকে তামাক সাজিতে বলিলাম কিন্তু সে আর আগুন করিতে পারিলনা। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়াতে শুকান ডালপালা সব ভিজিয়া গিয়াছে। আর তামাক খাওয়া হইল না। রাস্তায় চলিতে চলিতে যখন একটা ঝরণার নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতাম তখন রক্ষা ছোট ডাল পালা জ্বালাইয়া আগুন করিয়া তামাক সাজিত, এই ভাবেই হিমালয়ের পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়াছি। সিগারেট ব্যবহার করি না, হুকা, কল্কি ও তামাক রাস্তার সম্বল করিয়া চলিতাম। কুণ্ড চটির পর ২॥০ মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া বেলা ১০টার সময় গুপ্তকাশীতে উপস্থিত হইলাম।

গুপ্তকাশী

হিমালয়ের মধ্যে যে এক গুপ্তকাশী আছে তাহা অনেকেই জানেন না। ইহা উত্তরাখণ্ডে এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। দেবতারা এখানে গুপ্তভাবে তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম গুপ্তকাশী। হিমালয়ের মধ্যে আর একটী কাশী আছে, তাহার নাম উত্তরকাশী গঙ্গোত্তরীর রাস্তার অবস্থিত। গুপ্তকাশী পরম রমণীয় স্থান। এখানে মন্দাকিনী প্রায় ৮০০ ফিট নিম্নে প্রবাহিতা।

এখানকার প্রধান দেবতা বিশ্বনাথ। প্রস্তর বাঁধান বিস্তৃত প্রাঙ্গনের মধ্যে দু'টী মন্দির। একটীতে বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি ও পার্ব্বতী ও অপরটীতে বৃষারূঢ় শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অর্দ্ধনারীশ্বর ও বদরীনাথ। উভয় মন্দিরের মধ্যে ধাতুনির্ম্মিত নারায়ণ, লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আছে। পার্শ্বে—অন্য কুঠুরীতে ভৈরব ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। মন্দির দুইটীর সম্মুখে ও প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী কুণ্ড আছে, ইহাকে মণিকর্ণিকা কুণ্ড বলে। মন্দিরের পাশ্চাৎদিগস্থ পর্ব্বত হইতে ঝরণার জল মাটির নীচ দিয়া আসিয়া দুইটী ধারা অবিরত এই কুণ্ডে পড়িতেছে। একটী ধারা পিত্তলের হস্তী মুখ বিশিষ্ট ইহার নাম যমুনা ও অপরটী গোমুখ বিশিষ্ট, ইহাকে গঙ্গা বলে। এই কুণ্ডে সকলের স্নান ও তর্পন করিতে হয়। কুণ্ডের উদ্বৃত্ত জল অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এখানে "গুপ্তদান" নামে একটী প্রথা আছে। একটী নারিকেলের মধ্যে ইচ্ছামত স্বর্ণ বা রৌপ্য খণ্ড পুরিয়া ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিতে হয়। অবশ্য ইহা পাণ্ডাই পাইয়া থাকেন। এই গুপ্তদানে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়।

আমরা শুকনা নারিকেলের মধ্যে রজতখণ্ড পুরিয়া পাণ্ডাকে

উৎসর্গ করিয়াছিলাম। স্বর্ণখণ্ড আর কোথায় পাই আর অবস্থাতেও কুলায় না। প্রাঙ্গণের তিনধারে প্রস্তরের দ্বিতল বাড়ী এখানে যাত্রীরা থাকিতে পারেন। প্রাঙ্গনটী রাস্তা হইতে অনেক নিয়ে, রাস্তা হইতে এই সকল দ্বিতল বাড়ীগুলিকে একতালা বলিয়া বোধ হয়। রাস্তার কিনারে একতালা ঘরগুলিতে দোকান।

এখানে ডাকঘর, সরকারী ডাকবাংলা ১০।১৫ খানা দোকান, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য কাপড়, ছাতা, কম্বল, মনোহারী জিনিষ ইত্যাদি পাওয়া যায়। মন্দির সংলগ্ন অপর একটী বৃহৎ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাওল সাহেবের ও পূজারী ঠাকুরের থাকিবার স্থান। রাওল সাহেব এখানে ও উখীমঠে উভয়স্থানেই থাকেন।

যেমন দেবপ্রয়াগে বদরিনারায়ণের পাণ্ডাদের পিঠস্থান সেই প্রকার গুপ্তকাশীতে কেদারনাথের পাণ্ডাদের পিঠস্থান।

আজ প্রায় সমস্তদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হইতেছে। আমরা এখানে পৌছিয়া একখানা দ্বিতল বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। এই বাড়ীখানা নূতন এবং বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেক গুলিতে দরজা খিড়কী সবই আছে। গুপ্তকাশীতে আসিয়া রাস্তায় বামধারে প্রথমেই এই বাড়ীখানা। নিচের তলায় দোকান তথায় কাপড়, কম্বল ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। দোকানখানা বেশ বড় রকমের। নীচের তলায় অন্য একখানা। ঘরে রান্নার ঘর। এখানে বড় রকমের তিনখানা দোকান আছে। আমরা দোকান হইতে সব জিনিষপত্র খরিদ করিলাম পরে কুণ্ডতে স্নান তর্পনাদি ভোজ্যদান ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিলাম।

অম্বুবাচীর জন্য আজ বিধবাদের রান্না হইবেনা, আমার মাতা-ঠাকুরাণীও রান্না করিবেন না তাই প্রমথ বাবুদের সহিত আমার ও

শান্তির আহারের জোগাড় হইল। বৃষ্টির দিন খিচুড়ী রান্না হইল। আমরা পরিতোষ সহকারে আহার করিলাম। এখান হইতে উখীমঠের ও দূরস্থ গ্রামের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। আবাদি জমিগুলি বোধ হইতেছিল যেন পর্ব্বতগাত্রে ঢেউ চলিয়াছে। উখীমঠ এখান হইতে মন্দাকিনার অপর পারে নীচের রাস্তা দিয়া ৪ মাইল দূরে কিন্তু সমান্তরাল রেখায় বোধ হয় অর্দ্ধ মাইল হইবে।

সন্ধ্যার সময় প্রমথবাবু ও আমি শ্রীযুক্ত রাওল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শান্তি ও চলিল, সে আর বাসায় থাকিতে চায়না, কাজেই তাহাকে নিয়া চলিলাম। তখন টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি হইতেছিল। আমরা যাইয়া রাওল সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করিলাম। তিনি আমাদিগকে সাদরে অভ্যার্থনা করিলেন। রাওল সাহেবের নাম শ্রীযুক্ত নিলকণ্ঠ লেঙ্গা। তিনি ১২৫ জন রাওলের পর গদি পাইয়াছেন। তাঁহাকে নিয়া ১২৬ জন আজ পর্য্যন্ত কেদারনাথের রাওল হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ১৪২ খানা জাইগীর গ্রাম আছে এবং ইহার আয় বাৎসরিক ৩ হাজার টাকা এবং গ্রামবাসিরা বৎসরের সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিয়া থাকে।

বর্ত্তমান রাওল সাহেব সবে মাত্র ৪ মাস হইল গদি পাইয়াছেন। তিনি অবিবাহিত এবং রক্ষিতা স্ত্রীলোকও নাই। বয়স অনুমান ৩০ বৎসর হইবে। সুন্দর যুবা পুরুষ। পূর্ব্বতন রাওল সাহেবদের সকলেরই রক্ষিতা স্ত্রী ছিল এবং অনেকের পুত্র কন্যা ও হইয়াছিল।

রাওল সাহেব চারি সম্প্রদায় হইতে মনোনীত হইয়া থাকে—উত্তমকুল, মঠের চেলা, সর্ব্বসাধারণ ও রাওল সাহেব নিজে। এই ভাবে মনোনীত হওয়ার পর পৌড়ীর ডিপুটি কামশনার কর্ত্তৃক শেষ নির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

রাওল সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলাম। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের মন্দির বৈশাখ মাসের শুভ মুহূর্ত্তে খোলা হয় এবং কার্ত্তিক মাসের দীপান্বিতার দিন বন্ধ হয়। এইভাবে নানাপ্রকার গল্পে প্রায় ২ ঘণ্টা রাত্রি হইল এবং শাস্তিও বাসায় আসিতে ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। তিনি আমাদিগকে বাবা বিশ্বনাথের প্রসাদ দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১৪শ দিবস, ১০ই আষাঢ়—

পাণ্ডার সাহায্যে একখানা ঝাঁপান ও ২ জন মালবহনকারী কুলির বন্দোবস্ত করিলাম। শ্রীনগর হইতে যে কুলি আনিয়াছিলাম তাহাদিগকে গতকল্য বিদায় দিয়াছি। এখান হইতে কেদার পর্য্যন্ত প্রায় ক্রমাগত চড়াই এর রাস্তা। কাজেই মাতাঠাকুরাণীর জন্য একখানা ঝাঁপান ঠিক করিলাম, নচেৎ এই রাস্তায় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে। এখান হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ও কেদারনাথ দর্শনান্তে নানা চটিতে প্রত্যাগমন করিয়া উখীমঠ পর্য্যন্ত ঝাঁপানের ভাড়া ৩০৲ টাকা ও চইজন কুলির মজুরী ১৫৲ টাকা ঠিক হইল, আর শাস্তির কাণ্ডীওয়ালা কৃষ্ণা ও সঙ্গে যাছে।

আজ আমাদের বিশ্রাম। গতরাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছে, আজ ও সমস্তদিন বৃষ্টি হইতেছে। আহারাদির পর প্রমথবাবুর দল চলিয়া গেলেন, তিনি বলিলেন নারায়ণ চটিতে যাইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল।

শোণিতপুর গ্রাম এখান হইতে ১ মাইল দূর এবং তথায় ৩৬০ ঘরে ১০০ জন পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের মধ্য আবার ৮ জন সর্দ্দার আছেন। আমাদের পাণ্ডা দাতারাম ইহার মধ্যে একজন। শুনা

যায় এই গ্রামে বাণ রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আজ সুদূর আত্মীয় স্বজনের নিকট কয়েকখানা পত্র লিখিলাম।

১৫শ দিবস, ১১ই আষাঢ়—

আজ ও সমস্তদিন বৃষ্টি হইতেছে। আমার ঝাঁপানওয়ালা ও ২ জন কুলি তাহাদের গ্রাম হইতে আসিতে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল। আমরা আহারাদি করিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণীকে ঝাঁপানে রওনা করিয়া দিয়া আমি ও শান্তি রওনা হইলাম। এখান হইতে সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া ১॥০ মাইল দূরবর্ত্তী **নালা চটি** পার হইয়া **নারায়ণ চটিতে** (ভেতা বা নারায়ণ) উপস্থিত হইলাম। নালা চটির বিষয় প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বলিব কারণ এখানে বিশ্রাম করি নাই অথবা কিছু দর্শনও করি নাই। নারায়ণ চটিতে উপস্থিত হইয়া একখানা চটিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার একটা কুলি ভারী গোলমাল আরম্ভ করিল সে বলিল যে এত বড় বোঝা লইয়া আর যাইতে পারিবেনা। যখন তাহাকে স্তুতি মিনতি ও ভয় প্রদর্শনেও কাজ হইল না তখন আমার বস্তার কতকগুলি জিনিষ রাস্তাতে রাখিয়া যাইব এই প্রকার বলাতে সে রাজি হইল।

এখান হইতে কালীমঠ যাইবার রাস্তা গিয়াছে। বহুপূর্ব্বে এস্থান খুব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল তাহা এস্থানের মন্দিরগুলি দর্শনে বুঝিতে পারা যায়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বদরীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে এখানে ৩৬০টী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন আর এতগুলি মন্দির নাই যে কয়েকটা আছে তাহাও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। রাস্তার পার্শ্বে বীরভদ্র ও সত্যনারায়ণ দেবের মন্দির এবং সম্মুখে একটী

কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং গাত্রে খোদিত লেখন দেখা যায়। পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছোট ছোট কয়েকটী মন্দির। রাস্তার অপর পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, একটী জলাধার ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির। চটির মধ্যে দেখিলাম একজন ব্রাহ্মণ কুষ্ঠি তৈয়ার করিতেছেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। আমরা ঝিঁউ চটিতে উপস্থিত হইয়া অল্প সময় বিশ্রামান্তে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই চটিটী দুই ভাগে বিভক্ত "ভলা ও মলা"। একটী চটি পার্ব্বত্য ঝরণার পারে তথায় স্রোতের বেগে অনেক সুন্দর সুন্দর কাঠের জিনিষ তৈয়ার হইতেছে, তাহার মূল্য ও বেশী নয় আর গম পিষিয়া আটাও তৈয়ার হইতেছে। জলের স্রোতে একটী চক্র কৌশলে বসাইয়া দেয় এবং তাহার ঘূর্ণিত বেগের সাহায্যে কাঠের বাটি, থালা, বড় বড় ঘট, কমণ্ডলু, তামাক খাইবার কল্কি ইত্যাদি তৈয়ার হয় এবং আটা ও পিষা হয়। এই প্রকার হিমালয়ের মধ্যে সকল স্থানেই ঝরণার জলের সাহায্যে আটা পিষা হইয়া থাকে। অপর চটিটী চড়াইএর উপর কিছু ব্যবধানে অবস্থিত।

দুর্গা বা মৈখণ্ডা—এই চটির পর ২ মাইল চড়াই পার হইয়া দুর্গা বা মৈখণ্ডা চটিতে আসিয়া দেখিলাম প্রমথ বাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। গতকল্য তাঁহারা এই চটিতে পৌঁছিয়া আমাদের জন্য বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণে জল আসিল। মনে হইল কতকালের হারানিধিকে পাইলাম। এখানে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর মন্দির ও বড় একটা লৌহ-শিকল যুক্ত দোলনা আছে। চটিতে ৩ খানা ঘর। পাইপ হইতে অল্প অল্প জল প'ড়তেছে উহা আবার মধ্যে মধ্যে খারাপ হইয়া যায়। মন্দিরটী ছোট এবং ভিতরে অন্ধকার। দর্পনে বাহিরের আলোক প্রতিফলিত হইয়া দেবীর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করে

এবং তাহাই যাত্রীরা দর্শন করেন। অবশ্য সন্ধার সময় বাতির আলোকেও দেবীর দর্শনলাভ হইয়া থাকে। দোলনায় সকলকেই দোল খাইতে হয়, আমরাও ইচ্ছামত দোল খাইলাম। দেবীর নিকট চণ্ডী পাঠ করা দরকার তাই এখানকার পূজারী ব্রাহ্মণকে চণ্ডী পাঠের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিলাম। তিনি পাঠ করিয়াছেন কি না তিনিই জানেন কারণ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আর এই পূজারীর সাক্ষাৎ পাই নাই। ২ সপ্তাহ পর পর পূজারী বদলি হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটী বালক বালিকা কেদার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা করিল। আমরা আর দেরী না করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম—সমতল রাস্তা এবং রাস্তার পার্শ্বে গ্রাম ও ক্ষেত্রগুলি শস্যপূর্ণ তাহার মধ্যে ডাঁটার ফসলই অধিক। এক মাইল দূরবর্ত্তী **ফাটা** চটি বেশ বড় অনেকগুলি ঘর এবং নানাবিধ জিনিষপত্র পাওয়া যায়। আমার টুপিটা বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাওয়াতে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল তাই তাহাকে একটা দোকানে পেন্সন দিলাম। একটা বোঝা কমিয়া গেল। এখানে ডাকঘর, ডাকবাংলা ও ছোট একটী ধর্ম্মশালা আছে। এই চটির পর হইতে জঙ্গল ও চড়াই আরম্ভ হইল এবং কেদারনাথ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ভীষণ জঙ্গল ও চড়াই।

এখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে. আমরা আর এখানে বিশ্রাম না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বাদলপুর—এই চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। পাণ্ডাকে বলাতে তিনি কয়েকখানা রুটি তৈয়ার করিয়া দিলেন। কয়েকখানা প্রাতঃকালের জলযোগের জন্য রাখিয়া দিলাম। সকলেরই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

১৬শ দিবস, ১২ই আষাঢ়—

সকালে ৭টার সময় বাদলপুর পরিত্যাগ করিলাম। রাস্তার উভয়ধারে অনেক ডাঁটা ক্ষেত্র দেখিলাম। কিছু ডাঁটা শাকও সংগ্রহ করিলাম।

রামপুর—২ মাইল পরে এই চটি। এখানে অনেকগুলি চটির ঘর এবং একটী কালীকম্বলীবাবার ধর্ম্মশালাও আছে। দুগ্ধ পাওয়া যায়। গরম দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আমিও শান্তি পান করিলাম। মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। এক মাইল উৎরাই এর পর একটী বড় প্রস্রবণ পাইলাম, ইহার নাম "পতিগাধ"। এই প্রস্রবণের উপর সেতু আছে. ইহার প্রায় ২৫০ হস্ত দূরে দুইটী রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। একটী ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি ত্রিযুগীনারায়ণ আর অপরটী সোজা শোনকপ্রয়াগ হইয়া কেদারনাথ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

সকল যাত্রীরাই প্রথমে ত্রিযুগনারায়ণ দর্শন করিয়া পরে কেদারনাথ যাইয়া থাকেন কিন্তু আমরা বরাবর কেদারনাথ অভিমুখেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা কেদারনাথ হইতে ফিরিবার সময় ত্রিযুগীনারায়ণ যাই। এইস্থানের বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব।

আমরা কিছু পরেই শোনক প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। এখানে শোন নামক নদী মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। শোন নদীকে বাসুকী গঙ্গাও বলিয়া থাকে। এই নদীর উপর একটী লৌহ নির্ম্মিত ঝোলান সেতু আছে। ইহা ১৯১৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে কাষ্ঠের পুল ছিল। কয়েক বৎসর হইল একবার যাত্রী সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে এ প্রকার প্রায় হয় না। প্রায় ২০০ যাত্রী একসঙ্গে পার হইতে যাইয়া পুল ভাঙ্গিয়া যায় এবং সকলেই নদীতে পড়িয়া যান। তাহাতে প্রায় ৪০।৫০ জন মৃত্যুমুখে পতিত

হন এবং অনেকে আহত হন। এই প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা আর কখনও হয় নাই। পূর্ব্বে এখানে একখানা মাত্র চটির ঘর ছিল এখন আর তাহার চিহ্নও নাই।

সেতু পার হইয়াই একটা খাড়া চড়াই আরম্ভ হইল। এত খাড়া যে ঝাঁপানের যাত্রীকেও নামিতে হয়। অর্দ্ধ মাইল ভীষণ চড়াই এর পর মুণ্ডকাটা গণেশের একখানা ছোট মন্দির আছে। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড, কেবলই চড়াই, তবে তাহা অত্যন্ত কঠিন নয়। কৃষ্ণা মোটেই হাঁটিতে পারে না, সে ঘনঘন বিশ্রাম করিতে লাগিল। গৌরীকুণ্ড পৌছিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল।

গৌরীকুণ্ড

ইহা একটী বড় চটি। অনেক গুলি দ্বিতল ঘর—উপরে যাত্রীরা থাকে নীচের তলায় দোকান। এখানে একটী বাঁধান চত্বরের মধ্যে মন্দির তথায় গৌরীশঙ্কর ও লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন। অদূরে দুইটী কুণ্ড। একটির জল শীতল ও অপরটির জল গরম। শীতল জলের কুণ্ডটীর জল হরিদ্রাবর্ণ ও জলের তাপ ৭০ ডিগ্রী, আর গরম জলের কুণ্ডে গন্ধকের মত একটা তীব্র গন্ধ অনুভূত হয়, জলের তাপ ১২৮ ডিগ্রী। সকলে শীতল জলের কুণ্ডে স্নান করে, গরম জলের কুণ্ডে স্নান করা অসম্ভব। কিন্তু এই কুণ্ডের জলেই তর্পণ করিতে হয়, চারি ধারে বাঁধান পার আছে।

উক্ত প্রস্রবণ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি যখন ধর্ম্ম প্রচার মানসে সশিষ্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন তখন কিছুদিন বদরীক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া পরে কেদারনাথ তীর্থে আগমন করেন। এখানে শীতে তাঁহার

শিষ্যগণের অত্যন্ত কষ্ট দর্শন করিয়া কেদারনাথের নিকট একটী উষ্ণ প্রস্রবণ প্রার্থনা করেন। কেদারনাথ ইহা কি অবহেলা করিতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান। তাঁহারই কৃপায় এখানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি হইল। ইহাই গৌরী কুণ্ডের নিকট সেই উষ্ণ প্রস্রবণ। ইহাকে আমি "শঙ্কর প্রস্রবণ" বলিব। এখানকার লোকেরা বলে এই জলে স্নান করিলে অনেক দুরারোগ্য চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা যে অমূলক তাহা বোধ হয় না, কারণ গন্ধকে অনেক রকম চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। ভগবানের সৃষ্টি বৈচিত্র্যে যে কত প্রকার কৌশল আছে তাহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। প্রমথ বাবু সকলের নিষেধ সত্ত্বেও এই গরম জলের কুণ্ডে স্নান করিতে নামিয়াছিলেন, বোধ হয় পুণ্য সঞ্চয় একটু বেশী রকম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যেই নামা অমনি তাঁহার বাহ্য জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। তিনি মনে করিলেন কুণ্ডের তলদেশে বোধ হয় কিছু ঠাণ্ডা হইবে কিন্তু সেখানেও তদ্রূপ। তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর অল্প সময় কুণ্ডের মধ্যে থাকিলে পুণ্যের কথা মনে করিলে একেবারে কৈলাসে উপস্থিত হইতে হইত! "বাপ্‌রে বাপ্‌!" শব্দে তিনি অস্থির হইয়া উপরে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। উভয় কুণ্ডের জল মাটির নীচ দিয়া আসিয়া কুণ্ডে পতিত হইতেছে এবং উদ্বৃত্ত জল অন্য রাস্তা দিয়া বহির্গত হইয়া মন্দাকিনীতে যাইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শীতল কুণ্ডের জল হরিদ্রাবর্ণ। বোধ হয় পাণ্ডারা কুণ্ডে হরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়া জলে রং করিয়া থাকেন। উভয় কুণ্ডের জল এক বুকের বেশী নয় এবং কুণ্ড দুইটী সামান্য ব্যবধানে অবস্থিত।

এই স্থানে পার্ব্বতী ঋতুস্নান করিবার সময় গণেশ দ্বাররক্ষক ছিলেন। এমন সময় মহাদেব তথায় আসিলে গণেশ বাধা দেন। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া গণেশের মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলেন। পরে পার্ব্বতীর অনুনয়ে ঐরাবত হস্তীর মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দেন। এই তীর্থ সিদ্ধি প্রদায়ক। কেদার খণ্ডে লিখিত আছে যে, শিব এখানে গৌরীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং জীবকে শিবলোক প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করেন এবং এখানকার মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তিনি পার্ব্বতীর ন্যায় শিবের প্রিয় হন। এই তীর্থে যাহা কিছু সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার ফল কোটী গুণ হয়। এখানে একটী ব্রাহ্মণের প্রবল জ্বর হওয়াতে তাহাকে দেখিবার জন্য আমার পাণ্ডা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ প্রদান করিলাম। কোনও ফলের আশা করি নাই বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে করিয়াছিলাম। তখন যদি জানিতাম সকল সৎকার্য্যের কোটী গুণ ফল লাভ হয় তবে না হয় আরও কিছু করিয়া আসিতাম।

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় কেদার অভিমুখে রওনা হইলাম।

গুপ্তকাশীর পর হইতে সমস্ত চটিগুলিই প্রায় অপরিষ্কার। এখান হইতে রাস্তা দুর্গম, ক্রমাগত চড়াই—স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এক হাত মাত্র পরিসর। রাস্তার বাম ধারে ভীষণ জঙ্গল ও খাড়া পাহাড় এবং ডান ধারে মন্দাকিনী। আমাদের ইচ্ছা ছিল রামবাড়া চটিতে যাইয়া রাত্রি যাপন করিব কিন্তু বেলা প্রায় অবসান আর এই প্রকার ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়া সন্ধ্যার পর চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঝাঁপান পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। প্রমথবাবুকে বলিলাম যে আজ আর রামবাড়া যাওয়া

হইবেনা। বেলা গিয়াছে আর রাস্তার অবস্থাও খারাপ, আবার তাহার উপর কৃষ্ণা ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। তিনি পাণ্ডাকে বলিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি যাইয়া ঝাঁপানওয়ালাদের আরাম চটিতে থাকিতে বলিবেন। তিনি তাহাই করিলেন। আমি শান্তিকে নিয়া আরাম চটিতে পৌঁছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী চটিতে বসিয়া আছেন। তিনিও আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। গৌরীকুণ্ড হইতে আরাম চটি দুই মাইল। এখানে একখানা দোকান। অন্য একখানা ঘর খালি পড়িয়া আছে।

আমরা বিছানা পাতিলাম। চটিতে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে এক ভৈরবের মন্দির আছে, তথায় চীরবস্ত্র দিতে হয়, এইজন্য ইঁহাকে "চীর বাসা" ভৈরব বলে। আমি একটুকু ছিন্ন বস্ত্র ঝুলাইয়া দিলাম। ইহাতেই তাঁহার পূজা হইল। এইভাবে তাঁহার পূজা না করিলে সকল ফল হরণ করেন।

তস্মৈ চীরাদিকং দত্ত্বা সর্ব্বং পুণ্যং লভেন্নরঃ।
অন্যথা তৎফলং সর্ব্বং হরতে, ভৈরবঃ শিবঃ॥

কেদার খণ্ড।

বৃষ্টির দিন তাহার উপর আবার জঙ্গলা স্থান এবং অন্ধকার রাত্রি, বিশেষ ভয়ের কথা। সকলেরই শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কে আর রান্না করে? পাণ্ডাকে বলাতে তিনি খিচুড়ী রান্না করিলেন। প্রমথবাবু, সাধুজী, কৃষ্ণা, পাণ্ডা ও আমি গ্রাহক হইলাম। শান্তি সন্ধ্যার পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে আর রাত্রিতে খায় না, সমস্ত দিবস কাণ্ডীতে বসিয়া বসিয়া সেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খিচুড়ী রান্না হইয়া গেলে আমাদের ডাক পড়িল। আমরা আহারে বসিলাম। খিঁচুড়ীর যেমন চেহারা তেমনই আস্বাদন হইয়াছে। প্রমথবাবু এবং আমি

কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। আর সাধুজী—জোর করিয়া আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। চটির ঘরের কিনারে বসিয়াই মুখ ধুইলাম, বাহিরে যাইতে সাহস হইল না। রাত্রিতে শান্তির বাহ্যের বেগ হইল তখন নিরুপায়। কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বাতি ও লাঠি লইয়া শান্তিকে চটির এক কোণে বসাইয়া বাহ্য করাইয়া আনিলাম। প্রমথবাবুর পরিবারবর্গ আর আহারাদি করিলেন না, তাঁহারা চটিতে পৌঁছিয়াই শুইয়া পড়িলেন। আমাদের বিছানার সামনে আমাদের ছাতা তিনটী মেলিয়া রাখিয়া দিলাম এবং লণ্ঠনটাও জ্বালাইয়া রাখিয়া দিলাম। কেদারনাথের কৃপায় রাত্রিতে কোনও প্রকার উপদ্রব হয় নাই।

১৭ দিবস, ১০ই আষাঢ়—

সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রা করিলাম। রাস্তা খুব খারাপ, পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। শান্তির জন্যই আমার ভয় বেশী, কঠিন রাস্তায় আমি শান্তির কাপড় ধরিয়া থাকিতাম—যদি কৃষ্ণার পা পিছলিয়া যায় তবে আর নিস্তার নাই। নিজের জন্য মোটেই ভাবনা ছিল না।

এই চটি হইতে এক মাইল দূরে "ভীমসেন লীলা"। সকলে বলে এখানে ভীমসেন স্বর্গ আরোহণ করিবার সময় শীতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখান হইতে রামবাড়া চটি এক মাইল। আমরা মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতেছি। মন্দাকিনীর অপর পারে, অর্থাৎ বামতীরে, ভীষণ জঙ্গল ও খাড়া পর্ব্বত। স্থানে স্থানে শ্বেতধারা বিশিষ্ট জলপ্রপাতগুলি দেখিতে অত্যন্ত মনোরম; কোনটা ৩০০ হাত, কোনটা বা ৪০০ হাত উপর হইতে ঠিক খাড়া ভাবে প্রবলবেগে জল পড়িতেছে। এপারে অনেক ঝরণা

আছে, কিন্তু তাহা জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসাতে দৃশ্যহীন হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া আছে। এই ভাবে আমরা রামবাড়া চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রামবাড়া—এখানে কয়েকখানা ঘর ও কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা আছে। চটির মধ্য দিয়া একটী ঝরণা চলিয়া গিয়াছে এবং পার্শ্বে মন্দাকিনী। এখানে অল্প সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।

এখান হইতে কেদার সাড়ে তিন মাইল। দুই মাইল কঠিন চড়াই, স্থানে স্থানে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। বাকী দেড় মাইল রাস্তা প্রায় সমতল।

কেদারের দুই মাইল নিম্নে বেশী জঙ্গল নাই। স্থানে স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যদিও মেরামত হইতেছে তথাপি এই স্থানের রাস্তা ঠিক রাখা অসম্ভব। পার্ব্বত্য নদী চারি ধারে সাদা দেখাইতেছে। আমরা অতি কষ্টে চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম ও ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাস্তার ডানে ও বামে সুন্দর সুন্দর নানা রংএর নানা জাতীয় পুষ্প ফুটিয়া আছে, দেখিতে কি চমৎকার! কেদারনাথকে চড়াইবার জন্য আমরা সকলেই কতকগুলি পুষ্প আহরণ করিলাম। এই প্রকার পুষ্প দিয়াই কেদারনাথের পূজা হইয়া থাকে। যদি পর্ব্বত গাত্রে এই সব পুষ্প না থাকিত তবে আর কেহ কেদারনাথকে পুষ্প দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। ইহা ভগবানেরই মহিমা। তুঙ্গনাথ ও বদরিনাথেও এই প্রকার পুষ্প যত্র তত্র লাল, নীল, সাদা, পীত, বেগুনে প্রভৃতি রং বিশিষ্ট ভুঁইচাঁপার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। রাস্তাতে একদল যাত্রী কাণ্ডী ও ঝাঁপানে চড়িয়া কেদারনাথ দর্শন করিয়া নীচের দিকে আসিতেছেন।

তাহাদিগকে দেখিয়া "জয় কেদার নাথ কি জয়" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিলাম। সকল যাত্রীরা যাইবার ও ফিরিবার সময়ে রামবাড়া চটিতে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। দুই মাইল চড়াই এর পর "দেব দখনী" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একটী গণেশ আছেন। এস্থানই বোধ হয় কেদারনাথের পুরীর দ্বার স্বরূপ। এখান হইতে আর চড়াই নাই। এই স্থানটী সমতল এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বাঁধান। প্রমথ বাবু, তাঁহার স্ত্রালীরা, সাধুজী, এবং আমি এখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। এই বরফের দেশেও রাস্তার কষ্টে সকলেরই অত্যন্ত পিপাসা বোধ হইল। প্রমথ বাবুর সঙ্গে গুড় ছিল তাহারই আমরা সৎব্যবহার করিলাম এবং জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলাম। এখান হইতে প্রায় সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূরে গিয়া রাস্তার একটা মোর ঘুরিতেই দেখিলাম একজন সন্ন্যাসী একটী গুহার ভিতর আশ্রম করিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখন এখানে নাই, অন্য কোথাও গিয়াছেন। গুহাটির এক ধার খোলা, তথায় কতকগুলি প্রস্তর দিয়া রাস্তা বন্ধ এবং যে স্থান দিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতে হয় তথায় ধুনি জ্বালান হইয়াছে। এখানে জঙ্গল নাই এবং হিংস্র জন্তুরও ভয় নাই। আর কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম পাহাড়ের চাপ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাই আমরা অতি কষ্টে পার হইলাম। চারি ধার কুয়াসার আচ্ছন্ন এবং মেঘগুলি আমাদের নীচে ও উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বোধ হইল এখনই বৃষ্টি হইবে। কিছু সময় পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ভিজিতে ভিজিতে চলিলাম, আমাদের একটা ছাতা আজ সকালে পাণ্ডাকে দিয়াছিলাম, সঙ্গে একটী মাত্র আছে তাহা শান্তিকে দিলাম, আমি ভিজিতে লাগিলাম। সাধুজী তাঁহার কম্বলখানা মাথায় দিয়া চলিলেন। কিছু সময় পর কেদারনাথের পুরী ও মন্দির দৃষ্টিপথে পড়িল। আমরা "জয়

কেদারনাথ কি জয়' স্বরে আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিলাম ও ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলাম। পরে মন্দাকিনীর উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া কেদারনাথের পুরীতে প্রবেশ করিলাম। কেদার নাথকে দর্শন না করিয়া বদরীনাথকে দর্শন করিলে যাত্রার ফল হয় না। আমরাও তাহাই করিলাম।

কার্য্যং বদরিকাশস্য দর্শনং শুভদায়কম্।
অকৃত্বা দর্শনং পুত্র কেদারস্যঘনাশিনঃ॥
যো গচ্ছেদ্ বদরীং তস্য যাত্রা নিস্ফলতাং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন পূর্ব্বং কেদার দর্শনম্॥

কেদার খণ্ড।

শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ

পুরীতে প্রবেশ করিতে সেতুর নিকট গঙ্গাদেবীর মন্দির। যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার জন্য একখানা ঘর আছে। এখান হইতে অল্প চড়াই রাস্তা। আমরা ক্লান্ত হইয়া বেলা ১টার সময় কালীকমলীবাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রমথ বাবুর মাতা ও আমার মাতাঠাকুরাণী অনেক পূর্ব্বেই ঝাঁপানে তথায় পৌঁছিয়াছেন। সাধুজী এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছে না।

আমাদের সঙ্গে বিল্বপত্র ছিল এবং একটী বিল্ব ফলও শ্রীশ্রী৺কেদারনাথকে চড়াইবার জন্য আনিয়াছিলাম। ত্রিযুগী নারায়ণ হইতে যে সব কম্বল ও অঙ্গুরী ক্রয় করিয়াছিলাম সেই সব এবং উক্ত বিল্বপত্র, বিল্বফল, পুষ্প এবং কেদারনাথকে ঘৃত মাখাইবার জন্য দোকান হইতে কিছু

ঘৃত নিয়া মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণীর, শান্তির ও আমার দর্শন, পূজা ও ঘৃত মাখাইয়া শ্রীশ্রী৺কেদারনাথকে আলিঙ্গন প্রথমে হইয়া গেল, পরে প্রমথ বাবুদের কার্য্য সমাধা হইল। পূজার সময় লিঙ্গোপরি একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্রে গঙ্গাজল ঢালিলাম। কঙ্কন শ্রীশ্রী৺কেদারনাথকে স্পর্শ করাইলাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিলাম। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর ও পূজারী মন্ত্র পড়াইলেন। যাত্রীরা দর্শন, পূজন, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ প্রাণ ভরিয়া করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতের মধ্যে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের মন্দির। ইহা সমুদ্র-বক্ষ হইতে ১১,৭৫৩ ফিট উচ্চে এবং হরিদ্বার হইতে ১৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত। মহাপথ নামক শিখর ২২, ৮৫৩ ফিট উচ্চ। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ জগমোহন। প্রথম প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্য ভাগে পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং বাহিরের প্রকোষ্ঠে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, নন্দী ও প্রমথগণের মূর্ত্তি; এবং মধ্য স্থলে একটী বৃহৎ বৃষ আছে। মন্দিরের কোনও জানালা নাই, একটী মাত্র দরজা এবং ভিতরে প্রদীপ দিবা রাত্রি জ্বলিতেছে। মন্দিরের বাহিরে কতকগুলি কুণ্ড আছে। পশ্চাৎ ভাগে অমৃত কুণ্ড, ঈশান কোণে সুবর্ণ কুণ্ড, হংস কুণ্ড, সম্মুখে অল্প ব্যবধানে উদক কুণ্ড এবং কেদারনাথের পুরীর পূর্ব্ব ধারে রেতঃ কুণ্ড। উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ধারের পর্ব্বত হইতে ক্ষীর, মহোদধি, সরস্বতী, স্বর্গদ্বারী ও মন্দাকিনী গঙ্গা বহির্গত হইয়া মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়া রুদ্র-প্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক তীর্থ আছে তন্মধ্যে স্বর্গারোহিণী, ভৃগুপতন, সিন্ধু সাগর, ত্রিবেণী তীর্থ, মহাপথ ও শিব কুণ্ড প্রভৃতি প্রধান।

কেদারনাথের মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও দক্ষিণ দ্বারী। গাড়োয়াল জিলার মন্দির সকলের গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরণের। কেদার-

নাথের লিঙ্গ-মূর্ত্তি। কিন্তু এই লিঙ্গমূর্ত্তি আমাদের দেশের শিব লিঙ্গের ন্যায় নহে। ইহা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট গৌরী পীঠের উপর বিশাল লিঙ্গ বিদ্যমান। প্রায় আড়াই হাত উচ্চ, এবং সূক্ষ্মাগ্র একখানা প্রস্তর। তলদেশে এক এক ধার ৩।৪ হাত লম্বা। চারিধার বাঁধান এবং ভিতরের জল বহির্গমনের জন্য একটী নালা আছে। যাত্রীরা এই লিঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া পাপ ও মহাব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইচ্ছামত আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। যাত্রীরা ইচ্ছামত দর্শন ও স্পর্শন করিয়া থাকেন কেহই বাধা দেয় না। ভিতরে ভিড় হইলে এই সকল কার্য্য তাড়া তাড়ি এবং এক সঙ্গে অনেককে করিতে হয়। মন্দিরের সর্ব্বত্রই ভিজা এবং সর্ব্বদা টুপ টাপ করিয়া জল পড়িতেছে। মন্দির হইতে একটী বাঁধান রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। পুরীর মধ্যে একটী মাত্রই রাস্তা এবং উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বাটি।

কেদার মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র মহা সমরের পর পাণ্ডবগণ জ্ঞাতি বধ জনিত পাপক্ষয় মানসে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও পাপক্ষয় করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের দর্শন মানসে হিমালয়ে আগমন করেন। কিন্তু দর্শন না পাইয়া তাঁহারা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন এমন সময় কেদারনাথ বিশাল মহিষ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন এবং ঐস্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে উপস্থিত প্রায় দেখিয়া মহিষ ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধরণী মধ্যে লুকায়িত দেখিয়া তাঁহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং কেদারনাথের স্থানে যাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন। তদবধি পশ্চাৎ ভাগ এই স্থানে পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল এবং এই মূর্ত্তি কেদার নামে ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ হইল, ইহা মুক্তিপদ। নেপালে পশুপতি নাথের যে মূর্ত্তি আছে তাহা এই বিশাল মহিষের মেচ।

কেদারনাথের অবশিষ্ট অঙ্গগুলি নিম্নলিখিত স্থানে পূজা হইয়া থাকে—তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ। মণ্ডল চটি হইতে যাইতে হয়। মধ্যমহেশ্বরে নাভি এবং কল্পেশ্বরে জটা ও মস্তক পূজা হইয়া থাকে।

কেদারনাথের মন্দির ও পুরী একটী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর ধারে একটী বিশাল চির তুষার মণ্ডিত ভীষণাকৃতি পর্ব্বত গর্ব্বিতভাবে দণ্ডায়মান। উহা মন্দির হইতে এক মাইলের অধিক হইবে না। দেখিলেই ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। চারি মাইল দূরে মহাপথের রাস্তায় ভৈরবঝম্প নামক একটী খাড়া পাহাড় আছে। পূর্ব্বে অনেক সন্ন্যাসীরা মোক্ষ প্রাপ্তির আশায় এখান হইতে ঝম্প প্রদান করিতেন এবং মহাপ্রস্থান করিবার অগ্রে একটী বিশাল পর্ব্বত গাত্রে তাঁহাদের নাম লিখিয়া যাইতেন।

এখন আর তথায় কেহ যান না, এই রাস্তা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে এখনও অনেকগুলি ত্রিশূলের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, এই ত্রিশূলগুলি লাল, কাল ও সাদা বর্ণে অঙ্কিত। এক একটী কম্পিত হস্তে অঙ্কিত হওয়াতে তরঙ্গের ন্যায় দেখা যায়, ইহাতে বুঝা যায় কোনও কোনও বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে একজন পূজারী শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ দেবের পূজা করিতেন। এই প্রকার ক্ষমতাশালী লোক এখন আর দেখা যায় না, তাঁহারা পরম যোগী ছিলেন। পূর্ব্বে এই উভয় পুরী যাতায়াত করার জন্য একটী সোজা রাস্তা ছিল কিন্তু পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এই রাস্তা বন্ধ হইয়াছে। এখন কেদার হইতে বদরিকাশ্রম যাইতে ৭।৮ দিন লাগিয়া থাকে। কেদারনাথের পুরীর উত্তর ধারে যে বিশাল তুষার পর্ব্বত দৃষ্ট হয় সেই স্থানে পরশুরামের পতন হইয়াছিল, সেইজন্য উক্ত স্থানের

নাম ভৃগুপতন বা মহাপথ। এই রাস্তা দিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় ছয় পয়সা করিয়া টিকিট ক্রয় করিতে হয়। মন্দিরে পূজারীকে যে যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই দেন। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা মন্দিরের নিকটে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ধারের ঘরগুলিতে বাস করেন, ইহার পরে একখানা চালাঘরে মিঠাই ও পুরীর দোকান। আমরা একখানা দোকানই দেখিলাম। কারণ এবার যাত্রী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এখানে কালীকম্বলীবাবার একখানা ধর্ম্মশালা আছে, ইহা দ্বিতল বাটী, দরজা, জানালা ইহাতে সবই আছে। উপরে টিনের ছাত। প্রকোষ্ঠগুলি ছোট ছোট এবং একটী করিয়া জানালা, তাহাও ক্ষুদ্র। আমরা এই ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেছি। এখানে ইন্দোর, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়োবের রাজন্যবর্গের ও কলিকাতার চাষা-ধোবা পাড়া নিবাসী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা এবং পাণ্ডা ঠাকুরদের সর্ব্বসমেত ৩০।৪০ খানা ঘর আছে। সকলগুলিই দ্বিতল।

আমরা মন্দির হইতে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া আহারের জোগাড় করিলাম। দোকান হইতে পুরী ও তরকারী ক্রয় করিয়া আনিলাম। পুরীর সের এক টাকা, তরকারী আর কিছু নয়, ইহা জঙ্গলী শাক। মিঠাইও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ঘৃতের সের চারি টাকা।

সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে কেদারনাথের আরতি দেখিতে চলিলাম। বেশী কিছু আড়ম্বর নাই। ধর্ম্মশালার স্বামীজীর বাড়ী আলমোরা জিলার অন্তর্গত। তিনি খুব ভাল লোক, আমাদের

অনেক খাতির যত্ন করিলেন, যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমাদের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি ভাল ভাল কম্বল দিলেন। কি দারুণ শীত, সোয়েটার ও কম্বল থাকা সত্ত্বেও শীতে কন্ কন্ করিতে আরম্ভ করিল। ধূনির বন্দোবস্ত স্বামীজী করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের সাধুজী ধূনির নিকট হইতে আর নড়াচড়া করিতে চান না। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দ শুনিতেছি, ইহা বোধ হয় উত্তর ধারের বরফের স্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়াতে এই প্রকার গম্ভীর শব্দ হইতেছে। এখন পুরীতে কোথাও বরফ নাই, পর্ব্বতের উপরিভাগ বরফে ঢাকা।

মধ্যে মধ্যে কি দিন, কি রাত্রি, অনেক সময়ে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার মত হইতেছে। মাতাঠাকুরাণী ও সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহাদেরও এই প্রকার হয়। আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম না। যখন রৌদ্র হয় তখন শীত বেশী নয় বটে কিন্তু যখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও বাতাস চলিতে থাকে তখন কি ভীষণ শীত। সমস্ত হাত-পা যেন অবশ করিয়া ফেলে। এই শীতের মধ্যে আজ আর স্নান করিতে ইচ্ছা হইল না। এখানে আচমন করিলেই শুদ্ধ হয়। ঠাণ্ডা জল দিয়া মুখ ধোয়ার সময় দাঁতের গোড়া অবশ হইয়া যায়, মুখে জল দিতে ইচ্ছা করে না।

ধর্ম্মশালার একটী চাকর আছে, সে খুব সাধাসিধা লোক, যখন যে কাজের জন্য বলা যায় তখনই তাহা করিয়া দেয়।

আরতি দেখিয়া আসিয়া চা'র জন্য তাহাকে আমার কেটলীতে কিছু গরম জল আনিতে বলিলাম, সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া

নিয়া আসিল। রাত্রিতেও দোকানের পুরী আহার করিলাম। ভাতের বন্দোবস্ত আর হইল না। একে দারুণ শীত তাহাতে আবার নানা-প্রকার অসুবিধা। ছোট একখানা প্রকোষ্ঠের মধ্যে আমাদের শয়নের বন্দোবস্ত করিলাম। সাধুজী বারেন্দায় শয়ন করিলেন। বারেন্দাখানাও একখানা ঘরের মত, দেওয়ালেও জানালা আছে, আমি একটা জানালা খুলিয়া রাখিলাম। সাধুজী ধুনি জ্বালিয়া ভিজা কাপড় শুকাইতে লাগিলেন, ধূঁয়াতে ঘর ভরিয়া গেল, আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তাঁহাকে বলিলাম একেই নিশ্বাস বন্ধ হইতেছে তাহার উপর আবার আপ'ন ধূঁয়া করাতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইতেছে, এখন আগুন রাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকুন। ইহা বলা সত্ত্বেও তিনি আগুন ফুঁয়াইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম এখন যদি আপনার ধুনি বন্ধ না করেন তবে জল ঢালিয়া দিব। অগত্যা তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। সকলেই শয়ন করিয়াছি আমার আর ঘুম হয় না; বোধ হইতেছে এইবার বুঝি দম বন্ধ হইবে। এক একবার উঠি আর জানালার নিকট মুখ রাখি। এইভাবে রাত্রি প্রায় ১২ কি ১টা বাজিয়া গেল। শেষবারে যখন শয়ন করিলাম তখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১৮ দিবস, ১৪ই আষাঢ়—

সকালে ধর্ম্মশালায় চাকরটির নিকট হইতে ছোট এক কেটলী গরম জল আনিয়া তাহা দ্বারা চা তৈয়ার ও হাত মুখ প্রক্ষালন করিলাম। জল এত ঠাণ্ডা যে তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা হয় না, মুখে দিলে দাঁতের গোড়া শীর শীর করে। এখানে আর স্নান করিলাম না। এত শীত যে স্নান করিলে রক্ত জমাট বাঁধিয়া যাইত সেই বিষয় আর সন্দেহ নাই। আচমনেই তত

হওয়া যায়, আমরা উদক কুণ্ডে আচমন করিলাম, এবং পূজারী প্রভৃতি সকলেই এই প্রকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যে জামা ও পায়জামা দেখিলাম তাহা বোধ হয় না যে কত মাসের মধ্যে ধৌত করিয়াছে। এই ভাবেই তাঁহারা কেদারনাথের পূজা পাঠ করিয়া থাকেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি হইতেছে, আর কি ভীষণ শীত।

আজ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের দর্শন, পূজন, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ মন প্রাণ ভরিয়া করিলাম। জীবন ও জন্ম কৃতার্থ জ্ঞান হইল। এত দিনের দারুণ পরিশ্রম সার্থক হইল। মাতাঠাকুরাণীকে মন প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের পূজা অর্চনা করিতে বলিলাম, তিনি রোজ যে দেবতার পূজা করিতেছেন তাহা এখন তাঁহার সম্মুখে। এই সব বলাতে তাঁহার মন খুবই প্রফুল্ল হইল। মন্দিরে বসিয়া মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করিলাম। ইহা সকলেরই করা উচিত। শক্তি অনুসারে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করাকেই স্তব বা স্তুতি বলে। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান ভাবগ্রাহী তিনি যে আড়ম্বর ভালবাসেন না।

উদক কুণ্ডের নিকট অপর একটী কুণ্ডের উপর সত্যনারায়ণের একটী ছোট মন্দির আছে। এখানে পূজারী মন্ত্র পাঠ করাইলেন আমরা মন্ত্র পড়িয়া গরুর ন্যায় মুখ দিয়া কুণ্ড হইতে চুমুক দিয়া জল পান করিলাম। ইহাতে নাকি মাতৃ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ হয়! মুক্তিলাভ হইয়াছি কিনা জানি না, আমার বিশ্বাস তাহা কখনও হইতে পারে না। আমার মাতৃঠাকুরাণী ত কাছেই ছিলেন। তিনি বলিতে পারেন ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি কি না। নবদেবী বা নবদুর্গার ও একটী ছোট মন্দির আছে।

আজ কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করানের জন্য ধর্ম্মশালা হইতে চাউল, ডাইল, ঘৃত, শুষ্ক তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পাণ্ডাঠাকুরকে দিয়া মন্দিরে

পাঠাইয়া দিলাম। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথকে নিবেদন করিয়া পরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভাগও পাণ্ডাঠাকুর নিয়া আসিলেন। মাতাঠাকুরাণী, শান্তি, সাধুজী ও আমি এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলাম। রাত্রিতে পুরী ও শাক। প্রমথ বাবুও কয়েক জন ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে পুরী, তরকারী, মিঠাই ইত্যাদি ভোজন করাইলেন।

ধর্ম্মশালার স্বামীজীর নিকট বসিয়া কেদার মাহাত্ম্য পাঠ শুনিলাম। পুস্তক খানা হিন্দি ভাষাতে লিখা এবং একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ। রেতঃকুণ্ডের অপার মহিমা, এই অধ্যায় অনেক সময় বসিয়া শ্রবণ করিলাম। তাঁহার ছোট প্রকোষ্ঠ খানাতে সর্ব্বদাই ধূনা জ্বলিতেছে আর উহার ভিতরের প্রকোষ্ঠে ধর্ম্মশালার জিনিষ পত্র আছে অর্থাৎ উহা একখানা গুদাম ঘর। এখানে স্তূপাকারে কম্বল ও বিবিধ জিনিষ পত্র মজুত আছে। স্বামীজীর সরলতাপূর্ণ হাসি মুখ খানা এখনও মনে পড়ে। তাঁহার নিকট হইতে কালীকম্বলী বাবার ফটো সংগ্রহ করিলাম

আজ কয়েক খানা পত্র লিখিয়া ডাকে দিলাম। এখানকার পূজারীরা দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কেদারনাথের রাওল সাহেবের অধীনে কাজ করেন এবং বেতনভোগী। সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে মিলিয়া আরতি দেখিয়া আসিলাম। এখানে সকালে ৮টার পূর্ব্বে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না।

কেদারনাথের মন্দিরের উত্তর ধারে যে বিশাল তুষার ক্ষেত্র দণ্ডায়মান তাহা বাস্তবিকই রজতগিরিনিভং। দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। মধ্যে মধ্যে যখন রৌদ্র হইত তখন কেদারের দৃশ্য কি চমৎকার তাহা বর্ণনাতীত। চতুর্দ্দিকে তুষার মণ্ডিত আকাশভেদী পর্ব্বত-মালার মধ্যে এই নির্জ্জন প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে একখানা মন্দির দণ্ডায়মান।

কেদারনাথ সাধারণতঃ সাধুদিগের তীর্থ। পরিব্রাজকাচার্য্য

শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য বদরিনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এস্থানে আগমন করেন এবং ৩২ বৎসর বয়ক্রমে দেহত্যাগ করিয়া কৈলাশ গমন পূর্ব্বক পূর্ণ শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। এই কারণে এই স্থান সন্ন্যাসীদের পক্ষে অত্যন্ত শুভ।

কেদার নাথের মন্দির বৈশাখ মাসে কোনও শুভ মুহূর্ত্তে খোলা হয় এবং কার্ত্তিক মাসে দীপান্বিতার দিন বন্ধ হয়। এই ভাবে প্রায় ছয় মাস কাল খোলা থাকে। শীতের সময় সাজ সরঞ্জাম সহিত পূজারীরা উখী-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় কেদারনাথের পূজা হইয়া থাকে। শীতের সময় সকল বাড়ীগুলি বরফের মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত ভাবে থাকে।

বারদীর বিখ্যাত ৺লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই কেদারে ক্রমান্বয়ে ৩ বৎসর বাস করিয়া শীত সহ্য করিবার জন্য গায়ের চামড়াকে উপযোগী করিয়া পরে উত্তর মুখের পর্ব্বতে যাত্রা করেন। ক্রমাগত শীত প্রধান স্থানে তুষারের মধ্যে বাস করিয়া গায়ের চর্ম্মের উপর অন্য এক প্রকার শ্বেতবর্ণ চর্ম্মচ্ছদ সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাতে আর তাঁহাদের (লোকনাথ, বেণীমাধব ও হিতলাল বা ত্রৈলঙ্গ স্বামী) শীতের সময় কোনও প্রকার কাপড় ব্যবহার করার দরকার হইত না। তখন এই তিনজন মহাপুরুষ সর্ব্বতোভাবে উলঙ্গ থাকিতেন এবং শীতের জন্য কখনও কষ্ট ভোগ করেন নাই। (সিদ্ধ জীবনী ১৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৯ দিবস, ১৫ই আষাঢ়—

সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মশালার খাতায় কিছু লিখিয়া দিলাম এবং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দান করিলাম। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথকে মনপ্রাণ ভরিয়া দর্শন, স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া আসিলাম। তখনও দরজা খোলে

নাই। পূজারীকে ডাকিয়া পূর্ব্বধারের দ্বার দিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বে গিয়াছিলেন তিনি পূজারীর সাক্ষাৎ না পাইয়া আর দর্শন করিতে পারেন নাই। বাহির হইতেই কেদারনাথকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন। পাণ্ডা সুফল দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি এক প্রকার শুষ্ক পদ্মফুল দিলেন তাহা হিমালয়ের মধ্যে কোন কোন স্থানে জন্মে। আমরা সকলেই পুরী ও মিষ্ট আহার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তৈয়ার হইলাম। প্রমথবাবুও তাহাই করিলেন। যাত্রা করার পূর্ব্বে রেতকুণ্ড দর্শন ও তাহাতে আচমন করিয়া আসিলাম।

রওনা হইব এমন সময় দেখিলাম একজন পাঞ্জাবী সাধু ধর্ম্মশালার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া ভিক্ষা বাঞ্ছা করিলেন। এই সাধুটী কথা বলিতে পারেন কিন্তু কাহারও সহিত দুই একটী কথা ব্যতীত অধিক বাক্যব্যয় করেন না। তাঁহাকে কিছু পয়সা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি অস্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন পয়সা নিবেন না। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় একবেলা মাত্র সদাব্রতের নির্দ্দেশ আছে। আমি তাঁহাকে আটা, ডাইল, ঘৃত, কাষ্ঠ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিলাম। এই সাধুটীর সহিত পরে বদরিকাশ্রমে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইভাবে ভিক্ষা করিতে করিতে তিনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি গঙ্গোত্তরী হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ধন্য ধর্ম্মের পিপাসা এবং নিঃসম্বল পর্য্যটন। তাঁহার সহিত মাত্র একখানা কম্বল ও একটী কমণ্ডলু।

এই পুরীতে তিন রাত্রি বাস করিতে হয়। এখানে আমরা দুই রাত্রি বাস করিলাম এবং আরাম চটি ও গৌরী কুণ্ড সহ চার রাত্রি বাস করা হইয়াছে।

বেলা ১১টার সময় যাত্রা করিয়া মন্দাকিনীর সেতুর নিকট আসিয়া মন্দাকিনীতে পুনবায় আচমন করিলাম। আজ ভোর হইতেই রৌদ্র উঠিয়াছে। দেখিলাম অনেক লোক মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছেন। পাণ্ডা ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং মন্দাকিনীর সেতু পার হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কেদারনাথ হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম একদল ছাগল মাল বহন করিতেছে। ছোট ছোট থলিয়া ছাগলের পৃষ্ঠে উভয় ধারে ঝুলান রহিয়াছে। প্রত্যেক মেষ প্রায় ১০ সের ও প্রত্যেক ছাগল প্রায় ১২ সের মাল বহন করিতে পারে। বদরিকাশ্রমের রাস্তায়ও এই প্রকার মাল বহন করিয়া থাকে। তাহারা তিব্বত পর্য্যন্ত বাণিজ্য করে।

মন্দাকিনী পার হইয়া একটী বিস্তৃত সমতল স্থানের মধ্য দিয়া রাস্তা। এখান হইতে কেদার নাথের মন্দির অতি চমৎকার দেখা যায়। তুষারের একটী খাড়া গগণস্পর্শী পাহাড়ের পাদদেশে একটী সমতল স্থানের মধ্যে মন্দিরটী গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ভক্তিভাবে কেদারনাথকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম। শান্তিকেও প্রণাম করাইলাম।

বেলা ১২॥টার সময় রামবাড়া চটিতে উপস্থিত হইতে না হইতেই বৃষ্টি আসিল। এখানে একখানা চটিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রমথবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ পরে আসিলেন তাঁহারা ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইলে রওনা হইলাম এবং আরামচটি আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। গৌরীকুণ্ডের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময় কৃষ্ণা বলিল যে তাঁহার জুতা জোড়া জঙ্গল চটিতে ফেলিয়া আসিয়াছে আমি তাহাকে বলিলাম আমাদিগকে গৌরীকুণ্ড পৌঁছাইয়া আরামচটিতে যাইয়া তাহার জুতা নিয়া আসিতে, কিন্তু সে স্বীকৃত হইলনা। পরে যখন প্রমথবাবুর কুলিয়া আসিল তখন

জঙ্গল চটিতে কৃষ্ণার জুতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহারা উঠাইয়া আনিল।

আমরা গৌরীকুণ্ডে অপরাহ্ন ৪৷৷টার সময় পৌঁছছিলাম। আসিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণীর রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে, তিনি অনেক পূর্ব্বেই ঝাঁপানে এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রমথবাবুর স্ত্রী আজ রামবাড়া হইতে এখানে আসিবার সময় রাস্তাতে পাঁথরে পা লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছেন, মুখে ও পায় আঘাত পাইয়াছেন, ঠোঁট ফুলিয়াছে। তাঁহার একজন কুলি ঝাঁপানওয়ালাদের মধ্যে ও ব্যারাম হইয়াছে, একজনের পায় ব্যথা ও অপর একজনের স্কন্ধদেশে ফুলিয়াছে ও বেদনা হইয়াছে। একজন কুলির অসুখ হওয়াতে প্রমথবাবু গৌরীকুণ্ড হইতে রামপুর পর্য্যন্ত অন্য একজন লোক অধিক মজুরী দিয়া ঠিক করিলেন। এই কুলির ব্যয় ঐ ব্যারামী কুলির ভাড়া হইতে বাদ যাইবে।

২০ দিবস, ১৬ আষাঢ়—

ভোর ৭টার সময় রওনা হইয়া ৮টার সময় উংরাইএর রাস্তায় শোনক প্রয়াগের লোহনির্ম্মিত সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু জলযোগ করিলাম। পরে সেতু পার হইয়া ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তার চড়াই উঠিতে লাগিলাম। প্রথমেই ঠিক খাড়া চড়াই ও জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে কম চড়াই, এইভাবে ১৷৷৹ মাইল রাস্তা খুব খারাপ ইহার পর সমতল স্থানের মধ্যে একটি ছোট গ্রাম এবং আশে পাশে বিস্তর ভাঁটার চাষ। শান্তি এই ১৷৷৹ মাইল চড়াই হাটিয়া উঠিল। আমরা ঢেকি, বেঁথো, ও

ডাঁটা শাক উঠাইলাম। রাস্তার কিনারে অনেক জন্মিয়াছে। শান্তিও আমাদের সহিত অনেক শাক উঠাইল। এই গ্রামের নিকট দিয়া একটি রাস্তা রামপুর চটির দিকে গিয়াছে। এখান হইতে আবার চড়াইএর রাস্তায় শাকম্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পূজারীর একখানা মাত্র ঘর আছে। যাত্রীদের থাকিবার স্থান নাই এবং কোন দোকানও নাই। দেবীর মন্দিরের নিকট একখণ্ড বস্ত্রের টুক্‌রা উপহার দিতে হয়। চণ্ডীতে শাকম্বরীর উল্লেখ আছে—দুর্গার রূপান্তর। পূজারী ঠাকুর বলিলেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই মন্দিরটী উঠাইয়া দিয়াছেন। সুদূর হিমালয়ের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। এখান হইতে সমতল ও অল্প চড়াইএর রাস্তা দিয়া ১॥ মাইল দূরবর্ত্তী ত্রিযুগীনারায়ণে উপস্থিত হইলাম।

ত্রিযুগী নারায়ণ

ইহা একটী বড় গ্রাম। এখানে কয়েখানা দোকান ও যাত্রিদের বাসস্থানের জন্য ঘর আছে। কালীকম্বলী বাবার একখানা বৃহৎ দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। দূর হইতে মন্দির দেখা যায় না। গ্রামের একপ্রান্তে একটী নিম্নস্থানে নারায়ণের মন্দির। এখানে নারায়ণের পূজা বারমাসই হইয়া থাকে। মন্দিরটী কেদারনাথের মন্দিরের ন্যায়। মন্দিরের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড, পশ্চিমে রুদ্রকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড আছে। মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুগঙ্গা বাহির হইয়া এই সব কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেব ও পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী। মন্দিরের বাহিরে জগমোহনের

মধ্যে দিবারাত্রি ধুনী জ্বলিতেছে। পাণ্ডারা বলেন এই অগ্নি তিনযুগ যাবৎ প্রজ্বলিত রহিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের গিরিরাজের কন্যা গৌরীর সহিত বিবাহের সময় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যে হোমাগ্নি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আর নির্ব্বাপিত হয় নাই। পাণ্ডা ও অন্যান্য লোকেরা দিবারাত্রি এই কুণ্ডে কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। যাত্রীরাও কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া ধুনীতে নিক্ষেপ করেন। আমরা সকলেই কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া এখানে নিক্ষেপ করিয়াছি। কুণ্ডের ভস্ম ত্রিযুগীনারায়ণের প্রসাদ। সকলেই সাগ্রহে এই ভস্ম কপালে লেপন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ধন্য মনে করেন। বাহিরে কতকগুলি ছোট ছোট প্রস্তরের মন্দির ও দেব মূর্ত্তি আছে। আমরা দেখিলাম পার্ব্বত্য কুলিরা অন্যস্থান হইতে পাথর আনিয়া জমা করিতেছে, এইসব পুরাতন মন্দিরগুলির জীর্ণ সংস্কার হইবে। মন্দিরের বাহিরে যে সব কুণ্ড আছে তাহাতে অনেক সাপ আছে, কিন্তু তাহাদের বিষ নাই। পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যদি এই সব সাপ স্পর্শ করা যায় তবে অনেক মঙ্গল হয়। আমরা রুদ্রকুণ্ডে একটী দুই হস্ত লম্বা মাটির ন্যায় রং বিশিষ্ট সাপ দেখিয়াছিলাম। প্রমথবাবুর ছোট শালী তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন কিন্তু সাপটা ভ্রূক্ষেপও করিলনা। আমরা ক্রমান্বয়ে দুইটী কুণ্ডে স্নান করিয়া, তর্পণ ও পার্ব্বণের অধম অনুকল্প ভোজ্য দান করিলাম। অবশ্য এই সব ভোজ্য পাণ্ডা ঠাকুরই পাইলেন। এখানকার পাণ্ডারা এই গ্রামেই থাকেন। এই মন্দির কেদারনাথের রাওল সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। এখান হইতে একটী রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া বুড়া কেদার হইয়া গঙ্গোত্তরীর রাস্তার ভাটোয়ারী নামক স্থানে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম অত্যন্ত চড়াই ও উৎরাই করিতে হয় এবং নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে ভাটোয়ারী ৬৭ মাইল ব্যবধান।

ত্রিযুগীনারায়ণে অনেক ডাঁটা ও গোল আলুর চাষ দেখিলাম। ডাঁটার বীজের আটা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় লোকেরা আহার করে। নারায়ণের ভোগের জন্য আমরা ১।০ করিয়া পূজারীকে দিলাম। সন্ধ্যার সময় আরতি দেখিলাম। দিনের বেলা চটির ঘরে আমরা মধ্যাহ্নকৃত সম্পাদন করিয়াছিলাম এবং বিকালে আমরা আমাদের তল্‌পিতল্‌পা নিয়া ধর্ম্মশালার দ্বিতলে আশ্রয় নিলাম। এখানে একবাতি লণ্ঠনের কেরাসিন তৈলের দাম আট আনা। আমাদের বিছানা পত্র নিয়া কুলিরা রামপুর চটিতে চলিয়া গিয়াছে। আজ আর আমাদের এখান হইতে যাওয়ার ইচ্ছা নাই। ধর্ম্মশালা হইতে আমরা সতরঞ্চি ও কম্বল নিলাম তাহাই আমাদের যথেষ্ট হইল। অন্যান্য ধর্ম্মশালার ন্যায় এখানে স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নাই। আমাদের পাণ্ডার ভ্রাতা ধর্ম্মশালা তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন এখানে এত অধিক যাত্রী আসে যে অল্প কম্বল থাকাতে সকলের সঙ্কুলন হয় না। আমি ও প্রমথবাবু এই জন্য হৃষীকেষের হেড আফিসে পত্র লিখিয়া দিলাম। রাত্রিতে আমাদের পাণ্ডা হংসরাম দাতারাম ভস্ম প্রসাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ত্রিযুগীনারায়ণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

২১ দিবস, ১৭ আষাঢ়

ভোর ৬।০ টার সময় এখানে নারায়ণ দর্শন করিয়া যাত্রা করিলাম। এখান হইতে দূরে কেদার নাথের পর্ব্বত দেখাইতেছিল স্থানটী মনোরম। গ্রামের মধ্যে জলের পাইপ আছে। উৎরাই এর রাস্তায় আমরা শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। বাদলপুর চটিতে ১০॥০ টার সময় পৌছিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিলাম। এখানে জলের পাইপ আছে। দোকানদারের নিকট হইতে আমরা জিনিষ পত্রের বস্তাটা নিলাম। বস্তা

ঠিক ভাবেই আছে। কোনও জিনিষ অপহৃত হয় নাই। প্রমথ বাবু ভিন্ন ঘরে আহারাদি করিলেন। কাটা চটিতে একটা দোকানে আমার টুপিটা রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহা চাহিয়া নিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুর্গা চটিতে পৌঁছছিলাম।

আমরা সন্ধার সময় আরতি দেখিতে মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরে যাইতেছি এমন সময় প্রমথ বাবুর মাতা সাধুজীকে বলিলেন "রজনী আমাদের জিনিষ গুলি দেখ"। ইহাতে আমার সাধুজী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। প্রমথ বাবুর মাতা ভাবিয়াছিলেন "রজনীর" আর আরতি দর্শন করার দরকার নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি কৃষ্ণাকে ডাকিয়া দিতেছি সেই জিনিষ পত্র দেখিবে আপনি চলুন কিন্তু তিনি আর আসিলেন না। জিনিষ পত্রের পাহাড়ায় থাকিলেন!

সন্ধার সময় দুইটী ব্রাহ্মণ বালক কেদার মাহাত্ম্য সুললিত স্বরে পাঠ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন পর্ব্বতোপরি আমদাপি মহাদেবের পূজারীর কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ছেলেটী আমাদিগকে তথায় যাইতে বলিলেন কিন্তু আমাদের আর তথায় যাওয়া হইল না। আমদাপি মহাদেবের পূজার জন্য আমরা কিছু দক্ষিণা দান করিলাম। রাত্রিতে চণ্ডীর কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া প্রমথ বাবুকে বই খানা দিলাম তিনি অনেক সময় পাঠ করিলেন।

---

২২ দিবস, ১৮ আষাঢ়

কালী মঠ

ভোরে দুর্গা চটি পরিত্যাগ করিয়া বিউ চটিতে আসিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় দেখিলাম অপর একজন যাত্রীর সহিত

এখানকার দোকানদার মাধোরাম ঝগড়া করিতেছে। অপর একজন দোকানদার বলিল যে এই লোকটা বড়ই ধূর্ত্ত ও যাত্রীদের সহিত অসং-ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রমথ বাবুর ও আমার ইচ্ছা ছিল উখী মঠের পুলিশের নিকট এই দোকানদারের বিষয় বলিয়া যাইব কিন্তু পরে আর তাহা হইয়া উঠে নাই। উখী মঠে যাইয়া এই বিষয়টা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং পুলিশের ফাঁরি ও উখী মঠ হইতে অনেকটা দূরে। তলা বিঁউ চটিতে একখানা লোহার দোকানও আছে। কেদার যাওয়ার সময় আর এই দোকান খানা আমাদের চোখে পড়ে নাই, সেই সময় বৃষ্টি হইতেছিল এবং আমাদের মাথার ছাতা থাকাতে ডানে ও বামে বড় একটা দৃষ্টি পড়ে নাই।

যে যাত্রীর সহিত দোকানদারের ঝগড়া হইয়াছে তিনি পশ্চিম দেশীয় লোক এবং বয়স প্রায় ৫৫ হইবে, তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্র ও পুত্র বধূ আছেন।

ঝাঁপানওয়ালারা কালী মঠ যাইতে অস্বীকার করাতে তাহাদের সহিত আমাদের ঝগড়া হইল পরে টাকার প্রলোভনে তাহারা রাজী হওয়াতে আমরা কালী মঠ রওনা হইলাম। বিউ চটি হইতে এক মাইল চড়াইএর রাস্তার পর রাস্তা ছাড়িয়া একটী পাকদণ্ডী পথে এক মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়া উৎরাই নামিয়া মন্দাকিনীর কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর নিকট আসিলাম। এই সেতুটী ভগ্ন অবস্থায় আছে, কখন পড়িয়া যায় তাহার ঠিক নাই। আমরা একজন একজন করিয়া অতি সন্তর্পনে পার হইলাম। পার হইয়া সকলেই কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম, কেহ কেহ স্নান করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া নিলেন।

এই সেতু হইতে অর্দ্ধ মাইল কঠিন চড়াই, রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য, আর বৃষ্টি হইলে ত কথাই নাই। এই চড়াই হইতে আবার প্রায় তিন পোয়া মাইল

ব্যবধান একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট দিয়া সামান্য উৎরাইএর রাস্তার পর কালী মঠ। কালী মঠ একটী সমতল স্থানে কালী গঙ্গা নাম্নী নদীর তীরে অবস্থিত, অপর পারে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। নদী পার হওয়ার জন্য দড়ির ঝোলান সেতু আছে। আমরা শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর দ্বিতল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নীচের তলায় আমাদের রান্নার জোগাড় হইল। প্রমথ বাবু অন্য একটী পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে রান্নার বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা ধর্ম্মশালার ছোট বারেন্দায় টোপলা টুপলী খুলিলাম। উপর তলায় দুই খানা ঘর তাহা বন্ধ, নীচের তলায় একজন ব্রহ্মচারী থাকেন। তিনি আমাদিগকে কিছু কাষ্ঠ দিলেন তাহাতেই রান্না হইল নচেৎ এখানে কাষ্ঠ ও পাওয়া যাইত না। দেবী দত্ত বেদপাঠী এই ধর্ম্মশালার উত্তরাধিকারী, তিনি হৃষীকেশ থাকেন। এখানে অপর ৮ খানা জীর্ণ [illegible] আছে তাহা ভদ্র লোকের বাসের অযোগ্য। এখানে কোনও দোকান নাই। যে সব যাত্রী এখানে আসেন তাঁহারা খাবার সঙ্গে নিয়া আসেন নচেৎ উপবাস থাকিতে হয়। আমাদের খাবার জিনিষ সঙ্গে ছিল কিন্তু ঝাঁপান ওয়ালাদের আটা সংগ্রহ করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইল। আমাদের সঙ্গে যাহা ছিল তাহা দিলাম কিন্তু তাহাতে তাহাদের কুলাইবে কেন? নদীর ধারে স্রোতের বেগে গম ভাঙ্গিতে ছিল তথায় যাইয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মন প্রতি অর্দ্ধ সের হিসাবে আটা ক্রয় করিয়া কুলিদের দিলাম।

আমরা স্নান তর্পণ করিয়া দেব দর্শন করিতে চ'ললাম। মন্দিরে নানা দেবতা আছেন এবং জগমোহনে একটী কুণ্ডে ধুনী জ্বলিতেছে। পূজারী ঠাকুর বলিলেন তিন যুগ যাবৎ এখানে এই ধুনী জ্বলিতেছে, কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আমরা কপালে ভস্ম লেপন করিলাম এবং কিছু সঙ্গে করিয়া আনিলাম। অপর একখানা মন্দিরে প্রস্তরের কালী মূর্ত্তি। আরও ২।৩ খানা

ছোট ছোট মন্দির আছে তাহা জীর্ণ অবস্থায় আছে। ভৈরবের মন্দিরে ছাগ, মহিষ বলি হইয়া থাকে। কতকগুলি শৃঙ্গ বাহিরে ঝুলান আছে।

প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একখানা ছোট ঘর তথায় দেবীর পীঠ এখানে যন্ত্র আছে, তাহা একখানা তামার আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে ঢাকুনি সড়াইয়া পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানটী অত্যন্ত মনোরম, চারিধারেই পর্ব্বতমালা, সাধুজী বলিলেন তপস্যার উপযুক্ত স্থান, আমার মনেও তাহাই হইল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যাত্রীরা এ রাস্তায় বড় একটা আসেন না। কালীগঙ্গার অপর পারে পর্ব্বতের উচ্চশিখর দেশে কালী শিলা আছেন। প্রবাদ তথায় চণ্ডমুণ্ড বধ হইয়াছিল।

মধ্যমহেশ্বর

মধ্যমহেশ্বর পঞ্চ কেদারের এক কেদার। যাত্রীরা এখানে প্রায় কেহই যান না, রাস্তা ভয়ানক কঠিন, কালীমঠ হইয়া যাইতে হয়। তাঁহারও কেদারের ন্যায় ছয় মাস পূজা হইয়া থাকে বাকি ছয় মাস শীতের সময় উখী মঠে হইয়া থাকে। সেই সময় মধ্য মহেশ্বরের রৌপ্যানির্ম্মিত মূর্ত্তিটী ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী উখী মঠে আনিত হইয়া থাকে কেবল প্রস্তরের লিঙ্গটী তথায় থাকে। এই মন্দির চৌখাম্বা নামক পর্ব্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। এই পর্ব্বত সমুদ্রবক্ষ হইতে ২২০০০ হইতে ২৩০০০ ফিট উচ্চ। উখী মঠের রাজপুতেরা তাহাদের প্রথমা কন্যাগুলিকে মধ্যমহেশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া দেন। এই কন্যাগুলি পরে পূজারীদের উপপত্নী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত কুপ্রথা এবং যাহাতে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তাহাই করা উচিৎ।

আমরা আহারান্তে অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া পূর্ব্ব রাস্তায় মন্দাকিনীর সেতু পার হইয়া অন্য এক জঙ্গল রাস্তায় এক বিস্তৃত উপত্যকার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এত বড় উপত্যকা আর কোথাও দেখি নাই, এখানে ধান্য ও কায়নের চাষ এবং এই মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা, মধ্যে মধ্যে বিস্তর কচুর গাছ, আমরা কিছু কচু শাক উঠাইয়া নিলাম। সন্ধ্যার সময় নালা চটিতে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে একটী রাস্তা গুপ্তকাশী এবং অন্যটী উখী মঠ গিয়াছে। গ্রামের মধ্যেই চটি।

নালা চটি—আমরা যে ঘরে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় নিলাম তাহার সম্মুখে গ্রামবাসীদের ঘর এবং অনেক তরী তরকারীর গাছ দেখিলাম, ছিম, বেগুণ কাচামরিচ ইত্যাদি। স্থানটী সমতল, এখানে আসিয়া সুদূর বঙ্গদেশের শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল। একজন লোক তামার পাতে ত্রিযুগীনারায়ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করিতেছে, পয়সায় একখানা। আমি কয়েকখানা ক্রয় করিলাম। রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী খিচুরী পাক করিয়া দিলেন তাহাই আহার করিয়া শয়ন করিলাম। এখানে ললিতাদেবীর ও মহাদেবের মন্দির আছে। অনেক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার যে দুই জন কুলি আছে তাহারা উখী মঠের ওধারে আর যাইবেনা, তাই রাস্তাতে কুলি তালাস করিতেছি। একজন এই চটিতে পাইলাম তাহার বাড়ী গঙ্গোত্তরীর দিকে। তাহার সহিত চটিওয়ালাকে দিয়া লিখাপড়া করাইলাম। মেহেলচৌরী পর্য্যন্ত ৩০৲ টাকা মণ হিসাবে ঠিক হইল।

———

উখী মঠ

২৩ দিবস, ১৯ আষাঢ়—

সকালে রওনা হইয়া উৎরাইএর রাস্তায় মন্দাকিনীর লৌহনির্ম্মিত সেতু পার হইয়া বেলা ৯টার সময় উখী মঠে পৌছিলাম। রাস্তাতে অনেক ঢেকীর শাক উঠাইলাম। কয়েকদিন যাবৎ ডাল আর শাক অন্ন আহার করিতেছি। আলু কোথাও পাওয়া যায় না।

মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া এক মাইল চড়াই উঠিতে হয় পরে উখী মঠ। আমরা যে ঘরে আশ্রয় নিলাম তাহা পূর্ব্বে ধর্ম্মশালা ছিল কিন্তু এখন তাহা এখানকার পোষ্টমাষ্টারের অধীন, তিনি এই ঘরটী খরিদ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার দোকান আছে, আমরা তথায় জিনিষপত্র ক্রয় করিলাম। প্রমথবাবু অন্য দোকান হইতে জিনিষ আনিতে যাইয়া তাঁহার সহিত কিছু বচসাও হইল। যাহার ঘরে থাকিতে হইবে তাহার নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হইবে, নচেৎ থাকিতে দেয় না। এখানে ৮।১০ খানা দোকান এবং ঝরণার জলের একটী বাঁধান কুণ্ড আছে। উখী মঠের অধিবাসীরা সেখান হইতেই জল নিয়া থাকে। এখানে পৌছিয়া ঝাঁপানওয়ালা ও কুলিদের বিদায় করিয়া দিলাম। আমরা স্নানান্তে দেবতা দর্শনে চলিলাম।

উখী মঠে রাওল সাহেবের হেড্ কোয়ারটার। তিনি এখানে ও গুপ্তকাশী উভয় স্থানেই থাকেন। উখী মঠ, গুপ্তকাশী, কালী মঠ, মধ্যমহেশ্বর, ত্রিযুগীনারায়ণ ও কেদার প্রভৃতির উপর রাওল সাহেবের আধিপত্য আছে।

আমরা একটী বৃহৎ তোরণের ভিতর দিয়া মঠ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। এই তোরণের উপর লাল ও কাল রঙের কাষ্ঠনির্ম্মিত

হাতীওয়ালা কার্নিশ। তোরণ পার হইয়া একটী প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যাত্রীদের থাকিবার ঘর এবং মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে ওঁকারনাথ শিবলিঙ্গই প্রধান দেবতা, তা ছাড়া আরও অনেক দেবতা আছেন। ওঁকারনাথ মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে মান্ধাতা মহারাজের প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে একটী ছোট কুঠরীতে অনিরুদ্ধ ও উষার মূর্ত্তি। একস্থানে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মূর্ত্তি আছে। অন্যদিকে একটী বড় প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ এবং অপরস্থানে অনিরুদ্ধ, উষা, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রাদ্যুম্ন, চিত্রলেখা, গঙ্গা, পঞ্চ কেদার প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এস্থানে মান্ধাতা তপস্যা করিয়াছিলেন। উষা অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং বাণ রাজার কন্যা। তিনি এস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম উখী মঠ হইয়াছে। নবদুর্গা ও নবদেবীর ও মূর্ত্তি আছে। প্রাঙ্গণের একধারের একটী ঘরের মধ্য দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তায় রাওল সাহেবের গদি আছে। এখানে কেদারনাথের এক মূর্ত্তি আছেন। শীতের ছয় মাস এখানেই পূজা হইয়া থাকে। রাওল সাহেবের বাড়ীটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত এবং অনেক প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মন্দিরের কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে যত্নের সহিত সকলস্থান দেখাইলেন।

মঠের বাহিরে একটী প্রাঙ্গণের মধ্যে ১০।১২টী প্রাচীন সমাধি মন্দির আছে। এইগুলি অনেক পূর্ব্বেকার রাওল সাহেবদিগের সমাধি। এই সমাধিস্থানের নিকটে হাস্পাতাল তথায় একজন সব এসিষ্টেণ্ট সারজন ও একজন কম্পাউণ্ডার থাকেন। প্রমথবাবু সাধুজী, শান্তি ও আমি বিকালে হাস্পাতাল দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, ডাক্তারের সহিত দেখা হইল না তিনি গুপ্তকাশী রোগী দেখিতে গিয়াছেন। কম্পাউণ্ডার আমাদিগকে অনেক খাতির যত্ন করিলেন। তৈল রাখিবার জন্য আমি

একটা শিশি চাহিয়া আনিলাম। এখানে গ্রাম্য ডাকঘর ও পুলিশ ফাঁড়ি আছে। উখী মঠ হইতে গুপ্তকাশী প্রভৃতি স্থান সমুহের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম।

এখান হইতে ৬ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে "দিউরীতাল" নামক একটী হ্রদ আছে। বদরীনাথ হইতে উখী মঠ পর্য্যন্ত যে পর্ব্বতের আড়াল আছে তাহার উপর সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই হ্রদের পরিধি ৮০০ গজ, ইহা প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থ। হ্রদের কোনও অংশ অগভীর নহে, তবে উত্তর দিক অত্যন্ত গভীর। তুষার মণ্ডিত কেদার ও বদরীনাথের পর্ব্বতমালা এই হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়। হ্রদ হইতে বদরীনাথের পর্ব্বত ১৫ মাইল দূর হইবে। এস্থানের দৃশ্য এপ্রকাব মহান যে হিমালয়ের মধ্যে আর কোথায় এমনটি নাই।

বিকালে বৃষ্টি হইতেছে। কুলির জন্য অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু পাওয়া যাইতেছেনা। এখানে একজন পাবনা জিলার বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হইল ইহার নাম ক্ষিরোদা। ইহার সঙ্গে একটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক আছে, সে এখন এখানকার হাস্পাতালে, তাহার পায় ঘা হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে—তাহাকে দেখিয়া বড়ই কষ্টবোধ হইল।

পার্ব্বত্য রাস্তায় খালি পায় চলিতে চলিতে পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এই দুইটী স্ত্রীলোক অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছে, এখন তাহারা কেদারনাথ দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমের দিকে যাইতেছে। যেখানে সদাব্রত আছে তথায় ভিক্ষা করিয়া থাকে। হাস্পাতালে আমরা যখন ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে গেলাম তখন আমাদিগকে দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আমরা তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া তাহার নিকট

বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিলাম। তাহার সহিত আর এজীবনে দেখা হইবেনা, এখন সে জীবিত আছে কি না জানিনা। আর ক্ষীরোদা আমাদের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রমথবাবুর সহিত নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল পরে সে তাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ক্ষিরোদা প্রমথবাবুদের বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া দিত এবং তাঁহারই খরচে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল তিনি মনে করিয়াছিলেন তাহাকে "ঝি" করিয়া রাখিবেন কিন্তু তাহা আর পারেন নাই। তিনি পরে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "শ্রীমতী ক্ষিরোদা গত ত্রয়োদশীর দিন এখান হইতে তাহার ভ্রাতার বাড়া পাবনা জিলায় চাটমহর গ্রামে গিয়াছে, আর আসিবে বলিয়া বোধ হয় না, অযথা আমার কতকগুলি টাকা ব্যয় হইল।"

সন্ধার সময় পুনরায় এখানকার চৌধুরীর নিকট যাইয়া মেহেন্দচৌরী পর্য্যন্ত ৩২৲ টাকায় ত্রিশ সের হিসাবে একজন কুলি ঠিক করিয়া লিখা পড়া করিলাম। ছাপান ফরমে লিখা পড়া হইল। চৌধুরী ইহার বাবদে আমার নিকট হইতে ৵০ আনা ও কুলির নিকট হইতে ৵০ আনা পাইল।

২৪ দিবস, ২০ আষাঢ়—

প্রত্যুষে রওনা হইয়া চড়াইয়ের রাস্তায় কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখি একখানা ছোট রকমের পাকা ঘর। শুনিলাম ইহা পুলিশের ফাঁড়ি। এখান হইতে অল্প অল্প চড়াই এবং পথিপার্শ্বে গ্রাম। গ্রাম-বাসীদের নিকট আমরা কাঁচকলা ও মোচা ক্রয় করিতে চাহিলাম কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিক্রয় করিলে না। প্রমথ বাবু তাঁহার ভাঙ্গা লণ্ঠনটা মেরামত করিতে যাইয়া আমাদের পিছনে পড়িয়া গেলেন,

অনেক পড়ে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমার মাতাঠাকুরাণী প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত হাঁটিয়াই পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৬০ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে তবুও তাঁহার মনের জোর কমে নাই; নচেৎ তিনি এই কঠিন রাস্তায় কখনই হাঁটিতে পারিতেন না। শুধু কি হাঁটা, এই কঠিন পরিশ্রমের পর আবার চটিতে যাইয়া রান্না করিতে হয়। দিবসে তিনি একদিনও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর শয়ন করেন না। আহারে পর টোপ্‌লা টুপলী বাঁধিয়া আবার রওনা হই। ধন্য তাঁহার কঠোর পরিশ্রম এবং নারায়ণ দর্শনের জন্য মনের ব্যগ্রতা। তিনি আমার সঙ্গে না থাকিলে আমার হিমালয় ভ্রমণ সম্পূর্ণ হইত না এবং খাওয়া দাওয়ার জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। তিনি সঙ্গে থাকাতে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। বহু দিবস শাকভাত খাইয়াছি অন্য কোন তরকারী পাই নাই। সেই শাকভাতের কি অমৃত আস্বাদন তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না।

আমরা প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে সামান্য চড়াইর রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। একখানা চটি দেখিলাম ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহার পর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গণেশ চটির নিকটবর্ত্তী হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম একজন লোক আমাদিগকে দেখিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইলে সে লোকটী প্রণামী চড়াইতে বলিল এবং আমাদিগকে একটুকু চিনির সরবৎ চরণামৃত বলিয়া প্রসাদ দিল। আমি আর প্রণামী চড়াইলাম না আর সাধুজী ত নিঃস্বম্বল। তিনি পয়সা কোথায় পাইবেন?

গণেশ—চটিতে ২ খানা ঘর। একখানা খালি পড়িয়া আছে আর একখানাতে দোকান। গরম মহিষদুগ্ধ ক্রয় করিয়া আমরা পান

করিলাম। এখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামান্তে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কিছু সময় পর আমার বাহ্যের বেগ হইল। আমার সঙ্গের গ্লাসটীতে এক গ্লাস জল নিয়া কিছু দূরে একটা মোড়ের আড়ালে গিয়া বসিলাম। প্রমথ বাবু পিছনে আসিতে ছিলেন আমি কৃষ্ণকে বলিলাম এই রাস্তায় আর কাহাকেও আসিতে দিবে না। শৌচকার্য্যে এই এলুমিনিয়ামের গ্লাসটা ব্যবহার করিতে দেখিয়া প্রমথ বাবু বলিলেন "আপনার এই গ্লাসে আর জল খাইব না।" আমি বলিলাম "সাধুজী ত তাঁহার কমণ্ডলু সমস্ত কার্য্যেই ব্যবহার করেন তাহাতে কেন জল খান।" তিনি বলিলেন "পিতলের জিনিষে কোন দোষ নাই।" এই ভাবে আমরা পরমানন্দে রাস্তা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তাতে আমরা অনেক ঢেঁকির শাক উঠাইলাম এবং উৎরাই-এর রাস্তায় দুর্গা চটিতে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম।

দুর্গা—এখানে ৪।৫ খানা ঘর আছে। একজন দোকানদার। তাহার নিকট উৎকৃষ্ট মহিষ দধি ক্রয় করিলাম। চটির পার্শ্ব দিয়া আকাশগঙ্গা প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যাইতেছে। নদীর জল একটী নালা কাটিয়া চটির ঘরের ভিতর দিয়াই গিয়াছে। আমরা এই জলে স্নান ও রন্ধনাদি সমাপন করিলাম।

আকাশগঙ্গা তুঙ্গনাথের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে। অপরাহ্ন ৩টার সময় আবার রওনা হইলাম। আকাশগঙ্গার উপর দিয়া একখানা কাঠ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই সকলে পার হইয়া যান। আর একটা রশির ঝোলাও আছে। প্রমথ বাবু ও আমি এই রশির ঝোলা দিয়াই পার হইলাম। ইহার পরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ভীষণ খাড়া চড়াই। পরে আর চড়াই নাই। নিকটে গ্রাম।

বোদা—বোদা চটিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম সকলে বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা ঝরণার জল পান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম। এই চটির ১ মাইল পর হইতে আবার চড়াই আরম্ভ হইল। এইবার ভীষণ জঙ্গল, দিনের বেলাতেই অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা ভিজিতে ভিজিতে পোখিবাসা চটির একটা খালি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাদের প্রায় সমস্ত কাপড় চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর। তখনও বেলা আছে, বৃষ্টি বন্ধ হইল, আমরা আবার রওনা হইলাম। এইবার চড়াই ও ভীষণ জঙ্গল, এইভাবে ২ মাইল পর গোকুল চটি। রওনা হইবার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নিকটে আর কোথাও গ্রাম নাই আর কোন লোক জনের সহিত ও রাস্তায় দেখা হয় না। কুলিরা পিছনে পিছনে আসিতেছে। মাতাঠাকুরাণী, শান্তি, কৃষ্ণা, সাধুজী ও আমি এক সঙ্গে চলিতেছি। প্রমথ বাবুরা আমাদের প্রায় ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন।

গোকুল—আমরা যখন গোকুল চটিতে উপস্থিত হইলাম সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অন্ধকার রাত্রি। এই চটিতে ছোট ২ খানা মাত্র ঘর; একখানা ভাঙ্গা আর একখানাতে দোকানদার আছে, তাহার ঘরেও জল পড়ে। খড়ের চাল এবং পাথরের দেওয়াল। চটির ঘরের একধারে মহিষ থাকে ও ঘাসে পরিপূর্ণ। এখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম প্রমথ বাবুরা এখানে নাই, তাঁহারা চৌবাত্তা চটিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আর অগ্রসর হইতে পারি না। চতুর্দ্দিকে ভীষণ জঙ্গল এবং একটি শিশুছেলে সঙ্গে আছে। মাতাঠাকুরাণী এবং সাধুজীও আর অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন না। আমাদের

বিছানা প্রভৃতি অনেক ভিজিয়া গিয়াছে, সাধুজীর কাপড় কম্বল সমস্তই ভিজিয়াছে। তাঁহাকে আমাদের একখানা অর্দ্ধসিক্ত কম্বল দিলাম। দোকানদার বলিল সে পুরী তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। আমাদের অর্ডার পাইয়া সে পুরী তৈয়ার করিল, এক টাকা সের। সাধুজী ও আমি তাহাই আহার করিয়া শয়ন করিলাম। প্রমথ বাবুর একজন কুলি এই চটিতে পৌঁছিয়াই শুইয়া পড়িল। তাহার পেট অত্যন্ত ব্যাথা করিতেছে তাহাকে ঔষধ দিলাম কিন্তু তাহাতেও তাহার পীড়ার উপশম হইল না, সে প্রায় সমস্ত রাত্রিই গোঁ গোঁ করিয়া কাটাইল।

২৫ দিবস, ২১ আষাঢ়—

সকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি কুলিটা এখনও কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। সে বলিল যে আর চলিতে পারিবে না, তাহাকে আর কিছুতেই উঠান গেল না। এখন প্রমথ বাবুর জিনিষপত্রের গাটুরীটা কাহাকে দিয়া নিয়া যাই ইহাই আমরা ভাবনা করিতেছি, এমন সময় একজন লোক চটিতে আসিল, সে মহিষ চরায়। তাহাকে বলিলাম এই গাটুরীটা সামনের চটিতে পৌঁছাইয়া দিলে তাহাকে আট আনা পয়সা দিব, সে রাজী হইল। মাতাঠাকুরাণীকে আগেই রওনা করিয়া দিলাম। আমি জিনিষপত্র বাঁধিয়া রওনা হইলাম। এখান হইতে অর্দ্ধমাইল চড়াইএর পর পুন্নন চটি।

পুন্নন—আমরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ কুলিটা চটিতে মোট রাখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার মজুরী দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। সে বলিল চটিতে কোনও বাবু নাই। আমরা চটিতে পৌঁছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। এখানে কোন কুলি না পাওয়ায় সাধুজীই মালের জিম্মায় থাকিলেন। তিনি

অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার আর তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন হইল না। আক্ষেপ হওয়ার কথাও বটে। প্রমথ বাবু ত আর একটুকুও ভাবিলেন না। তিনি মনে করিয়াছেন যখন সাধুজী সঙ্গে আছেন তখন তাহার মাল আর হারাইবে না।

চৌবাত্তা—আমরা চটিতে উপস্থিত হইয়া কিছু জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় একজন কুলি পাইলাম। তাহাকে ভীমগোড়া পর্য্যন্ত তিন টাকায় চুক্তি করিয়া দিলাম। সে পুন্নন চটিতে যাইয়া মাল আনিবে এবং ভীমগোড়াতে পৌঁছাইয়া আমাদের অপেক্ষায় থাকিবে। আমরা তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিয়া ভীমগোড়াতে যাইব। তখন সে তাহার মজুরী পাইবে। আমাদের কুলিরাও ভীমগোড়াতে যাইয়া অপেক্ষা করিবে। চৌবাত্তা চটিতে অনেকগুলি ঘর আছে। তুঙ্গনাথ যাওয়ার পূর্ব্বে এখানে সকলেই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে কয়েকখানা ধর্ম্মশালা আছে—অহল্যাবাই, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের রাজন্যবর্গের ও সরকারী এই ৪ খানা ধর্ম্মশালা। ২।৩ খানা দোকান দেখিলাম। একটী সমতল স্থানে এই চটিটী অবস্থিত। নিকটে জলের ঝরণা। চটির নিকট হইতে দুইটী রাস্তা বাহির হইয়াছে। একটী (বাম ধারের) তুঙ্গনাথের ও অপরটী (ডান ধারের) ভীমগোড়া চটির। এখান হইতে নীচের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই চটি হইতে ৩ মাইল চড়াইএর পর শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের মন্দির। আমরা অল্প অল্প চড়াই দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা বেশ পরিষ্কার অল্প দিন হইল মেরামত হইয়াছে। শান্তি কাণ্ডী হইতে নামিয়া হাটিতে আরম্ভ করিল। চটি হইতে এক মাইল রাস্তা বেশী কঠিন নয়; মধ্যে মধ্যে সমতল স্থান এবং বহু বরাট বৃক্ষ, ইংরাজীতে ইহাকে Rhododendron বলে।

এই প্রকার বৃক্ষ কেদার ও কালীমঠের রাস্তায়ও অনেক আছে। কিন্তু এখানে যে প্রকার অগণিত এ প্রকার আর দেখি নাই। তোড়ার ন্যায় অনেক রক্তবর্ণ পুষ্প ফুটিয়া আছে, কোন কোনটা আবার শুকাইয়া গিয়াছে। ইহা রক্ত আমাশয়ের একটী ঔষধ। আমি ও কৃষ্ণা অনেকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শান্তির কাণ্ডীর মধ্যে রাখিলাম। শান্তিও অনেকগুলি কুড়াইল। এই সব বৃক্ষের তলদেশ বেশ পরিষ্কার; শুষ্ক পত্র ব্যতীত অন্য কোনও গাছ গাছড়া নাই। আরও কিছু দূর যাওয়ার পর দেখিলাম কুলিরা রাস্তা মেরামত করিতেছে। কলিকাতার কয়েক জন ধনী মাড়োয়ারী মহাজন এই তুঙ্গনাথের রাস্তা মেরামত করিবার জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। তুঙ্গনাথে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম পাণ্ডাদের মধ্যে আবার দুই দল হইয়াছে এবং রাস্তার খরচ সম্বন্ধে গোলমাল বাঁধিয়াছে। সেই সব বিষয় আর এখানে লিখিব না।

একমাইল পরে রাস্তা ক্রমশঃ কঠিন হইতে আরম্ভ করিল এবং স্থানে স্থানে ভীষণ চড়াই, মধ্যে মধ্যে আবার অল্প সমতল স্থানও আছে। এই এক মাইলের মধ্যে বিস্তর জঙ্গল, পরে আর জঙ্গল নাই। প্রস্তরের বাঁধান একটী স্থানে বসিয়া আমরা অনেক সময় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এত চাড়ইতেও আমাদের ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে না।

আমরা এখান হইতে পশ্চাদ্দিকে পর্ব্বত শৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই শৃঙ্গগুলি ঢেউ খেলিতে খেলিতে চলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে রওনা হইয়া দেখিলাম রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অসংখ্য নানা রং বিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর পুষ্প লতা পাতার মধ্যে ফুটিয়া আছে। মাতাঠাকুরাণী, শান্তি ও আমি অনেকগুলি ফুল উঠাইলাম। ইহার পর আর বৃক্ষ নাই রাস্তার উত্তর পার্শ্বে কেবল লতা পাতা ও ঘাস।

মধ্যে মধ্যে চড়াই ও মধ্যে মধ্যে সমতল। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, মাতাঠাকুরাণী আর চলিতে পারেন না, তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন এইবার বুঝি প্রাণ যায়। মনে হইতে লাগিল আমরা স্বর্গে উঠিতেছি। এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর শুইয়া পড়িলাম, আর ত পা চলে না। রাস্তার অদূরে কয়েকটী গহ্বর দেখিলাম। ইহার উপরে বেড়া আছে। এই পর্ব্বত আগ্নেয় পর্ব্বত, কোন সময়ে এইসব গহ্বর হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইত কিন্তু এখন নির্ব্বাপিত অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতে যে হইবে না তাহা কে বলিতে পারে ?

আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কেদারনাথের ও বদরীনারায়ণের পর্ব্বতমালা এখান হইতে দেখা যায়। উভয় পর্ব্বত শিখর দুইটীর মধ্যে প্রায় ১০ মাইল ব্যবধান। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে কেদারনাথের শৃঙ্গ ২২,৮৫৩ ফিট ও বদরীনারায়ণের পর্ব্বত শৃঙ্গ ২২,৯০১ ফিট উচ্চ। বদরীনারায়ণের পর্ব্বতমালাকে চৌখাম্বা পর্ব্বতও বলে। চৌখাম্বা পর্ব্বতের শিখরে নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরিগহ্বর আছে। তুঙ্গনাথ চন্দ্রশিলা নামক গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং পঞ্চ কেদারের মধ্যে এক কেদার। চন্দ্রশিলা শৃঙ্গ সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১২,০৭১ ফিট উচ্চ।

আমাদের রাস্তা আর শেষ হয় না, মনে হইতে লাগিল নিকটেই চড়াইএর উপর মন্দির কিন্তু যখন চড়াইতে উঠি তখন আর কিছুই দেখা যায় না। কুয়াসাতে আকাশ আচ্ছন্ন।

তুঙ্গনাথ

কিছু দূরে থাকিতে যখন মন্দির ও তৎসংলগ্ন ঘর বাড়ী দেখিলাম তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। মাতাঠাকুরাণী, শান্তি ও কৃষ্ণা অল্প ব্যবধানে ছিল, আমি আগে আগে চলিতেছিলাম। চিৎকার করিয়া বলিলাম "মা, এই যে মন্দির"। মন্দিরে যাইতে রাস্তার

দেখিলাম আকাশগঙ্গার জল পর্ব্বতের উপর হইতে ঝর ঝর করিয়া একটী কুণ্ডের মধ্যে পড়িতেছে, স্থানটী পাথর দিয়া বাঁধান। এখান হইতে মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে পাকা ঘর, তাহাতে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রমথ বাবুদের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে। তাঁহারা পূরী ও মিঠাকুমড়ার তরকারী ভোজন করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে, সাধুজী ও তাঁহার মালের বিষয় সমস্ত বলিলাম। গত রাত্রিতে সাধুজী তাঁহাদের চটিতে না যাওয়াতে প্রমথ বাবুরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অবস্থা বুঝাইয়া দিলাম।

আমাদের আর স্নান হইল না। মাতাঠাকুরাণী চোবাস্তা চটিতে স্নান করিয়াছিলেন। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের লিঙ্গ ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসদেব ও কালভৈরবের কল্পিত মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের বাহিরে পার্ব্বতীর ও গণেশের মূর্ত্তি। আমরা দর্শন, পূজন ও স্পর্শন করিয়া বাহিরে আসিলাম। প্রাঙ্গণের দুই ধারে কয়েকখানা প্রকোষ্ঠ আছে। এক খানাতে পূরী ভাজিতেছিল এবং একটা মিঠা কুমড়ার তরকারী রান্না করিতেছিল। আমরা এক টাকা সের পূরী ক্রয় করিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া ভোজন শেষ করিলাম। মন্দিরের নিকটে বসিয়া পাণ্ডা সুফল প্রদান করিলেন এবং রওনা হইবার সময় আবার তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিয়া রওনা হইলাম।

এখানেও কেদারনাথের ন্যায় ৬ মাস পূজা হইয়া থাকে। শীতের সময় তুঙ্গনাথের পাঁচটী ধাতুমূর্ত্তি, একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত ও চারিটী রৌপ্য নির্ম্মিত, এখান হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী মুকু বা মুখী মঠে আনিত হয় এবং তথায় পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দিরও কেদারনাথের রাওলের

তত্ত্বাবধানে। প্রত্যহ পাঁচসের পরিমাণ ভোগের বন্দোবস্ত আছে কিন্তু কতটা যে দেওয়া হয় তাহা পূজারী ও পাণ্ডারাই জানেন।

তুঙ্গনাথ ক্ষেত্র সর্ব্বকামপ্রদ, ইহা দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। কোন তীর্থই ইহার তুল্য নহে। ধর্ম্মদত্ত নামে একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণের কর্ম্মশর্ম্মা নামে একটী পুত্র ছিল তাঁহার অধ্যাপক থাকা সত্বেও বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেন না। ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রত্যহ দ্যূত ক্রিয়া ও সিদ্ধি সেবন করিতেন। এই ব্রাহ্মণতনয় যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া সুকর্ম্ম কিছুই বুঝিত না। তাঁহার একটী অত্যন্ত সুন্দরী ভগিনী ছিল কিন্তু সে কুকর্ম্মনিরতা হইয়া অসতী হইল এবং যে গ্রামে তাহার ভ্রাতা কর্ম্মশর্ম্মা বাস করিত, সেই গ্রামে আসিয়া বেশ্যারূপে বাস করিতে আরম্ভ করিল। কর্ম্মশর্ম্মা না জানিয়া তাহাতেই বহুকাল পর্য্যন্ত আসক্ত থাকিয়া পশুর ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। একদিন কর্ম্মশর্ম্মা নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন। একটী কাক তাহার শব মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথা উপস্থিত হইল এবং দেহ কঙ্কাল লইয়া তুঙ্গনাথক্ষেত্রে ত্যাগ করিল। এই ক্ষেত্রে তাহার কঙ্কাল পতিত হওয়াতে পূর্ব্বকৃত পাপ সকল তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল এবং শিবদূতগণ কর্ত্তৃক তিনি কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় বহু সহস্র বর্ষ বাস পূর্ব্বক পৃথিবীতে আসিয়া ধর্ম্মাত্মা পৃ[illegible]রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল মানব একবার মাত্রও তুঙ্গনাথ দেবকে দর্শন করিয়াছে তাঁহারা যে কোনস্থানে মরিলেও পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে। (কেদার মাহাত্ম্যম্)

আমরা অন্ত রাস্তা দিয়া উৎরাই আরম্ভ করিলাম। সিড়ি দিয়া

আমরা আস্তে আস্তে নামিতে লাগিলাম। বামধারে খাড়া পর্ব্বত আর ডানধারে ভীষণ গহ্বর তাহাও আবার কুয়াসায় ঢাকিয়া রহিয়াছে। একবার পদস্খলন হইলে যে কোথায় যাইয়া পড়িবে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। অনুমান ২ মাইল উৎরাইএর পর একটুকু সমতল স্থান পাইলাম, তথায় জলের ঝরণা আছে এবং অদূরে প্রায় শতাবধি ছাগল চরিতেছে, সঙ্গে ২।১জন রাখাল আছে। তুঙ্গনাথ হইতে আনিত পুরী সঙ্গে ছিল তাহা শান্তিকে খাওয়াইলাম। কৃষ্ণা শুষ্ক ডাল পালা জ্বালিয়া আগুণ করিয়া তামাক সাজিল তাহাই আমরা বেশ আরামের সহিত সেবন করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণার নিকট শান্তির কথা বলিতে বলিতে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। শান্তিকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারি না। আমার ভ্রাতৃবধুর নিকট রাখিতেও মন সরেনা, পাছে শান্তির অযত্ন হয়, তাই জানিয়া শুনিয়াও এই কঠিন চড়াই উৎরাইএর মধ্যে শান্তিকে তাহার ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ঘুড়িতেছি। আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কৃষ্ণারও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল, আমাকে বলিল "বাবু মৎ রোইয়ে"।

মাতাঠাকুরাণী ও প্রমথবাবুরা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। বৃষ্টি আসিতেছে দেখিয়া আর বিলম্ব না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। অল্প দূর যাওয়ার পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এত জোরে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল যে ছাতাতে আর মানে না। আমরা ভিজিতে ভিজিতে ভীমগোড়া চটিতে উপস্থিত হইয়া সাধুজী ও কুলিদের দেখিতে পাইলাম।

ভীমগোড়া—রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী খিচুড়ী রান্না করিয়া দিলেন। শান্তি আর খাইল না সন্ধ্যার পরই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রিতেও খুব বৃষ্টি হইতে লাগিল। দরজার মধ্যে অয়েল ক্লথ ২ খানা টানাইয়া দিলাম। রাত্রিতে

এই নূতন কুলির সহিত বহু সময় পর্য্যন্ত বাদানুবাদের পর ঠিক হইল সে গোপেশ্বর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। অবশ্য সে মজুরী অধিক নিবে। দোকানদার ও কুলিরা চটির ঘরের দুই ধারে দুই কুণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এ প্রকার ধুঁয়া করিয়াছে যে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। যখন তাহাদিগকে নিষেধ করা সত্বেও তাহারা নিরস্ত হইল না তখন আমরা ধমকাধমকি আরম্ভ করিলাম। এই ভাবে অনেক চিৎকারের পর তাহারা পথে আসিল।

২৬ দিবস, ২২ আষাঢ়—

প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা রওনা হইলাম। চটির নিকটে একটী খাড়া পর্ব্বতের গাত্রে একটী বড় গহ্বর আছে এবং ইহা এ প্রকার স্থানে অবস্থিত যে তথায় কোনও লোক যাইতে পারে না। আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়া উৎরাইএর রাস্তায় নামিতে আরম্ভ করিলাম। ২॥ মাইল পরে জঙ্গল বা পাঙ্গর বাসা চটি। এখানে রাস্তার দুই ধারেই অনেকগুলি ঘর। একটী ধর্ম্মশালা আছে। এখানে গরম মহিষ দুগ্ধ পাওয়া যায়। আমরা কিছু সময় বিশ্রামান্তে আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমাগত উৎরাই এবং রাস্তার দুই ধারে নিবিড় অরণ্য। একগাছা যষ্টি কাটিবার জন্য আমি রাস্তা হইতে ২।৩ হাত জঙ্গলের দিকে যেমন অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম আমার পায় নিকট একটা প্রকাণ্ড বিষাক্ত সর্প শুষ্ক পত্রের ভিতর নরা চরা করিয়া উঠিল এবং ২।৩ হাত চলিয়া স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল। সাধুজী ও শাস্ত্রিকে কাণ্ডীতে করিয়া কুলী রাস্তাতে দাঁড়াইয়াছিল। আমি দৌড়িয়া রাস্তাতে আসিলাম। আমরা শুষ্ক পত্রের মধ্যে লাঠি দ্বারা আঘাৎ করাতেও সর্পের ভ্রূক্ষেপ নাই। সর্পটা ৪।৫ হাতের কম লম্বা হইবেনা

এবং দেখিতে কেউটে সর্পের ন্যায়। অনেক সময় এই ভাবে থাকিয়া পরে আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও সর্প দেখি নাই এই প্রথম ও শেষ। জঙ্গল চটি হইতে ৩।০ মাইল উৎরাই এর পর মণ্ডলচটি।

মণ্ডল—এই চটিতে অনেকগুলি ঘর রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। কয়েকখানা দোকানও আছে এবং নিকটে রুদ্রগঙ্গা। নদীর উপত্যকায় অনেকটা সমতল ভূমি। নদীতে জল বেশ পরিষ্কার। আমি সাবান দিয়া কয়েকখানা কাপড় পরিষ্কার করিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা রশির ঝোলাতে নদী পার হইলাম। কুলিরা হাটিয়াই পার হইল। এইবার নদীর বামতীরস্থিত শস্যপূর্ণ সমতল উপত্যকার উপর দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা। মণ্ডল চটি হইতে একটা দুর্গম রাস্তা অনসূয়া দেবীর মন্দির হইয়া রুদ্রনাথ গিয়াছে। রুদ্রনাথ পঞ্চ কেদারের মধ্যে এক কেদার। মণ্ডল চটি হইতে কংচে পর্ব্বতের অনসূয়া দেবীর মন্দির প্রায় ২ মাইল চড়াই এবং রুদ্রনাথ ১০।১২ মাইল হইবে। বৈতরণী গঙ্গা নামক একটী নদী রুদ্রনাথে আছে। রুদ্রনাথ হইতে প্রায় ৭ মাইল উৎরাই এর রাস্তায় গোপেশ্বর। স্থানীয় লোকেরা রুদ্রগঙ্গাকে বালাসুন্ডী নদী বলে। রুদ্রনাথ যাইতে হইলে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া নিতে হয়।

মধ্যে বালাসুন্ডী নামক একটী ছোট নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমরা জলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া পার হইলাম। জল এক হাটুর অধিক নয়। শাস্তি কাণ্ডী হইতে নামিয়া পড়িল এবং প্রায় ৩ মাইল রাস্তা কখনও হাঁটিয়া কখনও বা দৌড়াইয়া চলিল। রাস্তার কিনারে গ্রাম, তথায় অনেক কাঁচকলার ও লেবুর গাছ আছে। কাঁচকলা পাইলাম না, কয়েকটী লেবু পাইলাম। মণ্ডলচটি হইতে ১।০ মাইল

পরে **আরামচটি**। তথায় একখানা মাত্র ঘর এবং জলও অনেক দূরে। আবার ১৷৹ মাইল পরে **পলটি চটি**, তথায় জল নাই, দোকানও নাই। একখানা শূন্য ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া আছে। এই চটির নিকট ছোট অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশ পাথর দিয়া বাঁধান। এখানে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অদূরে পাহাড়ের গা দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল, তাহা বহু কষ্টে একটী পাতাতে সংগ্রহ করিয়া পিপাসা দূর করিলাম।

সেটনা—২ মাইল দূরবর্ত্তী সেটনা চটি যাইতে অল্প অল্প চড়াই ও উৎরাই রাস্তা। পলটি চটি হইতে ১ মাইল যাওয়ার পর অপর এক পাকদণ্ডির রাস্তায় গোপেশ্বর যাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এই রাস্তায় আর গেলাম না, কারণ অনেক চড়াই ও উৎরাই। রাস্তাতে ৵৹ আনা দিয়া একজন পাহাড়ীর নিকট হইতে এক মোঠা ভূর্জ্জপত্র ক্রয় করিলাম। সেই লোকটা কিছুতেই বিক্রয় করিতে চায় না। অনেক সাধ্যসাধনার পর আদায় করিলাম। এখান হইতে দূরে গোপেশ্বর দেখাইতে ছিল। আমরা উৎরাইএর রাস্তায় বালখিল নামক ক্ষুদ্র নদীর নিকট আসিলাম। কয়েক বৎসর হইল ইহার উপরের সেতুটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা হাঁটিয়া পার হইলাম। অনতিদূরে সেটনা চটি। একখানা মাত্র ঘর কিন্তু দোকান নাই। চটির সম্মুখে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের তলদেশ প্রস্তরে বাঁধান। তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত প্রমথ বাবুর ও আমার আলাপ হওয়াতে বুঝিলাম গবর্ণমেণ্ট যাত্রী রাস্তা বন্ধ করিয়া কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছে। পরিশিষ্টে এই বিষয় আলোচনা করিব। এখানে বসিয়া শান্তিকে কিছু জলযোগ করাইয়া নিলাম। আমরা বসিয়া আছি এমন সময় দেখিলাম একটী পাহাড়ী

যষ্টিতে ভর করিয়া চটির ঘরের পশ্চাতের পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলাম তাহার একখানা পা নাই। লোকটী বলিল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঁথর পড়িয়া পা কাটিয়া গিয়াছিল পরে ঘা শুকাইয়া গিয়াছে। এক পায় ভর করিয়া কি প্রকারে যষ্টি সাহায্যে এই সব চড়াই উৎরাই করে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

মাতাঠাকুরাণী প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গ ও কুলিরা চলিয়া গিয়াছে, আমরাও রওনা হইলাম। ৫।৭ মিনিটের রাস্তা যাওয়ার পর দেখিলাম এক স্থানের পাহাড় ধসিয়া গিয়াছে। সকলেই রাস্তায় বসিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রাস্তার অবস্থা দেখিয়াই আমাদের চক্ষু স্থির। একটী উচ্চ পর্ব্বত এভাবে ধসিয়া গিয়াছে যে রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা ঝাঁপানওয়ালাদের সাহায্যে একে একে পার হইল। এ প্রকার বিপদ সঙ্কুল স্থানে পাহাড়ী লোক ব্যতীত গত্যান্তর নাই। প্রায় ১০০ গজ রাস্তা যাইতে আমাদের অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল।

গোপেশ্বর

১৷৷০ মাইল দূরবর্ত্তী সমতল রাস্তা দিয়া আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গোপেশ্বর পৌঁছিলাম। এখানে থাকিবার স্থানাভাব। একখানা দ্বিতল ভাল দোকান আছে কিন্তু তথায় দোকানদার আমাদিগকে থাকিতে দিল না, বলিল ১০ সের আটা ক্রয় করিলে আমাদিগকে স্থান দিবে। ইহার কারণ প্রমথ বাবুর ঝাঁপানওয়ালারা পূর্ব্বে এ স্থানে আসিয়া বলিয়াছিল যে বাবুদের সঙ্গে জিনিষপত্র আছে, তাঁহারা কোথাও জিনিষ ক্রয় করে না। আমরা স্থান না পাইয়া বহু আবর্জ্জনাপূর্ণ

একখানা ঘরে রাত্রি বাস করিলাম। সেই রাত্রিতে ছারপোকার যন্ত্রনায় আর আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই। আর সেই দ্বিতল দোকান খানাতে আমাদের কুলিরা স্থান পাইল। সন্ধ্যার সময় আমরা শ্রীশ্রী৺গোপেশ্বর মহাদেবের আরতি দেখিয়া আসিলাম। এখানে জল অনেক দূর হইতে আনিতে হয়। আমরা যে ঘরে আছি তাহার নিকটবর্ত্তী একখানা দোকান হইতে রান্নার জন্য কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া আনিলাম। এই দোকানদারের কোনও জিনিষ বিক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল না কারণ তাহার একটী ছেলে সেই দিবসই মারা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা দেখিয়া কাষ্ঠ এবং অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করিল। লোকটী সজ্জন।

গোপেশ্বর একটী গ্রাম এবং বালাসুতী নামক একটী উপনদীর বামতীরে অবস্থিত। নদী এখান হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল হইবে। বালাসুতী অলকানন্দায় মিলিয়াছে। এখানে গোপেশ্বর নামক মহাদেবের একটী পুরাতন মন্দির আছে ও মন্দিরের চারিধারে প্রাঙ্গণ ও শ্রেণীবদ্ধ ঘর। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটী বৃহৎ লৌহ নির্ম্মিত ত্রিশূল আছে, তাহার গাত্রে কি কি লেখা আছে এবং অক্ষরগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রাঙ্গণের বাহিরে একটী দ্বিতল ঘরে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী দেবী এবং রাওল সাহেবের গদি। আমরা গোপেশ্বর মহাদেবকে শুধু দর্শন করিতে পারিলাম, স্পর্শন করিতে পারিলাম না।

রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী খিচুড়ী রান্না করিয়া দিলেন, প্রমথ বাবুরা রুটি তৈয়ার করিলেন। এ স্থান চৌবাত্তা হইতে ১৬ মাইল দূর।

২৭ দিবস, ২৩ আষাঢ়—

এখানে একটী প্রবাদ আছে, যে একটী গাভী জঙ্গলের মধ্যে যখন চরিতে যাইত তখন তাহার দুগ্ধ আপনা হইতেই একখণ্ড

প্রস্তরের শিবের উপর পড়িত। নিকটস্থ গ্রাম্য লোকেরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া এই প্রস্তরের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল, তদবধি এই মহাদেবের নাম গোপেশ্বর হইল। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অনেক নানা আকারের শিবলিঙ্গ আছে, চৌকা, আটপল, চতুর্ম্মুখ, ইত্যাদি ধরণের।

মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে বৈতরণী প্রস্রবন আছে। প্রমথ বাবু ও আমি তথায় প্রত্যুষে যাইয়া আচমন ও তর্পণ করিলাম, প্রমথ বাবুই সঙ্কল্প মন্ত্র পড়াইলেন। এখানে যে ব্রাহ্মণ আছেন তিনি একটী ছেলে, মন্ত্র পাঠ করাইতে জানেন না। পরে দেব দর্শন করিয়া এখানকার রাওল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মন্দির সংলগ্ন একটী প্রাঙ্গনের মধ্যে তাঁহার গদি ও বাসস্থান। তাঁহার নাম শ্রীজয় সিং, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। জন্মস্থান রত্নগিরি এবং ৫ বৎসর যাবৎ এখানে রাওল হইয়াছেন। তাঁহার সহিত কেদার ও বদরীনারায়ণের রাওলদের কোনও সংস্রব নাই। গোপেশ্বরের রাওলের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত মন্দির আছে এবং পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কয়েকখানা গ্রামের রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে।

১। গোপেশ্বর।

২। রুদ্রনাথ—মণ্ডল চটি হইতে যাইতে হয়।

৩। সিদ্ধেশ্বর—২॥০ মাইল দূরে দিউর গ্রামে অবস্থিত।

৪। সর্পেশ্বর—এখান হইতে ৪॥০ মাইল দূরে সইকোট গ্রামের নিকট।

৫। কমেশ্বর—কুমার চটি হইতে ৬ মাইল চণ্ডাটএর রাস্তায় অবস্থিত। এখান হইতে ১৮ মাইল।

গত রাত্রির অসুবিধার কথা রাওল সাহেবকে জানাইলাম। তিনি

বলিলেন যে তাঁহাকে সংবাদ দিলে ভাল স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। আমাদের অসুবিধার জন্ত তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

রাওল সাহেব আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিলেন, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ৭॥•টার সময় বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এখান হইতে লালসাঙ্গা পর্য্যন্ত ২ মাইল বরাবর উৎরাই। রাস্তাতে কোথাও জল নাই। আমাদের সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা ও কুলিরা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় লালসাঙ্গার হেল্‌থ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি গোপেশ্বর আসিতেছিলেন। কেদার ও বদরীনারায়ণের রাস্তায় দুইজন হেল্‌থ অফিসার আছেন, একজন রুদ্র প্রয়াগে ও অন্যজন লালসাঙ্গায় থাকেন। তাঁহারা যাত্রীবাসের চটিগুলি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একজন নেপালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিকটবর্ত্তী গ্রামে থাকিয়া চাষবাস করেন ও নিজের সাধন ভজন করিয়া থাকেন, একখানা ঘর ও উঠাইয়াছেন।

আমরা লালসাঙ্গায় পৌঁছিয়া তথায় আর অধিক বিলম্ব না করিয়া লৌহ-নির্ম্মিত সেতুর নিকট কিছু সময় বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে লালসাঙ্গা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

লালসাঙ্গা (চামোলী)

অলকানন্দার অপর পারে অর্থাৎ বামতীরে এই ক্ষুদ্র সহর। ইহা ব্রিটিশ গাড়োয়াল জিলার একটী সবডিভিসন্‌। বাহির হইতে মনে করিয়াছিলাম ইহা না জানি কত বড় সহর কিন্তু এখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল হরি হরি এই কি লালসাঙ্গা। এই কি ব্রিটিশ রাজত্বের সবডিভিসন্‌ !

একখানা মাত্র বড় রকমের দোকান, আর ছোট দোকান ২। ৩ খানা আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্য কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ব্যতীত অন্য স্থান নাই। ধর্ম্মশালা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃহৎ এবং ঠিক অলকানন্দার তীরে অবস্থিত। এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর আছেন, তাঁহার আদালত পাহাড়ের উপর। ধর্ম্মশালার নিকটে হাস্পাতাল। এখানে একজন এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন্ থাকেন। সরকারী ডাকবাঙ্গলা, থানা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। ধর্ম্মশালার রাস্তায় বাজার, এখানে কোন দোকানে তরকারী পাওয়া যায় না, এমন কি আলু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ১৮৯৪ খৃঃ অঃ গোহনার বন্যার পূর্ব্বে বাজার দাক্ষণ তীরে ছিল। বন্যার স্রোতে পূর্ব্বের সেতু ভাসিয়া যায় এবং তাহার স্থানে লৌহ নির্ম্মিত ঝুলান সেতু হইয়াছে। বর্ত্তমান সেতু ১৩০ ফিট দীর্ঘ। পূর্ব্বে অলকানন্দার উপর একটী কাঠের সেতু ছিল এবং কাষ্ঠগুলিতে লাল রং দেওয়া ছিল বলিয়া পাহাড়ীরা এই স্থানের নাম "লাল সাঙ্গা" রাখিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানকে চামোলী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে ও ডাক ঘরের ছাপে চামোলী লিখা। লালসাঙ্গার অপর পারের রাস্তাটী খুব চওড়া ও পাথর দিয়া বাঁধান। এখানে কোন ঘর নাই। কেবল একটী খাড়া পাহাড় গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দেব প্রয়াগ, শ্রীনগর, গুপ্তকাশী, উখী মঠ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, যোশীমঠ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থান লালসাঙ্গা হইতে অনেক বড় এবং তথায় যাত্রীদের থাকিবার সুবিধাও বিস্তর আছে। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া কষ্টকর। হাস্পাতালে একটী ঝরণার জলের পাইপ আছে তাহা আবার সকল সময় খোলা থাকে না, তাহাতে তালাচাবি দেওয়া হইয়া থাকে। অলকানন্দার সেতু হইতে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত আসিতে ময়লার দুর্গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়।

আমরা সেতুর নিকটে বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া অলকানন্দার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। ২ মাইল দূরবর্ত্তী মঠ চটিতে ১২টার সময় উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকৃত্যের ব্যবস্থা করিলাম।

মঠ—এখানে অনেক কঁলা বাগান, আম্র বৃক্ষ ও তরকারীর বাগান আছে। দোকানদারের বাগান হইতে কাঁচামরিচ ও বেগুন কয়েক পয়সার ক্রয় করিলাম। দোকানে কাঁচাকলাও পাইলাম। দ্বিতলে একটী টবের মধ্যে তুলসী গাছ ছিল। দোকানদারকে বলাতে সে তাহার মেয়েকে দিয়া কয়েকটী তুলসী পত্র উঠাইয়া দিল, ইহা যত্নের সহিত বেগের মধ্যে রাখিয়া দিলাম, কারণ বদরীনারায়ণকে চড়াইতে হইবে। এখানে জলের পাইপ আছে।

গুপ্তকাশীর পূর্ব্বে ভিরি চটিতে আম বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম, ইহার পর আর কোথাও আমের গাছ নাই, আজ আবার এই মঠ চটিতে দেখিলাম। এখানে কাঁচা আম পাওয়া যায়।

শান্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে স্নান করাইলাম। সে প্রায়ই স্নান করিতে চায় না। এখানের একখানা দোকানে চামর, কম্বল, শিলাজতু প্রভৃতি পাওয়া যায়। অপরাহ্ন ৩৷৷৹ টার সময় রওনা হইয়া ১ মাইল দূরবর্ত্তী সিনকা চটিতে কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। গরম ও খুব পড়িতেছিল।

সিনকা—এই চটিতে একখানা বড় দোকান আছে। অন্য দোকান নাই খালি ঘর পড়িয়া আছে। শান্তির জন্য কয়েকটা খেলনার জিনিষ ক্রয় করিলাম। লালসাঙ্গা হইতে আমরা বেশ ভাল রাস্তা দিয়াই বরাবর চলিতেছি। অলকানন্দার অপর পার দিয়া পর্ব্বত গাত্রেও একটী রাস্তা দেখা যায়। এক মাইল পরে আমরা বিরহী গঙ্গার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। অপর পারে বিরহী গঙ্গা ক্ষীণ ধারায় অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে।

নদীতে জল বেশী নাই। জল দূর হইতে সাদা দেখাইতেছিল। সতী বিরহে মহাদেব শোক সন্তপ্ত হইয়া এই নদীর তীরে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই এই নদীকে "বিরহী" গঙ্গা বলে। গোহনা নামক গ্রামের নিকট একটী পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া একটা প্রকাণ্ড হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ অঃ ২৫ আগষ্ট তারিখে এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ জল স্রোত ভীম গর্জ্জনে অলকানন্দার উত্তর তীরস্থ—লালসাঙ্গা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ঘর বাড়ীর ও মন্দিরাদির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিল। এই ১৫০ মাইলের মধ্যে নদীর উপর যে সব সেতু ছিল তাহা ধ্বংস হইল। এখন যে সব বাড়ী ঘর ও মন্দিরাদি দেখা যায় তাহা গত ২৭ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। গোহনা গ্রামের নিকট বিরহী গঙ্গা এখনও একটী হ্রদের আকার ধারণ করিয়া আছে, ইহাকে "ঘোণা" হ্রদ বলে।

আরও অর্দ্ধ মাইল দূরে যাইয়া একটী ঝরণার নিকট বসিয়া শাস্তিকে জল যোগ করাইয়া নিলাম, কৃষ্ণা শুষ্ক ডাল পালা জ্বালিয়া আগুন ধরাইল এবং তামাক সাজিল। শুনিলাম গোপেশ্বরের উপরে যে "দিউরী" নামক একটী হ্রদ আছে তাহার উদ্বৃত্ত জলে এই ঝরণার সৃষ্টি হইয়া অলকানন্দায় পড়িতেছে।

আমরা অলকানন্দার দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতেছি। নদীর অপর পারে পূর্ব্বে রাস্তা ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আছে—সেই রাস্তা কি ভীষণ। পর্ব্বতের উপর দিয়া রাস্তা আর বহু নিম্নে গঙ্গা একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। লাল সাঙ্গা হইতে মঠ চটি পর্য্যন্ত পুরাতন রাস্তার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেই সব রাস্তায় চড়াই উৎরাই অনেক করিতে হইত। এখন ক্রমশঃ রাস্তা সুগম হইয়া আসিতেছে।

রাস্তাতে দেখিলাম প্রায় ৫০।৬০ টা ছাগল অলকানন্দার তীরে এবং

রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে চড়িতেছে, তাহাদের সঙ্গে ৩।৪ জন লোক আছে। অনেক গুলি ছোট ছোট থলিতে মাল বোঝাই করিয়া এক স্থানে স্তূপাকারে রাখিয়াছে, রাত্রিতে এই নির্জ্জন স্থানেই বাস করিবে। ইহারা নিতিপাস যাইবে। এই দলের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা চটিতে না থাকিয়া এ প্রকার নির্জ্জন স্থানে কেন থাকে। সে বলিল এই ছাগল গুলি চটি অত্যন্ত অপরিষ্কার করে, তাই চটিওয়ালারা স্থান দেয় না।

সিন্ধা—চটিতে যখন পৌঁছছিলাম তখন সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। আমরা একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় দোকানদার বলিল বাঙ্গালী বাবু ও স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা রাত্রিতে পিপুল কোঠী থাকিবেন বলিয়া গেলেন। আর দেরী না করিয়া রওনা হইলাম, সকলেই চলিয়া গিয়াছেন আমি শান্তিকে সঙ্গে করিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছি। কৃষ্ণা যোটেই চলিতে পাবে না। অল্প দূর যাইয়া রাস্তার কিনারে একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়ে। এক মাইল দূরবর্ত্তী ধোপিঘাট চটিতে পৌঁছছিয়া দেখি দোকানদারের নিকট খোয়া (ক্ষীর) পাওয়া যায়। অর্দ্ধসের ক্রয় করিলাম। কিছু দূরে রাস্তার বাম ধারে কতকগুলি বিল্ব বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে বিল্ব পত্র চয়ন করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় অলকানন্দার লৌহ নির্ম্মিত সেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেতু পার হইয়া একটী কঠিন চড়াই উঠিতে হয়। সিনকা চটি হইতে এপর্য্যন্ত বরাবর সমতল রাস্তা। সেতু হইতে পিপুলকোঠী ১॥০ মাইল হইবে। আমরা একটী পাক দণ্ডীর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে দেখিলাম অনেক পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোক ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। তাহাদিগকে বিড়ি বিতরণ করিলাম। তাহারাও খুব আহ্লাদিত হইয়া "জয় বদরী-

নারায়ণ" বলিল। অল্প পরেই অন্ধকার হইয়া আসিল, এখন বিষম মুস্কিলে পড়িলাম। রাস্তা ভাল করিয়া দেখা যায় না, সঙ্গে বাতিও নাই। মধ্যে মধ্যে রাস্তার কিনারে বড় বড় পাথরকে কোনও জানোয়ার বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। রাস্তা হইতে অলকানন্দা কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছেন। দূর হইতে পিপল কোঠীর বাতি গুলি দেখাইতেছিল। ইহা একটী উচ্চ স্থানে অবস্থিত। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম, আজ কি বিপদে পড়িলাম। রাস্তাতে একটী জন প্রাণীর সহিতও সাক্ষাৎ নাই। রাস্তা আর শেষ হয় না। দিনের বেলা হইলে রাস্তা দেখা যায়। আমরা অন্ধকারে হাবু ডুবু খাইয়া চলিতেছি। প্রমথ বাবু পূর্ব্বের চটিতে থাকিলেই ভাল করিতেন কিন্তু আমাব অসুবিধার কথাটী তাঁহাব একবার ও মনে হইল না! মনে মনে তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইলাম। ঠিক করিলাম এইবার যাইয়া তাঁহাকে কয়েকটী কথা শুনাইয়া দিব। পিপুল কোঠীতে প্রায় পৌহছিয়াছি এমন সময় দেখিলাম পাণ্ডার গোমস্তা যে মঠ চটি হইতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, সে একটী লণ্ঠন হাতে করিয়া আমাদেব তালাসে বাহির হইয়াছে। মাতা-ঠাকুরাণী তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এত রাত্রিতে আমাদিগকে চটিতে উপস্থিত হইতে না দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মার প্রাণ কি কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সন্তানের জন্য যে কি মায়া তাহা মা ভিন্ন কেহ বোঝেনা। হিমালয়েব দুর্গম রাস্তায় তিনি যে কত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কি হইলে আমি সুখে থাকি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন তাহা যখন ভাবি তখন ভক্তি রসে আমার মন প্রাণ ভরিয়া যায়। এ প্রকার ভাব অন্যেতে সম্ভবেনা এবং হইতেও পারে না।

———

পিপুল কোটী

আমরা রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া একটী দ্বিতল বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। এখানে আসিয়াই প্রমথ বাবুকে কয়েকটী কথা শুনাইয়া দিলাম। রাত্রিতে পুরী ও আলুর তরকারী আহার করিয়া শয়ন করিলাম।

এই স্থান অলকানন্দার বাম তীরে একটী গ্রাম। এখান হইতে নদী কিছু দূরে। এখানে রাস্তার দুই ধারে অনেকগুলি সারীবদ্ধ দোকান আছে। লুচি, পেড়া, লাড্ডু ও জিলাপি পাওয়া যায়। মেওয়া, পুস্তক, বাসন পত্র, চামর ও মনিহারী জিনিষের দোকান আছে। এখানে ডাক ঘর ও সরকারী বাংলা আছে। যাত্রীদের থাকিবার অনেকগুলি দ্বিতল ঘর আছে, কিন্তু এখানে ভাড়া দিতে হয়। জন প্রতি /০ আনা হিসাবে ভাড়া দিলাম। লুচির সের ১৲ টাকা। এখানে নোট ভাঙ্গাইতে পায়া যায় তবে বাটা লাগে। একটী শিব মন্দির আছে, তথায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব সময়ের একটী শিব লিঙ্গ বিদ্যমান।

২৮ দিবস, ২৪ আষাঢ়—

গরুড়-গঙ্গা—রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা ৬৷০ টার সময় রওনা হইয়া ৯টার সময় গরুড়-গঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। এই গঙ্গাতে সঙ্কল্প, স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। নদীতে জল অল্প ৩ ফিটের অধিক হইবে না। হাতের দিকে না চাহিয়া ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়। এই গুলির নাম গরুড় শিলা, যাত্রীরা স্ব স্ব গৃহে, ইহা লইয়া যান। ইহা গৃহে থাকিলে সর্প ভয় থাকে না এবং এই পাষাণ ধুইয়া জল পান করিলে সর্প-বিষ দূরীভূত হয়। আমরা সকলেই কিছু

কিছু সংগ্রহ করিলাম। এপারে কালীকম্বলী বাবার একটী ধর্ম্মশালা এবং নদীর তীরে একখানা চটি আছে। অপর পারে কাঠের সেতু পার হইয়া যাইতে হয় তথায় গরুড়জীর মন্দির ও চটির ঘর আছে। এখানে দুগ্ধ, পেড়া, পুরি ইত্যাদি পাওয়া যায়। হরিদ্বার হইতে কর্ণ প্রয়াগের রাস্তায় এইস্থান প্রায় ১৪৯ মাইল।

গরুড় গঙ্গা পার হইয়াই একটী কঠিন চড়াই উঠিতে হয়। আমরা অগ্রবর্ত্তী হইলাম, প্রমথ বাবুরা পশ্চাৎ আসিতেছেন। এই চড়াই উঠিয়াই রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু চির বৃক্ষ। এই চির বৃক্ষের বিস্তর তক্তা করা হয়, কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই পচিয়া যায়। অর্দ্ধ মাইল চড়াইএর পর আমরা সমতল রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। ২।০ মাইল পরে টাংনী চটি। চটির কাছাকাছি হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম শান্তির জ্বর হইয়াছে। সে বলিতেছে, "বাবা ভাল লাগে না।" আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম।

টাংনী—চটিতেই জিনিষ পত্র নামাইলাম। শান্তিকে একখানা অয়েল ক্লথের উপর কম্বল পাতিয়া বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দিলাম। এস্পিরিন খাওয়াইলাম। প্রমথ বাবুর ইচ্ছা ছিল পাতাল গঙ্গা যাইয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করেন। তিনি আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বলিলাম, শান্তির জ্বর হইয়াছে, এখন আর অগ্রসর হইতে পারি না, আপনারাও এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করুন। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে, তথায় তাঁহারা আশ্রয় নিলেন। ধর্ম্মশালাটী অল্প দিন মাত্র তৈয়ার হইয়াছে। এখনও শেষ হয় নাই।

মাতা ঠাকুরাণী রান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন। এখানে লেবুর গাছ আছে। কয়েকটী পয়সার লেবু ক্রয় করিলাম। এখানে জলাভাব। ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটী পাইপ দিয়া খুব আস্তে আস্তে জল পড়িতেছে।

অনেক সময় দাঁড়াইয়া থাকিলে তবে এক কলস জল পাওয়া যায়। নিকটে একখানা ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রাম বাসীরাও এখান হইতে জল নেয়। আমি যখন স্নান করিতে গেলাম তখন দেখি পাহাড়ী রমণীরা কলস হাতে করিয়া দাড়াইয়া আছে, ইহাদের গায় এত দুর্গন্ধ যে কাছে দাঁড়ান যায় না। একটী রমণীকে একটুকু সরিয়া যাইতে বলাতে সে উল্টা আমাকে ধমকাইয়া দিল। আমি আর বাক্য ব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম।

যখন আমাদের রান্না শেষ হইয়াছে তখন দেখি শান্তির জ্বরও কমিয়া গিয়াছে। আমার সহিত সেও অন্ন পথ্য করিল। শান্তির হৃষীকেশে জ্বর হইয়াছিল পরে এযাবৎ আর কোন প্রকাব অসুখ করে নাই। ভগবানকে ত এক মনে ডাকিতেছি। তাঁহার এমনই অনুগ্রহ যে, এই জ্বর ছাড়িবার পর আর জ্বর হয় নাই। কুইনাইন পিল খাওয়াইলাম। ভগবান তুমি ধন্য, তোমাব মহিমা ধন্য! তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আকাশে, বাতাসে, পর্ব্বতে, কন্দরে, সর্ব্বত্রই তোমার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। অন্ধ মানব আমরা এসব দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না।

পাতাল গঙ্গা—পাতাল গঙ্গা এখান হইতে দুই মাইল। অপরাহ্নে রওনা হইয়া পাতাল গঙ্গা পৌঁছিয়া অনেক সময় বিশ্রাম করিলাম। রাস্তাতে বহু চির বৃক্ষ। গঙ্গা রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে—জল বেশী নাই। রাস্তা হইতে গঙ্গার জল সাদা দেখাইতেছে। নদীতে নামিয়া গঙ্গার জল মাথায় দিলাম এবং এক ঘটি জল সকলের জন্ত লইয়া আসিলাম। তাঁহারা রাস্তায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখানে এই নামে একটী চটি আছে। পরিষ্কার জল প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর হইতে আনিতে হয়। পাতাল গঙ্গার জল এত ঘোলা যে, তাহা খাওয়া যায় না। পাতাল গঙ্গাকে গণেশ গঙ্গাও

বলে। এখনও অনেক বেলা আছে তাই আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চটি হইতে অর্দ্ধ মাইল ভীষণ চড়াই—পরে রাস্তা সমতল ও মধ্যে মধ্যে চড়াই উৎরাই আছে। দুই মাইল দূরে **গুলাব কুণ্ডী**। নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটী নারায়ণের মন্দির আছে। এখানে ক্ষীর ক্রয় করিতে পাবা যায়।

কুমার চটি—আরও দুই মাইল পরে কুমার চটি। সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিলাম। এখানে কালীকম্বলী বাবার একখানা বৃহৎ এক তালা ধর্ম্মশালা আছে। প্রকাণ্ড বারেন্দা এবং তৎসংলগ্ন ৩।৪টী প্রকোষ্ঠ আছে। নিকটেই জল। এই চটিতে আরও অনেকগুলি ঘর আছে। অলকানন্দার বাম তীরে অবস্থিত, কিন্তু নদী অনেক দূরে ও বহু নিম্নে। এই চটির অপর নাম **হিলাং**।

এই চটি হইতে একটী পার্ব্বত্য রাস্তা অলকানন্দা পার হইয়া পঞ্চ কেদারের অন্যতম কল্পেশ্বর গিয়াছে। নদীর উপর যে দড়ির ঝোলা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমরা আর তথায় যাইতে পারি নাই।

কল্পেশ্বর মহাদেব

কুমার চটি হইতে প্রায় সিকি মাইল নিম্নে কল্পেশ্বর গঙ্গা। এখানে কর্ম্মনাশা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। যাত্রীরা জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্ম-নাশের জন্য এই কর্ম্মনাশা নদীতে স্নান করিয়া থাকেন। পর্ব্বতোপরি নিবিড় দেবদারু বন মধ্যে শ্রী৺কল্পেশ্বর মহাদেব। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক মহাদেব পূজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আরাধনা করিয়া কল্প বৃক্ষকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা কল্প স্থান নামে প্রসিদ্ধ, এবং সর্ব্বপাপ নাশক।

একদা ইন্দ্র গন্ধর্ব্বগণ, দেবগণ ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গদাধরের নিকট গমন করিতেছিলেন। এমন সময় মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা দৈব বশতঃ কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটী সুগন্ধি পুষ্প-মাল্য-ধারিণী সুন্দরীকে দর্শন করিয়া মাল্য প্রার্থনা করিলেন। সেও শাপভীতা হইয়া দুর্ব্বাসাকে মালা দান করিল। অনন্তর দুর্ব্বাসা যেখানে ইন্দ্র ছিলেন তথায় গমন করিলেন। হস্তি পৃষ্ঠে সমারূঢ় দেখিয়া মালা ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "ওহে সুরগণ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, আমি তোমাকে দিব্য মাল্য প্রদান করিতেছি, তুমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ কর।" ইন্দ্র অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে মনে হাস্য করিতে করিতে ঐ মালা গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রকে মদমত্ত দেখিয়া মুনি-শ্রেষ্ঠ ক্রোধে অন্ধ হইয়া জল স্পর্শ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তুমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া আমাকে অপমান করিলে। অতএব তোমার লক্ষ্মী ত্রৈলোক্য হইতে ভ্রষ্টা হইবেক।" ইন্দ্র বলিলেন, "হে বিপ্র আমি না জানিয়া মূঢ় বুদ্ধি বশতঃ আপনাকে অবমানিত করিয়াছি। হে দেব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমার শাপ অমোঘ, তুমি মহাদেবের আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া মুনিবর যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন এবং লক্ষ্মীও ত্রিলোক হইতে ভ্রষ্টা হইলেন। ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র নষ্ট হওয়াতে সমস্ত জগৎ হাহাকার রবে পূর্ণ হইল। বেদ পাঠ, হোম, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বর্জ্জিত হইল। ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট হইলেন। রাজা প্রজা পালন করিলেন না। দেবতাগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট শরণাগত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া দেব দেব মহাদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

২৯ দিবস, ২৫ আষাঢ়—

গত রাত্রিতে ধর্ম্মশালা হইতে গালিচা দিয়াছিল তাহা ভাল করিয়া বিছাইয়া তাহার উপর আমরা বিছানা করিয়াছিলাম। আজ ভোরে ৬॥ টার সময় রওনা হইলাম। শান্তির অন্ত নাই। প্রায় দেড় মাইল পরে একটি ফাঁড়ি পথ রাস্তার বাম ধার দিয়া অর্দ্ধ মাইল উংবাইএর রাস্তায় অনীমঠ গিয়াছে। এখানে বৃদ্ধ বদ্রী আছেন এবং পঞ্চ বদ্রীর এক বদ্রী। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তথায় গিয়াছিলাম। সে কথা পরে বলিব। আমরা অল্প অল্প চড়াই এর রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাইল দূরবর্ত্তী সিংধার চটিতে পৌঁছিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম।

সিংধার—এই চটি রাস্তা হইতে একটুকু উচ্চ স্থানে। একখানা মাত্র ঘর, শূন্য পড়িয়া আছে।

ঝরকপুর—এক মাইল দূরবর্ত্তী ঝরকপুর চটিতে শ্রীবালি-রাম শর্ম্মার একখানা পুস্তকের দোকান আছে, তথায় শিলাজতু, মৃগনাভি ও অন্যান্য ঔষধও পাওয়া যায়। দোকানে বাঙ্গলা পুস্তক ২।১ খানা মাত্র আছে আর সমস্তই হিন্দি। আমি একখানা বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিয়া দোকানদারের নিকটই রাখিয়া দিলাম। ফিরিবার সময় লইয়া যাইব। যখন এই রাস্তায়ই ফিরিতে হইবে তখন বইর বোঝা কে বহন করে? এই চটির নিকটে একটী সরকারী ডাকবাংলা আছে। পুস্তকের দোকানে যে সময় বসিয়াছিলাম মাছির উপদ্রবে অস্থির হইয়া উঠিলাম। এই চটির পর রাস্তা অল্প অল্প চড়াই এবং এক এক স্থান এ প্রকার ভীষণ যে বাম ধারে রাস্তার নিম্নে তাকাইতে মাথা ঘুরিয়া যায়। এক ধারে পর্ব্বত, অপর ধারে বহু নিম্নে অলকানন্দা। এস্থানের পাহাড় অনেকটা সাদা রং বিশিষ্ট প্রস্তর গুলি আলগা ভাবে

আছে। দুই একটুকুরা খসিয়া যাত্রীর মস্তকে পড়িলে আর রক্ষা নাই। আমার মাতাঠাকুরাণী, প্রমথ বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ অনেক আগেই চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জোশীমঠে যাইয়া অপেক্ষা করিবেন। কুলিরাও চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন শ্যাম চটি হইতে ফাঁড়ি পথে গিয়া বিষ্ণু প্রয়াগ বিশ্রাম করে,—আমরা তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পাদন করিব। আমরা এই প্রকার প্রগ্রাম করিয়া বাহির হইয়াছি। প্রগ্রাম করিলে কি হইবে। কৃষ্ণাও চলিতে পারে না, আর সাধুজীও চলিতে পারেন না। আমরা এই চারি প্রাণীই পিছনে পড়িয়া আছি।

শ্যামচটি—খরকপুর হইতে শ্যাম চটি দুই মাইল। এই চটির নিকট হইতে পর্ব্বতের নিম্ন দেশ দিয়া একটী রাস্তা বিষ্ণু প্রয়াগ গিয়াছে। আর আমরা যে সরকারী রাস্তায় চলিতেছি তাহা জোশীমঠে যাইয়া শেষ হইয়াছে। জোশীমঠ পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল, পরে রাস্তা অপরিসর ও বন্ধুর,—মধ্যে মধ্যে প্রস্তরখণ্ড সকল ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। এই চটিতে পৌঁছিয়া অনেকগুলি ডাঁটা শাক উঠাইলাম। চটির ঘর দুই খানা শূন্য ও অৰ্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। চটির চতুর্দ্দিকে অনেক ডাঁটা শাক হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটা পিচ্ ফলের গাছ হইতে কৃষ্ণা কয়েকটা ফলও পাড়িল। জোশীমঠ ঢুকিতে প্রথমেই স্বামী শ্রীমৎ গিরিবরানন্দের প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিকটেই স্বামীজীর আবাস গৃহ। বেশ সুন্দর বাঙ্গলা। দুঃখের বিষয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময় পাইলাম না। ফিরিবার সময় প্রমথ বাবু ও আমি এই ধর্ম্মশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

———

জোশীমঠ—(জ্যোতির্ম্মঠ)

আমরা ১০ টার সময় জোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী ছোট সহর। আমরাও পৌঁছিয়াছি প্রমথ বাবুরাও তখন দেবাদি দর্শন করিয়া জোশীমঠ ছাড়িয়া বিষ্ণু প্রয়াগের দিকে রওনা হইলেন। আমি ও সাধুজী বলাবলি করিলাম কুচ পরোয়া নেই, আমাদের যখন পা আছে তখন আমরা না হয় আস্তে আস্তেই যাইব; কিন্তু এজন্ত সাধুজীকে কথা শুনিতে হইয়াছিল। আমার সঙ্গে যে সাধুজী রাস্তাতে এক সঙ্গে যাইবেন তাহা প্রমথ বাবুর ইচ্ছা নয়। কারণ ইহাতে অনেক দেরী হয় এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া প্রমথ বাবুদের জোগাড় দেওয়ার লোক থাকে না। জোশীমঠে ঢুকিয়া প্রথমেই রাস্তার উপর ডাক ও তার ঘর পরে কালীকম্বলী বাবার দ্বিতল ধর্ম্মশালা। ইহার নিকটে একটি প্রকাণ্ড ঝরণা এবং রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দোকান। পরে সরকারী হাস্পাতাল, পুলিশের থানা, রাওল সাহেবের বৃহৎ বাড়ী, ভূতপূর্ব্ব রাওলের পুত্র কুমার শ্রীরাম চন্দ্র নম্বুরী শর্ম্মার পুস্তক, শিলাজতু ও মৃগনাভির দোকান। এখানে একটী পাঠশালা আছে। রাস্তা হইতে কিছু নিম্নে নৃসিংহ বদ্রীর মন্দির ইত্যাদি। এখানে তরকারী বাগান, ফুলের বাগান সব আছে, ফুলের বাগানে বেশ বড় বড় গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে। জোশীমঠ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত। ইহাকে জ্যোতির্ম্মঠও বলে। এখানে কয়েকটী দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে নৃসিংহ ভগবানই প্রধান। আমরা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া একটী প্রাঙ্গনের মধ্যে পড়িলাম, তথায় একটী প্রস্তরের ছাদ বিশিষ্ট গৃহে—দুইটী পিতলের গোমুখ দিয়া জলধারা পড়িতেছে। এখানে সকলে স্নানাদি করিয়া থাকেন। আমি আর স্নান করিলাম না, মার্জ্জন করিয়া নৃসিংহ বদ্রীর

মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এ মন্দির কতকটা সমতল স্থানে অবস্থিত। পাহাড় কাটিয়া সমতল করা হইয়াছে। জোশীমঠের সমস্ত স্থানটী পর্ব্বত গাত্রে অবস্থিত।

নৃসিংহ-দেবের মন্দির—ইহা একটী উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অবস্থিত, ইহার চতুর্দ্দিক ঘেরা। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে মন্দির, ইহা বহু পুরাতন এবং আশে পাশের ঘর গুলিও পুরাতন দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান হয়। এখানে বহু প্রাচীন কালের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে বদ্রীনাথ ও নৃসিংহ ভগবান কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের সুন্দর মূর্ত্তি। ডান ধারে চণ্ডী, গরুড়, কুবের ও উদ্ধব এবং বাম ধারে লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার মূর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখে পিতলের একটী গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। আমরা দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিলাম, পরে রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত একটী উচ্চ স্থানের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে পিতলের গরুড় দেবের মূর্ত্তি। প্রাঙ্গনের মধ্যে বাসুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম, নবদেবী ও গণেশের মন্দির। এখানে অনেক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। একটী পুরাতন শিব মন্দির আছে। শীতের ৬ মাস যখন বদরিকাশ্রম বন্ধ থাকে তখন নৃসিংহদেবের মন্দিরে বদ্রী নারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। ভূমিকম্পে এখানকার অনেক মন্দিরের ক্ষতি হইয়াছে।

এখানে একটী বহু পুরাতন মন্দির আছে। তথায় এক দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শুনা যায় তাঁহার সম্মুখে প্রত্যহ নরবলি হইত। এক একদিন এত অধিক নরবলি হইত যে তাহাদের শোণিত প্লাবনে প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া যাইত। এই বীভৎস কাণ্ড কত দিনে নিবারিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তবে অনেকের ধারণা শঙ্করাচার্য্য জোশীমঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সময় এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডও নিবারণ করেন। আবার কাহারও কাহারও

মতে বৌদ্ধেরা নরবলি বন্ধ করিয়াছেন এবং দেবীকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন।

জোশীমঠ "ঝালি" নামক উচ্চ পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে একটী বক্র স্থানে এবং বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল হইতে ১৫০০ ফিট ও সমুদ্রবক্ষ হইতে ৬১০৭ ফিট উচ্চে। জোশীমঠের উত্তর ধারে উচ্চ পর্ব্বত থাকাতে হিমালয়ের ঠাণ্ডা বাতাস হইতে এই ক্ষুদ্র সহরটী রক্ষা পাইতেছে। এই উচ্চ পর্ব্বতকে "হাতী" পাহাড় বলিয়া থাকে। বিষ্ণুপ্রয়াগ এখান হইতে দুই মাইল নিম্নে। এখানে বাটীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং শ্লেট পাথর বা পাতলা তক্তার ছাদবিশিষ্ট এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

জোশীমঠ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থের ন্যায় বিষ্ণুর প্রীতিকর তীর্থ আর নাই। নৃসিংহ রূপধারী ভগবান শ্রীহরি এখানে নিরন্তর অধিষ্ঠান করিয়া জীবের মুক্তি প্রদান করিতেছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষের চারিটী মহাতীর্থে চারিটী মঠ স্থাপন করেন।

এই চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া চারিটী প্রধান শিষ্যকে অধ্যক্ষতার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ে জোশীমঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, দাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শৃঙ্গেরি মঠ, এবং পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠ। চারিজন অধ্যক্ষের নাম (১) জোশীমঠে তোটকাচার্য্য, এবং তাঁহার শিষ্য—গিরি পর্ব্বত ও সাগর। (২) সারদা মঠে হস্তামলক এবং তাঁহার শিষ্য—তীর্থ ও আশ্রম। (৩) ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমে শৃঙ্গেরি মঠে সুরেশ্বর এবং তাঁহার শিষ্য সরস্বতী, ভারতি ও পুরি। (৪) শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠে পদ্মপাদ এবং তাঁহার শিষ্য—বন ও আরণ্য ইত্যাদি উপাধিতে বিভূষিত করেন।

সারদা মঠ, শৃঙ্গেরি মঠ ও গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষরা শঙ্করাচার্য্য নামে

অভিহিত হইয়া থাকেন এবং দশটী উপাধিধারী শিষ্যগণ দশনামী সন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন।

শেষোক্ত তিন স্থানে এখনও গদি আছে কিন্তু এখানে তেমন কিছু নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভারতের চারিধার হইতে মস্তক উন্নত করিয়া এখনও হিন্দুধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছে। যোশীমঠে অনেক বহু পুরাতন গ্রন্থ আছে, তাহার কতক পোকায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে আর কতক জীর্ণভাবে আছে। ভূতপূর্ব্ব রাওলের পুত্র কুমার শ্রীরামচন্দ্র নম্বরী শর্ম্মা কতক পঙ্কোদ্ধার করিয়া শ্রীকেদারকল্প (ভাষা টিকা সহিত) নামে একখানা হিন্দিতে বই ছাপাইয়াছেন। পুস্তকখানা খুব ভাল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য যে তোটকাচার্য্য গিরির হস্তে মঠাধ্যক্ষের ভার অর্পণ করিয়া যান তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই মঠের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই মঠের জন্য যে প্রকার জমি আছে এ প্রকার অপর তিন মঠে নাই। বদরিনারায়ণের বিপুল সম্পত্তি, কিন্তু যাহাদের হস্তে এই সম্পত্তির ভার তাহারা নিজেদের নানা প্রকার ভোগ বিলাসে যথেচ্ছা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার ফলে এই সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে অধ্যক্ষতা বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বে সকল মঠ অপেক্ষা জ্যোতির্ম্মঠের অনেক নাম ছিল এখন যদিও জ্যোতির্ম্মঠের অনেক নাম কিন্তু কার্য্যে কিছুই নাই। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিরীশ্বর শিব আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নামমাত্র পূজা হইয়া থাকে; আর ভোগের ত কথাই নাই। যে সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তাহাতে পূজারীর অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। রাওল সাহেব তাহা দেখেন না। এখানে মোহন্তকে রাওল বলিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য এ প্রকার নিয়ম করিয়া গিয়াছেন যে, যিনি রাওল হইবেন তিনি গ্রীষ্মের ছয়মাস বদরিকাশ্রমে থাকিয়া শ্রীশ্রী৺বদরি-

নারায়ণের পূজা করিবেন, আর শীতের সময় যখন উক্ত স্থান বরফে ঢাকিয়া যাইবে তখন জোশীমঠে থাকিয়া নারায়ণের পূজা করিবেন এবং এই জন্য বিস্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই নিয়ম এখনও পালন হইতেছে কিন্তু সকলই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন ত্রিবাঙ্কুর অথবা মহীশূরের রাজ দরবার হইতে রাওল নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং তিহরীর মহারাজা আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাস করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান রাওল সাহেব নম্বুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ. তাঁহার রক্ষিতা স্ত্রী আছে এবং তাঁহার তিন পুত্র, তাহারা আলমোরাতে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এখন এ প্রকার নিয়ম হইয়াছে যে, যিনি রাওল হইবেন তাঁহাকে চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে।

এখানে নৃসিংহ বদ্রীর এক হস্ত ক্রমশঃ কৃশ হইতেছে এবং যখন পড়িয়া যাইবে তখন বদরিকাশ্রমের রাস্তাও পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন ভবিষ্যবদ্রী অথবা আদি বদ্রীতে যথারীতি পূজা হইবে।

"The road to Badri never will be closed.
The while at Jyoti (Joshimoth) Vishnu doth remain;
But straight way when the God shall cease to dwell.
The path to Badri will be shut to men."

—সনৎকুমার সংহিতা।

কুমার শ্রীরামচন্দ্র নম্বুরী শর্ম্মার পুস্তকের দোকানের সম্মুখে গাছ তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় সাধুজী সংবাদ দিলেন যে, নিকটবর্ত্তী একখানা ঘরে তিন জন সন্ন্যাসী আছেন। আমরা তখনই উঠিয়া গেলাম, দেখিলাম তিন জনই প্রকৃত সন্ন্যাসী। একজন বাঙ্গালী, পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ী ছিল হুগলী জিলায়। একজন মান্দ্রাজী ও একজন

গাড়োয়াল শ্রীনগরের অধিবাসী। একজন একটা লোহার তাওয়াতে কতকটা জঙ্গলী শাক ও কয়েকটা আলু সিদ্ধ করিতেছেন, একজন ভিক্ষালব্ধ আটা ছানিয়া রুটি প্রস্তুত করিতেছেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটী বলিলেন, দুইবেলা আহার জোটে না—এক বেলা হইলেই যথেষ্ট। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহারা কয়েক দিনের মধ্যেই তিব্বতের রাস্তায় মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রা করিবেন এবং নেপালের ভিতর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইহাতে তাহাদের প্রায় দুই মাস সময় লাগিবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মানস সরোবরের রাস্তায় ভিক্ষা কোথায় পাইবেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন "ভগবান যখন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন তিনিই আহার যোগাইবেন। পিপীলিকারা যখন গৃহস্থের ঘরে থাকে তখন তাহারা চিনি গুড় প্রভৃতি খাইয়া থাকে, কিন্তু এই হিমালয়ের মধ্যে যত পিপীলিকা আছে তাহাদের আহার কে যোগাইয়া থাকে? তথায় ত লোকে তাহাদের আহার দিয়া আইসে না? ভগবানই তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।" এই তিন জন সন্ন্যাসী অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতের সকল তীর্থই এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন কখনও অনশনে থাকেন নাই। সিদ্ধ মহাপুরুষ কোথাও আছেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, একজন গঙ্গোত্তরীর উপরে, আর একজন যমুনোত্তরীর উপরে আছেন। তথায় সাধারণ মনুষ্যের যাওয়া অসাধ্য।

এই সন্ন্যাসীদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভগবানে ভক্তির জোর আছে তাই তাঁহারা লোকের অসাধ্যও সাধন করিতে পারেন। আমরা সংসারী. আমাদের সে প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি কোথায়? তাঁহারা জঙ্গলী শাক ও মোটা আটার রুটি খাইয়াই নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা শারীরিক সুখ চান না, তাঁহারা চান মনের সুখ শান্তি। সংসারী মানব

তোমরা ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষণস্থায়ী সুখের বোঝা মস্তকে লইয়া কয়দিনের জন্য কেবল "আমার" "আমার" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? সংসারে ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াইতে হইলে এই সন্ন্যাসীদের অনুসরণ কর। সংসাররূপ মরুভূমিতে হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেলে, সংসারের বাধাবিঘ্নে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে, ভগবানের শরণাপন্ন হও। দেখিবে হৃদয়ে কত শক্তি পাও। মানব শক্তির আশা ত্যাগ কর। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস কর, প্রাণ সাহসবদ্ধ কর, মনকে ভক্তিস্রোতে ভাসাইয়া দাও, দেখিবে তোমার বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ রাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ে এক উৎকট আবেগ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিবে। তখন আর স্বার্থের প্ররোচনায় অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পূরণ করিতে চাহিবে না।

আমার সাধুজী ত তাঁহাদের কথা শুনিয়া আর আমাদের সহিত যাইতে চান না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া আসিলে নিজেই রাস্তা দেখিয়া নিবেন, তখন আর অপরের সাহায্য দরকার হইবে না। আপনি বদরীনারায়ণ দর্শন না করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।" সাধুজী তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন "আপনারা যদি ৫।৬ দিন অপেক্ষা করেন তবে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়া আমি ফিরিয়া আসিব এবং আপনাদের সঙ্গে মানস-সরোবর যাত্রা করিব।" কিন্তু সাধুজী এই সময়ের মধ্যে আর ফিরিতে পারেন নাই এবং তাঁহার মানস-সরোবর যাত্রাও হয় নাই।

জোশীমঠ হইতে একটী রাস্তা ধাউলী নদীর তীর দিয়া নিতিপাস নামক গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহা এখান হইতে ৫৮ মাইল দূরে,

এবং সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৬,৬২৮ ফিট উচ্চ। ভবিষ্যবদ্রী পঞ্চবদ্রীর অন্যতম এবং এই রাস্তায় এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ৯ মাইল দূরে ঢাকতপোবন নামে একটী ছোট গ্রাম আছে, তথায় কতকগুলি উষ্ণকুণ্ড ও ভাঙ্গা মন্দির আছে। পরে আরও ৪ মাইল ব্যবধানে সুচৈ গ্রামে ভবিষ্যবদ্রীর মন্দির আছে। কলির প্রাবল্যে যখন নরও নারায়ণ নামক অলকানন্দার উত্তর তীরস্থ পর্ব্বতদ্বয় মিলিত হইয়া বদরীনারায়নের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইবে. তখন এই ভবিষ্যবদ্রীই প্রধান তীর্থস্থান হইবে। জোশীমঠ হইতে ত্রৈলঙ্গমঠ ৫০।৬০ মাইল দূরে। এ রাস্তায় আরও অনেক তীর্থ আছে—মুক্তিনাথ, গণ্ডকী নদী প্রভৃতি। এই নিতিপাস হইয়া তিব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বত গমন করা যায়।

তিব্বতের রাস্তায় চামরী গরু দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই রাস্তায় ছাগলের উপরে মাল বহন করা হইয়া থাকে।

জোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম ১৯ মাইল

আমরা আর দেরী না করিয়া রওনা হইলাম। জোশীমঠ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ২ মাইল রাস্তা খাড়া উৎরাই। বিষ্ণুগঙ্গার উপর যে লৌহ নির্ম্মিত সেতু ছিল তাহা বন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন দড়ির ঝোলা আছে কিন্তু তাহার উপর দিয়া পার হওয়া অত্যন্ত বিপদজনক। এই ঝোলার নিকটে আবার একটা কাঠের সেতু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুগঙ্গার মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের উভয় পার্শে কাঠ ফেলিয়া ছোট ছোট ডালপালা বাঁধিয়া কোনও প্রকারে সেতু করিয়াছে। আমরা ইহার উপর দিয়াই পার হইলাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

এখানে পৌঁছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী একখানি জরাজীর্ণ ঘরে রন্ধনের জোগাড় করিতেছেন। প্রমথ বাবুরা অপেক্ষাকৃত একটু ভাল স্থানে একটী ঘরের বারোন্দায় রান্নার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সাধুজীকে এত দেরীতে পৌঁছিতে দেখিয়া তিনি ত তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার সঙ্গে যেন তিনি রাস্তায় বৃথা সময় না কাটান তাহা বলিয়া দিলেন। সাধুজী তাঁহার কথাগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে গলাধ করিয়া ফেলিলেন। এ স্থানে একখানা মিঠাইর দোকান আর একখানা আটা ডাইলের দোকান আছে অপর কোন গৃহ নাই। আর যাত্রীরাও কেহ এখানে রাত্রি বাস করে না।

বিষ্ণুপ্রয়াগ বদরিকাশ্রম মহাতীর্থে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। এই দুই গঙ্গার সঙ্গম-স্থলের উপরে উচ্চ প্রস্তরময় স্থানে একটী ছোট মন্দির, তথায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দির হইতে ছোট ছোট সিঁড়ি পাহাড় কাটিয়া সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ইন্দোরের রাণী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গমস্থলে স্নান করিবার জন্য সিঁড়ির দুইধারে দুইটী লৌহনির্ম্মিত শিকল আছে। এখানে স্নান করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। এই সিঁড়ির শেষ সীমা ঠিক সঙ্গমস্থলে না হইয়া একধারে অলকানন্দার পারেই শেষ হইয়াছে। জলের কি ভীষণ তরঙ্গ, উভয় নদী পর্ব্বত মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আমার মনে হইল বিষ্ণুপ্রয়াগ অপেক্ষা রুদ্রপ্রয়াগের জলের বেগ ভীষণ হইতে ভীষণতর। আমি ঘটি দিয়া জল উঠাইয়া

স্নান করিলাম। প্রমথ বাবু কিন্তু কোমর জলে নামিয়া এক হস্তে শিকল ও অপর হস্তে ঘাট-পুরোহিতকে ধরিয়া স্নান করিলেন। জল এত ঠাণ্ডা যে গায় দিলেই কন্ কন্ করিয়া উঠে। শান্তিকে আর স্নান করাইলাম না, কারণ তাহার গত কল্য জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গমস্থলের জল ঘটিতে করিয়া নিয়া তাহার মস্তকে স্পর্শ করাইলাম। যে প্রকার সঙ্কীর্ণ সিড়ি ও জলের বেগ তাহাতে আমার বোধ হয় না যে সকল যাত্রীরাই এত নিম্নে নামিয়া এই স্রোত বেগে স্নান করিতে সাহস করে। আমরা তর্পণ ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক উপরে উঠিলাম এবং বিষ্ণু দর্শন করিয়া চটির ভগ্ন গৃহে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। পাকের জন্য ঝরণার জল ব্যবহার করিলাম। গঙ্গার জল এত ঘোলা যে খাওয়া যায় না। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে পুনরায় রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে চতুর্দ্দিগের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এখান হইতে রাস্তা অত্যন্ত কঠিন। যেমন কেদারনাথের রাস্তা গৌরীকুণ্ড হইতে কঠিন সেই প্রকার বদরিকাশ্রমের রাস্তা বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে কঠিন। নিতি-পাসের জন্য গবর্ণমেণ্টের রাস্তা জোশীমঠে শেষ হইয়াছে কাজেই এ দিকে আর তাঁহাদের বড় একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এখান হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত রাস্তা রাওল সাহেবের ব্যয়ে মেরামত হইয়া থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ পরিদর্শন করিয়া থাকে। পর্ব্বতের ঢালু গাত্র দিয়া পাহাড় কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ হইয়াছে। দুই ধারে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর, মধ্যে মধ্যে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। পাহাড়ের গায় লতা পাতা ছাড়া কোন বড় বৃক্ষ নাই। পর্ব্বতোপরি প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড মধ্যে মধ্যে নিম্নে গড়াইয়া পতিত হয়। আমাদের সম্মুখে এ প্রকার এক খণ্ড শিলা

পতিত হইয়াছিল ভাগ্যে সড়িয়া গিয়াছিলাম নচেৎ আর রক্ষা ছিল না।

বলদোড়া—চটি বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে ১ মাইল। দেখিলাম ইহা শূন্য পড়িয়া আছে। পরে আরও প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইয়া অলকানন্দার উপরে একটী লৌহ নির্ম্মিত সেতু পার হইলাম। এখান হইতে অলকানন্দার দক্ষিণ তীর দিয়া রাস্তা অল্প অল্প চড়াই, এবং অপরিসর। সেতু পার হওয়ার পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল আমরা ভিজিতে ভিজিতে কিছু দূরে যাইয়া একটী গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এ রাস্তায় দেখিলাম আরও কয়েকটী গুহা আছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তা খুবই সঙ্কীর্ণ। একধারে গগনভেদী পর্ব্বত অপরধারে বহু নিম্নে অলকানন্দা। আমরা আরও অগ্রসর হইয়া দেখি প্রমথ বাবুর মাতার ঝাঁপানওয়ালারা এক স্থানে বসিয়া তামাক খাইতেছে, কৃষ্ণাও তাহাদের দেখাদেখি তথায় বসিয়া গেল, আমি আর দেরী না করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলাম। শান্তি ও কৃষ্ণার সঙ্গে বসিয়া থাকিল।

ঘাট চটি—আজ আমি সকলের পূর্ব্বেই ঘাট চটিতে পৌঁছিয়া রাত্রি বাসের জন্য ঘর ঠিক করিয়া নিলাম। পরে একে একে সকলেই আসিলেন, কৃষ্ণা ও শান্তি আর আসে না। মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। মনে হইতে লাগিল ফিরিয়া যাই, শান্তিকে দেখিয়া আসি, এই প্রকার উদ্বেগ চিত্তে রাস্তার দিগে চাহিয়া আছি এমন সময় দেখি কৃষ্ণা আসিতেছে। প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল।

শান্তি বলিল "কৃষ্ণা তাহার লাঠি দ্বারা আমাকে গুতা মারিয়াছে।" কৃষ্ণাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল।

শান্তি কখনও এ প্রকার নালিষ করে নাই। কৃষ্ণার উপর বড়ই রাগ হইল, তাহাকে অনেক গালাগালি করিলাম, প্রমথ বাবু আমাকে

থামাইয়া দিলেন নচেৎ আরও অনেক হইয়া যাইত। একজন দোকানদার বলিল যে বদরীনারায়ণ যাইয়া ইহাকে পুলিশে দেওয়া উচিৎ। কিন্তু আমি আর তাহা করি নাই।

এই চটিতে ৪।৫ খানা ঘর আছে কিন্তু সবই খালি পড়িয়া আছে। অলকানন্দার তীরে একটুকু সমতল স্থানে অবস্থিত।

একজন মাত্র দোকানদার। এখানে একখানা শিলাজতুর দোকান আছে। দোকানদারের বাড়ী আলমোরা, শীঘ্রই সে দেশে চলিয়া যাইবে। এখানে এক সের শিলাজতু ক্রয় করিলাম। ইহা পর্ব্বত গাত্রের এক প্রকার রস এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর। অনেক পরিশ্রমে ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। হিমালয়ের রাস্তার মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য ঔষধ, শিকড় ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বিশাল পর্ব্বত গাত্রে কত মৃত সঞ্জীবনী তুল্য ঔষধ রহিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। শিলাজতু হিমালয়ের অনেক চটিতে পাওয়া যায়।

রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। বলদোড়া হইতে ঘাট চটি ৩ মাইল। জোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত মাইল পোষ্ট নাই।

৩০ দিবস, ২৬ আষাঢ়

বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে ঘাট চটি পর্য্যন্ত কোনও জন-প্রাণীর সাক্ষাৎ পাই নাই—রাস্তা খুবই কঠিন কোনও লোকালয় নাই, কেবল আকাশ ভেদী পর্ব্বত মালা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়াইয়া আছে। অলকানন্দার অপর পার হইতে ঠিক খাড়া পাহাড় উঠিয়াছে। এসব পাহাড় এ প্রকার গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে দেখিলেই প্রাণে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। এখান হইতে হনুমান চটি পর্য্যন্ত অলকানন্দার

বাম তীরের পর্ব্বত গুলির চূড়া অন্যান্য পর্ব্বতের ন্যায় নহে। মাথা গুলি সকলই চোখা যেন ভীষণাকৃতি শিবলিঙ্গ গুলি দাঁড়াইয়া আছে।

ঘাট চটি হইতে পাণ্ডুকেশ্বর পর্য্যন্ত বেশী চড়াই উৎরাই নাই। অলকানন্দার পার দিয়া রাস্তা, মধ্যে মধ্যে বিস্তর ডাঁটার ক্ষেত। কিছু দূরে **কাক ভুষণ্ডী ও লোকপাল তীর্থে** যাওয়ার রাস্তা। অলকানন্দার উপর দিয়া একটি কাষ্ঠ সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। পাহাড়ী লোক ও আহার্য্য বস্তু সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। আমারা আর তথায় যাই নাই।

পাণ্ডুকেশ্বর

ঘাট চটি হইতে এস্থান ২ মাইল। এখানে অনেক গুলি চটির ঘর আছে কিন্তু সবই শূন্য পড়িয়া আছে। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দুইটী মন্দির পাশাপাশি। প্রথমে আমরা যোগবদ্রীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বদ্রীনারায়ণ দর্শন করিলাম। এই মূর্ত্তি অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত। এই প্রকার প্রবাদ আছে যে এই বদ্রীনারায়ণের মূর্ত্তি প্রথমে পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন পরে ইন্দ্র আবার যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণের সময় এখানে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান।

এই মূর্ত্তিটী অত্যন্ত সুন্দর এবং তাঁহার সম্মুখে অনেক গুলি শালগ্রাম শিলা রক্ষিত হইয়াছে। পূজারীকে অনুরোধ করাতে তিনি ভগবানের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দেখাইলেন পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাসুদেবের মন্দিরে ঢুকিলাম। বাসুদেবের মূর্ত্তিও ধাতু নির্ম্মিত। পাতিয়ালার মহারাজা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর মন্দিরই অত্যন্ত প্রাচীন বোধ হইল। মন্দিরের

মধ্যে কতকগুলি তাম্র ফলক আছে এবং যোগবদ্রীর মন্দিরের বাহিরে চত্বরের মধ্যে একখানা বৃহৎ তাম্র ফলক আছে। এই প্রকার প্রকাশ যে এই ফলক গুলিতে ভূমি দান সংক্রান্ত কিছু লিখিত আছে। কেহ পড়িতে পারে না। এইস্থানে পাণ্ডুরাজা তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডুকেশ্বর নাম হইয়াছে এবং এখানেই পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা আছে, তথায় সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। নিকটে রাস্তার পার্শ্বে একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম। এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে **শেষধারা** নামক একটী জলস্রোত আছে। ইহার উপর সেতু নাই। এখানে একটী উচ্চ স্থানে সরকারী বাংলা আছে। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে শেষ নাগের একটী মন্দির, রীমা মহারাজের ধর্ম্ম-শালা, এবং আরও ২।৩ খানা ঘর আছে কিন্তু সবই শূন্য পড়িয়া আছে। আমি শাস্তিকে নিয়া এই শেষধারার পারে বসিয়া কিছু জলযোগ করিয়া নিলাম। বাম ধারে পর্ব্বত গাত্রে দুইটী গুহা আছে। পরে জানিয়াছিলাম মৌনী বাবা শীতের সময় এখানে অবস্থান করেন। ২॥ মাইল দূরবর্ত্তী রাম বাগাড় চটিতে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পাদন করি।

রাম বাগাড়—এখানে আমরা কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্ম-শালার বারেন্দায় রান্নার জোগাড় করিলাম। এই ঘর খানা একতালা। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে এবং সম্মুখে বিস্তৃত বারেন্দা। কয়েক খানা চটির ঘর ও আছে। এখানে আমরা এক টাকা সেরে চাউল খরিদ করিলাম। চটিতে একটী পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। চটি সমতল স্থানে অবস্থিত এবং ধর্ম্মশালার ঘরটী ঠিক অলকানন্দার তীরে। অপর পারে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত নদী হইতে প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ ঠিক খাড়া ভাবে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে;

আমরা বসিয়া আছি এমন সময় দেখি একটী পাহাড়ী রমণী ক্রন্দন করিতে করিতে ধর্ম্মশালার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইলাম যে তাহার একটী মহিষ হারাইয়া গিয়াছে, যদি না পাওয়া যায় তবে পর্ব্বতে ভল্লুকে মারিয়া ফেলিবে। এথানে ভল্লুকে গরু, মহিষ মারিয়া ফেলে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দেখিলাম সে তাহার স্বামীর সহিত মহিষ নিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। মহিষটা জঙ্গলে হারাইয়া গিয়াছিল এবং বিস্তর অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম-শালার প্রকাণ্ড বারেন্দায় এক ধারে আমাদের এবং অপর ধারে প্রমথ বাবুদের রান্না হইতেছে এমন সময় দেখি একজন "পুরবিয়া" তথায় ঢুকিয়া প্রমথ বাবুদের দিগে যাইতেছে। সাধুজী তখনই বাধা দিলেন কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে, সে লোকটী বল পূর্ব্বক সেই ধারে যাইবেই কিছুতেই কথা মানে না তখন তাহার সহিত বচসা ও ধাকা-ধাক্কি আরম্ভ হইল। পুরবিয়া ত ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিল, কেন সে ধর্ম্মশালার যত্র তত্র যাইতে পারিবে না। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাহাকে আমার নিকট বসাইয়া তামাক সেবন করিতে বলিলাম তখন তাহার রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল কিন্তু সে সাধুজীকে অভিসম্পাৎ করিতে ছাড়িল না। অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানের লোককে "পুরবিয়া" বলে। এই লোকটির এক হস্ত নাই। সাধুজী বলিলেন যে এক হাতেই এত যদি দুই হাত থাকিত তবে ত আজ খুনাখুনী হইয়া যাইত। সে বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সঙ্গে একখানা কম্বল মাত্র সম্বল, আর কিছুই নাই।

দুই ছিলম্ তামাক শেষ করিয়া সে আস্তে আস্তে পৃষ্ঠ পরিদর্শন করিল। আমরাও হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম।

ঘাট চটি হইতে এ পর্য্যন্ত রাস্তা মন্দ নয়, প্রায় সমতল তবে শেষ ধারার পরে কিছু স্থান অল্প অল্প চড়াই। শান্তির আর অন্ত নাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিছু দূরে যাইয়া অলকানন্দার উপর দিয়া লৌহ নির্ম্মিত ঝুলান সেতু পার হইলাম। ইহার পর রাস্তা খারাপ ও নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে চড়াই ও আছে। হনুমান চটি হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান থাকিতে আবার চড়াই উঠিতে হয়। এবার এক একটা বৃহৎ প্রস্তরের উপর দিয়া রাস্তা। ঘৃত গঙ্গা নামক একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া চটিতে উপস্থিত হইলাম। ঘৃত গঙ্গা অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। এই নদীর জলই সকলে ব্যবহার করিয়া থাকে। চটি হইতে অলকানন্দা বহু নিম্নে।

হনুমান চটি

আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমের রাস্তার শেষ চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালার দ্বিতলের বারেন্দায় আশ্রয় নিলাম। এখানে দেখিলাম দুই খানা মিঠাই এর দোকান আছে তথায় গরম পুরী পাওয়া যায়। দোকানদার পুরী ভাজিতেছে, আমরা তাহার জন্য অর্ডার দিলাম। দোকানে লাড্ডু ও পেয়ারা পাওয়া যায়। এখানে আরও ৪।৫ খানা ঘর, একখানা শিলাজতুর দোকান, এবং হনুমানজীর মন্দির আছে। মন্দিরে হনুমানজীর এক প্রস্তরের বৃহৎ মূর্ত্তি। ঘৃত গঙ্গার উপর কাঠের সেতু আছে। হনুমান চটির দক্ষিণ ধারে যে পর্ব্বত আছে তথায় মহারাজ মরুৎ দেবতাগণ সহিত এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞের স্থানটী পথি-পার্শ্বে একটী সামান্য উচ্চ স্থানে গৃহের মধ্যে স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়া থাকে। এখানে হোম করিতে যাত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে।

পাণ্ডারা বলেন যে পাহাড়ের অনেক স্থান খনন করিলে এখনও দগ্ধ যব ও তিলের অঙ্গার পাওয়া যায়। এই চটির পার্শ্বস্থিত পাহাড়ে ষষ্টি সহস্র বৈখানস মুনি দিগের আশ্রম ছিল। চটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দেখিলাম একটী পার্ব্বত্য রাস্তা উচ্চ পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। চড়াই উঠিতে উঠিতে শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে কাহারও সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। স্কন্দ-পুরাণ মতে ইহা বৈখানস তীর্থ।

বদরিকাশ্রমের দক্ষিণে গন্ধ-মাদন পর্ব্বত। হনুমানের সহিত এই পর্ব্বতের যে কত নিকট সম্বন্ধ তাহা রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। গন্ধ-মাদন পর্ব্বত উত্তোলন করিবার সময় অনেক প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছিল এবং এই জন্যই বোধ হয় পর্ব্বতের বড় বড় প্রস্তর সকল চটির নিকটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। বড় বড় প্রস্তর সকল এ ভাবে পড়িয়া থাকিতে আর কোথাও দেখি নাই। সম্ভবতঃ এই জন্যই এই চটির নাম হনুমান চটি হইয়াছে।

রাত্রিতে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল সে জন্য বারেন্দার সামনে কম্বল টানাইয়া দিলাম। সাধুজী ও আমাদের নিকটে শয়ন করিলেন। তিনি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রিতে নিকটস্থ পর্ব্বত-মালা কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকাতে বেশ শীত অনুভব করিতেছি।

৩১ দিবস, ২৭ আষাঢ়, সোমবার

প্রত্যূষে ৬টার সময় রওনা হইলাম। গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পাণ্ডার গোমস্তা বলিলেন যে ৯টার মধ্যে বদরিকাশ্রম পৌঁছিতে হইবে কারণ দেরী হইলে নারায়ণের মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং আমাদের আর সকালে নারায়ণ দর্শন

ঘটিবে না। আমরাও তাড়াতাড়ি হাটিতে লাগিলাম। চটি হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে আমরা একটী কাঠের সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা পার হইয়া দক্ষিণ তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম। আবার কিছু ব্যবধানে পুনরায় লৌহ নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া অলকানন্দা পার হইয়া বাম তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে অনেক গুলি ঝরণা দেখিলাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে আমরা বরাবরই গিরি সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি কাশী নরেশের ম্যানেজার বাহাদুর একখানা ডাণ্ডীতে বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সাধারণতঃ চারি জন লোকে ডাণ্ডী বহন করিয়া থাকে কিন্তু এস্থলে ৮ জন লোকে তাঁহাকে বহন করিয়া যাইতেছে এবং আরও ৮ জন লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। একদল পরিশ্রান্ত হইলে অপর দল বহন করিবে। আমি তাঁহাকে "জয় বদরি বিশাল লালজীকা জয়" বলিয়া সম্ভাষণ করিলাম কিন্তু তিনি একবার ভ্রুক্ষেপও করিলেন না এবং মাথা তুলিয়া গরীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিলেন না। আর তিনি কেনই বা করিবেন? তিনি কাশী নরেশের ম্যানেজার অর্থের অভাব নাই। ৮ জন লোকে তাঁহাকে বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে আর আমি মলিন বেশে পদব্রজে চলিয়াছি এবং যষ্টি ভর করিয়া মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতেছি। কাহার সঙ্গে কিসের তুলনা? রাজা আর ভিখারী।

কলি চয়েরা মনে করে ধর্ম্ম এখন অর্থ, বিবেক এখন স্বার্থ। তিনি যে ভূস্বর্গের নারায়ণ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য তিনিও অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং যে নারায়ণকে দর্শন করিয়া তিনি মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সেই নারায়ণের নিকট তিনি আমি সমান,

তাঁহার নিকট ধনী, নির্ধনী সকলই সমান, তাঁহার নিকট অর্থের গৌরব নাই। দীন ব্যক্তি যদি চিরদিন দুঃখেই কাটাইত, রোগী যদি বরাবরই রোগ ভোগ করিত, আলোক বা অন্ধকার যদি সম ভাবেই পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিত, যৌবন যদি বার্দ্ধক্যে পরিণত না হইত তবে কে জানে জগৎ চলিত কিনা? আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের রাজ্যে কত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি তবুও আমাদের চক্ষুর পরদা খোলে না, তবুও আমরা সংসারের প্রহেলিকা বুঝিতে পারি না।

হনুমান চটি হইতে বদরিকাশ্রম ৫ মাইল, ইহার মধ্যে প্রায় ৪ মাইল রাস্তাই চড়াই তবে কেদার নাথের রাস্তার ন্যায় নহে এবং এই রাস্তা চলিতে আমাদের বিশ্রাম করিতে হয় নাই। শরীর ক্লান্ত হইলেও মন ক্লান্ত হয় নাই কেবলই মনে করিতেছি কতক্ষণে বদরীনারায়ণ দর্শন করিব। মাতা ঠাকুরাণী আস্তে আস্তে চলিতেছেন এবং সকলের পিছনে পড়িয়া আছেন।

রাস্তাতে একটী বেগবতী ঝরণা পার হইতে হইল। একখানা কাষ্ঠ ফেলান ছিল কিন্তু বৃষ্টিতে তাহা ধোয়াইয়া নিয়া গিয়াছে। একজন চৌকিদার বসিয়া আছে সে সকলকে পার হওয়ার সময় সাহায্য করিতেছে। প্রমথ বাবুর ঝাঁপানওয়ালারা আমাদের সকলকেই একে একে পার করিয়া দিল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আমাদের চড়াই এর রাস্তা শেষ হইল। এখান হইতে রাস্তা সমতল এবং নারায়ণের মন্দির এক মাইল ব্যবধান হইবে। এখান হইতে মন্দির দেখা যায় কিন্তু আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে আমরা কিছুই দেখিতে পারিলাম না। আমি এখানে উপস্থিত হইয়া দেখি প্রমথ বাবুর মাতার ঝাঁপানওয়ালারা ঝাঁপান মাটিতে রাখিয়া বুড়ীকে বলিতেছে "মাইজী হিয়া উতার যাইয়ে" কারণ এখান হইতে

সকলকেই বদরিকাশ্রমে হাটিয়া যাইতে হয় কিন্তু তিনি আর কিছুতেই নামিলেন না।

এখান হইতে বদরিকাশ্রমের দৃশ্য অতি চমৎকার। ভীষণ পাহাড়ের পাদ দেশে একখানা ছবি। সেই কথা পরে বলিব। আমি শান্তিকে নিয়া শীঘ্র শীঘ্র হাটিতে লাগিলাম। প্রথমে পাইলাম হাস্পাতাল, থানা ও সরকারী ডাক বাংলা, পরে অলকানন্দা পার হইলাম। অল্প ব্যবধানে আবার ঋষি গঙ্গা পার হইয়া ১টার সময় বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলাম। হনুমান চটি হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত দুইটী কাষ্ঠের ও একটী লৌহ সেতু দিয়া অলকানন্দা পার হইতে হয় এবং এই শেষোক্ত কাষ্ঠ সেতু ঋষি গঙ্গার উপর।

বদরিকাশ্রম

ত্রিলোকের মধ্যে দুর্লভ বদরিকাশ্রম নামক মহাতীর্থে আজ সশরীরে উপস্থিত হইলাম। বহু বৎসরের কল্পনা জল্পনা আজ পরিপূর্ণ হইল। মনে যে কত আনন্দ তাহা ব্যক্ত করার সাধ্য নাই। কিন্তু একটী বিষয় যখনই মনে হয় তখনই হৃদয়ের অবসাদ আরম্ভ হয়, মনের বল কমিয়া যায়, সেই সুখ স্মৃতি এখনও ভূতলের অতুল তীর্থ বদরিকাশ্রমে বসিয়া যখন মনে হয় তখন হৃদয়ের তন্ত্রী সকল ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহার স্নেহের পুত্তলী শান্তিকে বক্ষে করিয়া দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে আজ বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শোক তাপ দগ্ধ সংসারি লোকের পক্ষে হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আনয়ন করিতে ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তীর্থ ভ্রমণই পরম ঔষধ আর বদরিকাশ্রমের মত তীর্থের ত কথাই নাই।

ন কাশী ন তথা কাঞ্চী মথুরা ন তথা গয়া।

প্রয়াগশ্চ তথাযোধ্যা নাবন্তী কুরু জাঙ্গলম্॥

কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, গয়া, প্রয়াগ, অযোধ্যা, অবন্তী ও কুরুক্ষেত্র তীর্থ বদরিকাশ্রম মহাতীর্থের ন্যায় পুণ্য জনক নহে।

পৃথিবীতে স্বর্গেও রসাতলে বহু বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী তীর্থ সদৃশ তীর্থ আর হয় নাই ও হইবে না।

আমি শান্তিকে নিয়া আমাদের দলের সর্ব্বাগ্রে বদরীনাথের পুরীতে প্রবেশ করিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণীও আমাদের পশ্চাৎ আসিলেন। প্রমথ বাবুরা আরও পশ্চাৎ ধীরে ধীরে আসিতেছেন

কারণ তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী অলকানন্দার সেতুর নিকট ঝাঁপান হইতে নামিয়াছেন এবং আস্তে আস্তে হাটিয়া আসিতেছেন। সর্ব্ব প্রথমে দেখি একখানা বারেন্দায় একজন লোক একখানা খাতা লইয়া বসিয়া আছে, যাত্রীদের নাম ধাম লিখিয়া রাখে। আমাদের ও নাম ধাম লেখা হইল। আমরা বাজারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কুয়াসায় সমস্ত ঘর বাড়ী ঢাকিয়া রহিয়াছে। দূরের জিনিষ কিছুই দেখা যায় না।

নারায়ণের মন্দির যে কোথায় তাহা আর ঠিক করিতে পারি না। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়া দিল সিধা চলিয়া গেলেই মন্দির পাওয়া যাইবে। অল্প কিছু দূর গিয়াই দেখি বাম ধারে একটী উচ্চ স্থানে মন্দির। আমি সিড়ি দিয়া উঠিয়া সিংহ দ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের দরজা তখনও খোলা ছিল, আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া তখনই ঢুকিয়া পড়িলাম।

আমার নারায়ণ দর্শন

ভগবানের মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বারেন্দা, ইহার তিন ধারে প্রশস্ত দরজা। দ্বিতীয় ভাগের দরজার সম্মুখে এক খানা কাষ্ঠ আড়াআড়ি ভাবে আছে। যাত্রীর ভীড় হইলে এই কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট দাড়াইয়া ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। এই দরজা পার হইয়া দ্বিতীয় ভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং পরে আরও একটী দরজা পার হইয়া তৃতীয় ভাগে প্রবেশ করিতে হয়। তৃতীয় ভাগে বদরীবিশাল, বদরীনাথ বা বদরীনারায়ণ পদ্মাসনে সমাধি মগ্ন। মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রায় ৩ ফিট উচ্চ। দক্ষিণে কুবের, ও নারদের মূর্ত্তি, বাম পার্শ্বে নর ও নারায়ণের মূর্ত্তি, এবং সম্মুখে উদ্ধব ও

গরুড়ের মূর্ত্তি। ভগবানের মস্তকে একটী স্বর্ণ মুকুট এবং মুকুটের মধ্য স্থলে একখানা বৃহৎ হীরক ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মস্তকের উপর একটী স্বর্ণ ছত্র আছে। যে সিংহাসনে ভগবান ও অন্যান্য সকল মূর্ত্তি স্থাপিত তাহা রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মূল্য প্রায় ৪০০০৲ টাকা, মধ্যে মধ্যে পদ্ম ফুলের ন্যায় স্বর্ণের ফুল বসান আছে।

আমরা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপরূপ বিষ্ণু মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। এই প্রকোষ্ঠটী ছোট দৈর্ঘ্যে ২৪ ফিট ও প্রস্থে ১৮ ফিট। শান্তিকে বলিলাম "শান্তি, নারায়ণ দর্শন করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর—ভগবানকে প্রণাম কর ও হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।" আমরা নির্নিমেষ নয়নে ভগবানকে দেখিতেছি এমন সময় একজন বৃদ্ধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে নারায়ণের মন্দিরের বারেন্দায় প্রবেশ করিয়া বলিল "কোথা মোর বৈকুণ্ঠনাথ" এই কথা বলিয়া সে প্রায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। মন্দিরের একজন কর্ম্মচারী বলিল "মাই, ঠাণ্ডা হয়ে দর্শন দিলেগা।" সেই বৃদ্ধার দিকে আমি আর তাকাইবার অবসর পাই নাই। আমি ভাবাবেশে নারায়ণ দর্শন ছাড়িয়া অন্য দিগে তাকাইবার ইচ্ছা করিলাম না। আজ ভূস্বর্গে শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দর্শন করিয়া মানব জনম্ সফল করিলাম।

বদরীনারায়ণের মন্দিরে কয়েকটী ঘৃত বাতি জ্বলিতেছে। ধূপ ধুনাদির গন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর আমোদিত। ভগবানের মূর্ত্তি চন্দনে আচ্ছাদিত এবং গলদেশে বন্য তুলসীর ও পুষ্পের মালা। আমরা তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দরজার নিকট হইতে নারায়ণ দর্শন করিলাম ভিতরে প্রবেশাধিকার নাই। কেবল রাওল সাহেব এবং একজন সহকারী ব্যতীত আর কেহ নারায়ণের প্রকোষ্ঠে ঢুকিতে পারে না। এই সহকারী ব্যক্তি কেবল কাজ কর্ম্মে সাহায্য করিয়া থাকেন কিন্তু

নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারেন না। দরজার সম্মুখে একটী কাষ্ঠের বৃহৎ বাক্স আছে তাহা তালাচাবি দ্বারা বন্ধ, উপরে একটী ছিদ্র আছে তাহা দ্বারা নারায়ণের প্রণামী বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহা মন্দিরের তহবিলে জমা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতর দরজা ব্যতীত আলোক যাইবার বন্দোবস্ত নাই। ঘৃত ও কর্পূরের দীপালোকের সাহায্যে বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে হয়। যে সব বাতি প্রজ্বলিত থাকে তাহাতে নারায়ণের মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

পরে এক দিবস রাওল সাহেবকে বলাতে তিনি ভাল করিয়া বাতি জ্বলিয়া বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। সকলে বলে এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজ কিন্তু আমি দ্বিভুজই দেখিলাম। হস্ত দুইখানা চেপ্টা বক্রভাবে আসিয়া ক্রোড় দেশে স্থাপিত। অন্য দুই বাহু নাই অথবা দেখা যায় না। মন্দিরের ধর্ম্মাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনিও বলিলেন দুই হস্তই দেখা যায়। মস্তক আছে কিন্তু চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ নাই, কেবল রেখা মাত্র আছে। ধর্ম্মাধিকারী বলিলেন এই মূর্ত্তি বিশাল শালগ্রাম শিলা ইহা মনুষ্যের নির্ম্মিত নহে। বহু পূর্ব্বে তিব্বতীয়েরা পূজা করিতেন, পরে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অলকানন্দার মধ্য হইতে এই মূর্ত্তি উত্তোলন পূর্ব্বক এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

নারায়ণের মন্দির পূর্ব্ব মুখে। একটী চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। মন্দির হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্মীদেবীর একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া আমরা প্রণাম করিলাম। এই মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে দক্ষিণধারে অবস্থিত। নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে গরুড় ও মহাবীরের প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। একজন লোক প্রত্যূষে আসিয়া এই গরুড়ের মূর্ত্তি কাপড়, মালা প্রভৃতি দ্বারা বেশভূষা করাইয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করে। আবার সন্ধ্যার সময় সকল কাপড় চোপর খুলিয়া মূর্ত্তিটী উলঙ্গ

ভাবে রাখিয়া চলিয়া যায়। বেশ ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে! যাত্রীরা সকলেই এক পয়সা অর্দ্ধ পয়সা যে যাহা দেয় তাহাতেই লোকটীর দিন চলিয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে একস্থানে একটী গণেশের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের বামধারে ঘণ্টাকর্ণের মূর্ত্তি আছে। যে সিংহদ্বার পার হইয়া আমরা প্রাঙ্গণে আসিয়াছি তাহা খুব বৃহৎ এবং সিংহদ্বারের ঘরটী দ্বিতল তথায় সাধু সন্ন্যাসীরা থাকেন।

বদরীনারায়ণের মন্দির একটী উচ্চস্থানে অবস্থিত রাস্তা হইতে প্রায় ১৫।২০ ফিট উচ্চ। এই স্থান সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১০,২৮৪ ফিট উচ্চ। মন্দিরের উচ্চতা ৫০ ফিট। শঙ্করাচার্য্য যে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আর এখন নাই। বরফের চাপে অনেকবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত ও চূণ সুরকির গাঁথা। মন্দিরের মস্তক একটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চন্দ্রাতপ এবং সোণার পাতদ্বারা মণ্ডিত, তদুপরি একটী স্বর্ণকলসী বসান। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ তামার পাত দিয়া মণ্ডিত। প্রদক্ষিণের জন্য মন্দিরের চতুর্দ্দিকে রাস্তা আছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে এক ধারে লক্ষ্মী দেবীর ভাণ্ডার আছে। লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া একটী রাস্তা ধর্ম্মশালার দিকে গিয়াছে। ইহার পার্শ্বে রন্ধনশালা, এখানে বদরী-নারায়ণের ভোগ রান্না হয়। চারিধারে দেওয়াল আছে, কিন্তু উপরে ছাদ নাই, এইভাবেই বহুবৎসর যাবৎ চলিতেছে, উপরে ১৩ খানা করগেটেড্ টিন ফেলিয়া রাখিয়াছে। লক্ষ্মীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে নূতন রন্ধনশালা নির্ম্মাণ হইতেছে, এখনও উপরের ছাদ নির্ম্মান হয় নাই।

আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কালীকম্‌লী বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহা মন্দিরের খুব সন্নিকট। ঘরখানা দ্বিতল

সামনে ছোট একখানা বারেন্দা। ঘরে দরজা খিরকী সবই আছে। এই একখানা ঘরেই আমরা সকলে বিছানা পাতিলাম। ধর্ম্মশালা ও পাণ্ডার নিকট হইতে আমরা গালিচা কম্বল প্রভৃতি পাইলাম। প্রমথ বাবুরা স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিবার পর আমি স্নান করিতে চলিলাম।

বদরীনারায়ণের মন্দিরের সিংহদ্বারের নিম্নস্থ রাস্তা হইতে কয়েকটী সিড়ি নামলেই "তপ্তকুণ্ড"। এই সিড়ির বামধারে রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং দক্ষিণ ধারের একখানা ঘরে ছোট রাওল সাহেব থাকেন। সিড়ির শেষভাগে "গরুড় শিলা" ও নিকটে তপ্তকুণ্ড। এই কুণ্ডটী ১৬ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট চওড়া। একটী গরম জলের ও একটী শীতল জলের ধারা ইহার মধ্যে পড়িতেছে এবং উদ্বৃত্ত জল অলকানন্দায় যাইয়া পড়িতেছে। গরমজলের ধারার তাপ ১২০° ডিঃ ফারেন হাইট।

গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশ্রিত না হইলে ইহাতে স্নান করা যাইত না। এই তুষারের রাজ্যে এই উষ্ণ জলে স্নান করিতে বেশ আরামজনক। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যদের শীতের কষ্ট নিবারণ নিমিত্ত যোগ বলে এই উষ্ণ প্রস্রবণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার যোগবল। এই উষ্ণ প্রস্রবণ না থাকিলে এখানেও কেদারের ন্যায় স্নান করা দুরূহ ব্যাপার হইত। অলকানন্দার জল এত ঠাণ্ডা যে তাহাতে স্নান করা এক প্রকার অসম্ভব অন্ততঃ কলিকাতাবাসীরা তাহাতে কিছুতেই স্নান করিতে পারে না। এই তপ্তকুণ্ডের উপরিভাগে তক্তার একখানা ছাদ আছে। কুণ্ডটী প্রস্তর দিয়া বাঁধান। আমি এই কুণ্ডে বেশ আরামের সহিত স্নান করিলাম। এই কুণ্ডে অগ্নিদেব বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে অবস্থান করিতেছেন। তৎপর ইহার সন্নিকট "নারদকুণ্ডে" যাইয়া তর্পন করিলাম। নারদকুণ্ড অলকানন্দার মধ্যে একটী বক্রস্থানে অবস্থিত। জলের বেগ এত প্রবল

যে এখানে স্নান করা মনুষ্যের অসাধ্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই কুন্দ হইতেই বদরীনারায়ণের বিগ্রহ দশবার ডুব দিয়া নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন।

নারদকুণ্ডে স্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"নারদীয় হ্রদে স্নাত্বা নভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ"।

কুণ্ডের উপরিভাগে একটী বৃহৎ শিলা আছে, তাহাকে "নারদশিলা" বলে। তীর হইতে একটী শিলা লম্বমানভাবে নদীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রবল স্রোতকে বাধা দিতেছে। এই ঘাটে একজন ঘাট-পুরোহিত আছেন। নারদকুণ্ডের একটু বাম ধারে "সূর্য্যকুণ্ড" নামক একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, এখানে কোন কুণ্ড নাই, পর্ব্বতগাত্রের ছিদ্র দিয়া জল নির্গত হইয়া অলকানন্দায় যাইয়া পড়িতেছে। যাত্রীরা জল হাতে লইয়া গায় ছিটাইয়া দেয়। ইহার পর গরুড়শিলায় যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী চড়াইয়া প্রণাম করিলাম। সকল স্থানেই প্রণামী না চড়াইলে আর নিস্তার পাওয়া যায় না।

স্নান ও তর্পণান্তে ধর্ম্মশালার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখি পাণ্ডা মহারাজ বিরাট ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। খিচুড়ী, অন্ন, ডাল, বড়া, পাঁপড় ভাজা, লাড্ডু, মালপোয়া, আচার, মিঠাই ইত্যাদি। এই তুষার-রাজ্যে এইপ্রকার বিপুল আয়োজনের কখনই আশা করি নাই। প্রমথ বাবু বলিলেন "আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছি আপনি মহাপ্রসাদ বিতরণ করুন"। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমি প্রমথ বাবুকে বলিলাম "আজ আমার জীবন ধন্য হইল, বদরীক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া আজ আমার জন্ম সার্থক করিলাম"।

আজ মহা আনন্দে সকলে একসঙ্গে বসিয়া ভোজন করিলাম। একজন

ভিখারীও আমাদের সঙ্গে বসিয়া গেল। আজ কি আনন্দ! তখনই একটুকু মহাপ্রসাদ একখানা ভোজ্যপত্রে রাখিয়া দিলাম। সেই দিনই পাত্রের মধ্যে একটুকু মহাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ডাকে পাঠাইয়া দিলাম। বাকিটুকু মাতাঠাকুরাণী অগ্নিতাপে শুষ্ক করিলেন এবং তাহা সযত্নে রাখিয়া দিলাম। বদরিকাশ্রমে বসিয়া যখন এই গরীব ভট্টাচার্য্যের কথা মনে হইত, তখনই মনটা কেমন কেমন করিত। মহাপ্রসাদ ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিবার সময় মাটিতে জল ফেলিতে নাই। মুখের জল হাতে করিয়া লইয়া পরে মাটিতে ফেলিতে হয়।

ভোজনান্তে সকলেই বিশ্রাম করিলাম। কেহ কেহ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আমি এই অবস্থায় সুদূর বঙ্গদেশে ও আসামে কয়েক-খানা পত্র লিখিয়া ডাকঘরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাকঘরে যাইতে হইলে বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রস্তর বসান পাকা রাস্তা। বদরিকাশ্রমে এই একটী মাত্র রাস্তা। দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বাজার পার হইয়া আমাদের পাণ্ডার বাসস্থানের নিকটে ডাকঘর ও তার আফিস। ডাকঘরের বাক্সে পত্র কয়েকখানা ফেলিয়া দিলাম এবং আমাদের নামে চিঠিপত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। পোষ্টমাষ্টার আফিসে ছিলেন না, তাঁহার শরীর অসুস্থ। তাঁহার কেরাণী কাজ করিতেছে। প্রমথ বাবুর ও আমার পত্রগুলি বাছিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে অনেকগুলি দোকান রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিষই পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় বলে কি বিলাসিতার দ্রব্য পাওয়া যায়? হিমালয় ভ্রমণে বিলাসিতার স্থান পায় না। ইহা পাপ ক্ষয় ও পুণ্য সঞ্চয়ের স্থান। মোটামুটি চাউল, ডাইল, আটা,

ঘৃত, লবণ, লঙ্কা ছাড়া কয়েকখানা ময়রার দোকান আছে, তথায় গরম পুরী ও পার্ব্বত্য-শাকের তরকারী পাওয়া যায়, ইহা ছাড়া কয়েকপ্রকার মিষ্টিও পাওয়া যায়। কয়েকখানা কাপড় ও কম্বলের, একখানা মেওয়ার, ১খানা সেঁকরার দোকানও আছে। এখানে যে মহিষদুগ্ধ পাওয়া যায় তাহাতে অর্দ্ধেকের অধিকই জল। এই জল মিশ্রিত দুগ্ধের সের ॥৵০, চিনি ১।০, পুরী ১৲ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। বাজারের লোকেরা কূর্ম্মধারার জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাজারের উপরের দিকে পাণ্ডাদের ঘড়বাড়ী ও ধর্ম্মশালা। এখানে সকল গৃহের ছাদে ভূর্জ্জপত্রের উপর শ্লেট পাথরের ছাউনি। মধ্যে মধ্যে তক্তার ছাউনিও আছে কিন্তু তাহা খুবই কম। এখানে কোন বৃক্ষ নাই। পাহাড়ীরা অনেক নিম্ন হইতে কাষ্ঠের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া আইসে, তাহাই জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাগলের পৃষ্ঠে করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাল এখানে আনীত হইয়া থাকে।

বদরিকাশ্রম একখানা বড় গ্রাম এবং একটী সুন্দর উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই উপত্যকার মধ্যদেশ দিয়া অলকানন্দা আঁকাবাঁকা ভাবে চলিয়া গিয়াছে। শীতের সময় ইহা তুষারাবৃত থাকে। এই উপত্যকা উত্তর দক্ষিণে লম্বা—দৈর্ঘে ৩ মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল। উপত্যকার পূর্ব্বদিকে "নর" ও পশ্চিমদিকে "নারায়ণ" পর্ব্বতদ্বয় আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাণ্ডারা বলেন কলির প্রাবল্যে এই নর ও নারায়ণ পর্ব্বতদ্বয় বক্তিত হইয়া বদরিকাশ্রম ঢাকিয়া যাইবে। এই উভয় পর্ব্বতের পাদদেশে কয়েকটী গুহা আছে, তাহাতে কাষ্ঠের দরজা দূর হইতে দেখিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভগবানের আরতি দেখিতে সকলেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শান্তিকে বলিলাম "শান্তি, ভগবানের নিকট জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাক"। আরতি শেষ হইলে দেখিলাম রাওল সাহেব বদরীনারায়ণের বেশভূষা স্থানান্তরিত করিয়া একখানা অঙ্গরেখা দ্বারা নারায়ণের দেহ ঢাকিয়া রাখিলেন।

বৈকালে বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আরতির পর আমরা যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছি তখন দেখি একজন বাঙ্গালা সাধু, পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় বাড়ী ছিল এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, মন্দিরের বাহিরে একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত আলাপে অবগত হইলাম যে তিনি মৌনীবাবার সঙ্গে ২.৩ দিবসের মধ্যে সত্যপথ দর্শন করিতে যাইবেন। মৌনীবাবা এখানে ২০।২৫ বৎসর যাবৎ আছেন। শীতের সময় শেষধারার নিকট পর্ব্বতের গুহায় থাকেন এবং বৈশাখ মাসে যখন বদরীনারায়ণের মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় তখন এখানে আসিয়া তপ্তকুণ্ডের নিকট অলকানন্দার অপর পারে একটী পর্ব্বতগুহায় বাস করেন। একদিন ধর্ম্মশালায় আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না। লম্বা চেহারা, বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে, এখনও অসাধারণ শক্তি, মাথার চুল, ও লম্বা দাড়ী সবই শুভ্র। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, শান্তিও প্রণাম করিল। বাবা কাহারও সহিত কথা বলেন না, এই জন্য সকলে তাঁহাকে "মৌনীবাবা" বলিয়া থাকে।

আমি বাবাকে বলিলাম এই ছেলেটির মা নাই, ইহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার কথা শুনিয়া বাবা হাত উঠাইয়া যে ভাবে শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে তাঁহার সমস্ত আন্তরিক ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। বাবার এই আশীর্ব্বাদ চিরজীবন মনে থাকিবে।

বদরীনারায়ণের মন্দিরের মধ্যে ও বাবাকে কয়েকবার দেখিয়াছি কিন্তু তিনি আমাদের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন নাই। তিনি একটী আঙ্গুল কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলামনা।

বদরিকাশ্রম দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এখানে আসিতে হইলে "তন, মন ও ধন" এই তিনটী জিনিষের দরকার --ইহার অভাব হইলে এই দুর্লভ তীর্থে কেহ পৌঁছিতে পারে না। "তন" শব্দের অর্থ স্বাস্থ্য। যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে তাহা হইলে এতখানের রাস্তা পদব্রজে কেহ কখনই হাটিতে পারিবেনা। স্থানে স্থানে যে প্রকার ভীষণ চড়াই ও উৎরাই করিতে হয় তাহার পরিশ্রমে ও স্বাস্থ্যাভাবে শরীরে পীড়া অবশ্যম্ভাবী। আর এ রাস্তায় Hill Diarrhoea অর্থাৎ পাহাড়ী পেটের অসুখ একটী কঠিন পীড়া। এই ব্যারামে অনেক যাত্রী প্রতি বৎসর মারা যায়। আমি যে কত লোককে পেটের ব্যারামের ঔষধ দিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। "মন" --মনের একাগ্রতা না হইলেও এখানে কেহ পৌঁছিতে পারে না। রাস্তা চলিতে চলিতে যখন দারুণ কষ্টে পতিত হইতে হয় তখন এক একবার মনে হয় যে ফিরিয়া যাই। যে এই সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে তাহারই নারায়ণ দর্শন হয়। "ধন"—এখানে আসিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে অর্থ আমরা আনিয়াছিলাম তাহা প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামনগর অথবা হরিদ্বারে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই শেষ হইয়া যায়। যাহা আমরা হিসাব করিয়াছিলাম তাহার প্রায় দ্বিগুণ খরচ হইয়াছে। শুধু যে আমাদের পাথেয় খরচ শেষ হইয়াছিল তাহা নহে আমরা যে কয়জন যাত্রীকে দেখিয়াছিলাম তাহাদের ভাগ্যেও এই দশা ঘটিয়াছিল। আবার কাহারও রাস্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্থের জন্য আত্মীয় স্বজনের

নিকট টেলিগ্রাম করিতে হয়। আবার যাহাদের ধন নাই ভিক্ষা করিতে করিতে আসিতে হয়, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ভিক্ষা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ পাওয়া যায় না। কেদারনাথ হইতে যাত্রার সময় যে একজন পাঞ্জাবী সাধুকে ভিক্ষা দিয়াছিলাম আমাদের বদরিকাশ্রমে আসিবার কয়েকদিন পরে তাঁহাকে এখানে দেখিলাম। তাঁহার শরীর শীর্ণ, না জানি তিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সালের হিতবাদীতে প্রকাশ "বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রান্তরে প্রকাশ যে বদরিকাশ্রমে একটী বরফের স্তূপ আসিয়া ৫০।৬০ জন যাত্রী বরফের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ যাত্রী বাঙ্গালী যুবা ও স্ত্রীলোক।"

এই সব কারণে বদরিকাশ্রমে আসিতে হইলে "তন, মন, ধন" এই তিনটির অভাব হইলে এখানে পৌঁছিতে পারা যায় না। বদরিকাশ্রমের দক্ষিণে ও ঋষিগঙ্গার অপরপারে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তথায় ভুটিয়ারা গ্রীষ্মের ৬ মাস বাস করে।

রাত্রিতে বাজার হইতে পুরী ও তরকারী আনিয়া আমরা আহার করিলাম। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে, খুব শীত কিন্তু কেদারনাথে যে প্রকার তাহা অপেক্ষা অনেক কম। শয়ন করিবার সময় একটী মাত্র জানালা খোলা রাখিয়া আর সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। কেদারনাথে যে প্রকার সময় সময় নিশ্বাস বন্ধের মত হইত এখানে কিন্তু সে প্রকার হয় নাই।

আমাদের পাণ্ডার নাম যুগলকিশোর রামরতন সাত ভাইয়া। আমাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা তাহাতে রাজি হয় নাই। তাঁহাদের ও ভাল ভাল ঘর বাড়ী আছে। যাঁহারা পাণ্ডার ধার ধারেন

না তাঁহারা নিজের ইচ্ছা মত বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন।

৩২ দিবস, ২৮শে আষাঢ়, মঙ্গলবার

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দিকে হাত জোড় করিয়া বিষ্ণু-নামাষ্টক স্তোত্র ও বিষ্ণুর ষোড়শ নাম পাঠ করিলাম এবং যে কয় দিবস এখানে ছিলাম প্রত্যহ এই ভাবে স্তব পাঠ করিতাম। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মন্দিরে চলিলাম। মন্দিরের দরজা ভোর ৬টার সময় খোলা হয়। আমরা মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রণাম করিলাম ও হাত জোড় করিয়া দাড়াইয়া রহিলাম। এই প্রকোষ্ঠ খানা ক্ষুদ্র এবং সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে কাজেই ভীড় ও হইয়াছে। সকলেই সংযত চিত্তে নারায়ণের মূর্ত্তি দেখিতেছে। আর বেদপাঠীরা সুললিত স্বরে ভগবানের স্তব স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। যে লোক এই মধুর সঙ্গীতধ্বনি একবার শুনিয়াছে সে আর কখনই ইহ-জীবনে ভুলিতে পারিবেনা। এ প্রকার স্তোত্র জীবনে আর কখনই শ্রবণ করি নেই। যাত্রীরা "জয় বদরীবিশাল লালকি জয়" ইত্যাদি আনন্দধ্বনিতে মন্দিরখানিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই এক মনে এক প্রাণে ভগবানের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাতজোড় করিয়া দাড়াইয়া আছে। এ এক আনন্দবাজার জীবনের বহু দিনের বাসনা পূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুত রাওল সাহেব আপন আমাত্যবর্গ, চাপরাশি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ সহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলেই একধারে সরিয়া দাড়াইলাম। তাঁহার পরিধানে পাজামা, আচকান, ও টোপ। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নারায়ণের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইতে লাগিলেন। বদরীনারায়ণের

উপর কয়েক কলসী গঙ্গাজল ঢালিলেন। পরে অন্যান্য দেবতাদেরও স্নান করাইলেন। স্নানান্তে নারায়ণের সমস্ত শরীর চন্দনদ্বারা ভূষিত করিয়া তুলসীর ও পুষ্পমালা ইত্যাদি পড়াইয়া দিলেন। নাসিকার স্থানে চন্দনের নাসিকা লম্বাভাবে তৈয়ার করিয়া লাগাইয়া দিলেন। পূজাতে কোনই আরম্বর দেখিলাম না। সামান্যভাবে নারায়ণের পূজা শেষ করিয়া ঘৃত ও কর্পূরের বাতিদ্বারা আরতি করিলেন। আরতির প্রসাদ আমরা সকলেই আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। পূজার পাত্র ও আসবাব প্রভৃতি রৌপ্য-নির্ম্মিত, কেবল রন্ধন পাত্র পিত্তলের। মন্দিরে ২ জন বেদপাঠী এবং একজন ধর্ম্মাধিকারী আছেন তাঁহারাই মন্দিরে তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দরজাতে বসিয়া বেদ, স্তব, স্তোত্র সকালে ও সন্ধ্যার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। যখন বদরীনারায়ণের স্নান হয় তখন একজন চাপরাসি বলিতে থাকে "ভগবানের নির্ব্বাণমূর্ত্তি দর্শন কর"। বেশভূষাহীন মূর্ত্তিকে নির্ব্বাণ মূর্ত্তি বলিয়া থাকে। এই নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দর্শন করা অতীব পুণ্যজনক। পূজা ও আরতি শেষ হইলে যাত্রীরা মন্দিরের বাহিরে আসেন কেহ বা মন্দিরের বারান্দার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন। রন্ধনশালা হইতে নারায়ণের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত রাস্তা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া পরে ভোগ মন্দিরের ভিতর নিয়া আসে। ভোগ আনিত হইলে মন্দিরের দরজা অল্প সময়ের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অল্প পরিমাণ ভোগ মন্দিরে আসে অন্যান্য ভোগ লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। রাওল সাহেব মন্দির হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে যাইয়া পূজা করেন এবং সকল ভোগ উৎসর্গ করিয়া দেন।

এই সব ভোগ পিত্তলের ছোট ছোট হাঁড়ীতে অন্ন, অপর কোনও প্রকার খাদ্য সামগ্রী নাই। মন্দিরে যে ভোগ হয় তাহা দুই প্রকার—

বাল্যভোগ ও অন্নভোগ। দুইটা একই সময়ে দিতে দেখিলাম। বাল্যভোগে মিষ্টান্ন ও অন্নভোগে খিচুড়া, অন্ন, বেসনের ডাল, লাড্ডু, পাঁপরভাজা, মালপোয়া, আচার ইত্যাদি। লক্ষ্মীর মন্দিরের বাহিরে যে ভোগের হাঁড়ী থাকে তাহা যাত্রীরা ক্রয় করিয়া নেয় অথবা ক্রয় করিয়া ভিখারীদের বিতরণ করিয়া দেয়। দশ আনায় এক হাড়ী অন্নে দুইজনের পরিমাণ থাকে।

গাড়োয়ালে সর্ব্বত্রই আটার রুটী প্রধান খাদ্য। কিন্তু বদরীক্ষেত্রে অন্নের বন্দোবস্ত দেখিয়া অন্নগত বাঙ্গালীর প্রাণে অপার আনন্দ হইল। এই ক্ষেত্রে অন্নেরই জয়।

এখানে প্রণামী ত্রিবিধ প্রকার—

(১) বদরীনারায়ণের মন্দিরে সকলেই ভগবানের পাদপদ্মে থালা ভেট দিয়া থাকেন। একখানা থালাতে মেওয়া, নারিকেল, চন্দন, তুলসীপত্র, ঘৃত, কর্পূর, ধুনা, হরীতকী, পৈতা, রেশমী বস্ত্র ও প্রণামী শক্তি অনুসারে সকল যাত্রীরাই ভগবানের মন্দিরে লইয়া যান। প্রণামী মন্দির মধ্যস্থ কাষ্ঠের সিন্দুকে রাখা হয়, অপর জিনিষ ভগবানের নিকট নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাওয়া যায়। অনেকে শাল, অলঙ্কার প্রভৃতিও দিয়া থাকেন।

(২) "আট্‌কা ভোগ"—যদি কেহ মহাপ্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে রাওল সাহেবের গদিতে যাইয়া টাকা জমা দিতে হয়। একখানা রসিদ পাওয়া যায়। ইহা দেখাইয়া প্রসাদ আনিতে হয়। বৈকালে টাকা জমা দিলে তৎপর দিবস সকালে পাওয়া যায়। যত মূল্যের প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হয় তাহার দ্বিগুণ টাকা দিতে হয়।

(৩) গদীভেট—ইহা রাওল সাহেব পাইয়া থাকেন। শ্রীযুত রাওল সাহেব ৺বদরীনারায়ণ দেবের পূজারী, তাঁহাকে সম্মান করার জন্য এই ভেট দিতে হয়।

রাওল সাহেবের একটী রীতিমত আফিস আছে, তথায় কয়েকজন কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা সকল হিসাব পত্র রাখেন। টাকা জমা দিলে এই কর্ম্মচারীরা রসিদ দিয়া থাকেন।

বদরীনারায়নের সিংহদ্বারের সিঁড়ির নিকট উত্তর ধারে শ্রীযুত রাওল সাহেবের গদী। একখানা বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠের চৌকির উপর সতরঞ্চ, গালিচা ও চাদর বিছান, একধারে রাওল সাহেবের জন্য গদি ও তাকিয়া আছে। এই ঘরেই কর্ম্মচারীরা লিখাপড়ার কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই বৃহৎ প্রকোষ্ঠের পাশ্চাৎধারে আর একখানা ছোট প্রকোষ্ঠ আছে তথায়ও রাওল সাহেব বসিয়া থাকেন। আমরা এই কুঠুরীতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এই প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন রাওল সাহেবের বাসস্থান। ইহা দ্বিতল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

শীতের ছয় মাস যখন বদরিকাশ্রম বন্ধ থাকে তখন এখানে কেহই থাকে না। বরফে সকল স্থান ঢাকিয়া যায় কেবল তপ্তকুণ্ডের স্থানটাতে বরফ থাকে না। এখানেও বরফ পড়ে কিন্তু উত্তাপে গলিয়া যায়। এই তপ্তকুণ্ড রাওল সাহেবের বাসস্থানের নিকট।

বর্ত্তমান রাওল সাহেবের নাম শ্রীযুত বাসুদেব নাম্বুরী। ইনি দাক্ষিণাত্যের কেরল দেশীয় ব্রাহ্মণ। ত্রিবাঙ্কুর অথবা কোচিনের রাজ দরবার হইতে রাওল নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। রাওল সাহেবের মাসিক বেতন ২০০৲ টাকা। খাওয়া পড়া দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে পাইয়া থাকেন। ইহার উপর যাত্রীরা যে গদীভেট দিয়া থাকে তাহাও তাঁহার প্রাপ্য। রওল সাহেবের একজন সহকারী রাওল আছেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় রাওল বলে। তাঁহাকেও ত্রিবাঙ্কুরের রাজ দরবার হইতে পাঠাইয়াছে। রাওলের পদ শূন্য হইলে একবার ত্রিবাঙ্কুর ও

অন্তবার কোচিনের রাজ দরবার হইতে রাওল মনোনীত করিয়া পাঠান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান রাওল সাহেব ১৬ বৎসর যাবৎ গদী পাইয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ হইবে। ছোট রাওলের নামও শ্রীযুক্ত বাসুদেব নাম্বুরী। তিনি খোরাক পোষাক ও নগদ ১২৫৲ টাকা মাসিক পাইয়া থাকেন। তাঁহার বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইবে, দিব্য গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা। তিনি অবিবাহিত। রাওল সাহেবের ন্যায় তাঁহার কোন রক্ষিতা স্ত্রী নাই এবং রাখিতেও পারিবেন না তাহা হইলে তাঁহাকে গদীচ্যুত হইতে হইবে। রাওল সাহেবের দুইটী পুত্র আলমোরাতে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। মন্দিরের জন্য আলমোরা জেলায় ৪৫ খানা সমস্ত গ্রামের ও ২৬ খানা আংশিক গ্রামের রাজস্ব এবং গাড়োয়াল জেলায় ১৬৪ খানা সমস্ত গ্রামের ও ১১১ খানা আংশিক গ্রামের রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রী প্রদত্ত অর্থে বদ্রীনারায়ণের বাৎসরিক আয় ৮৪০০০৲ হাজার টাকা। ইহা হইতে ৮০ হাজার টাকা দেব সেবায় ও অন্যান্য খরচে ব্যয়িত হয়।

রাওল সাহেবের অধীনে ১০ জন কেরাণী আছে। তন্মধ্যে ৪জন ৬ মাসের জন্য। তিহরী রাজের নিকট হিসাব নিকাশ হইয়া থাকে। মন্দিরের জন্য ১৬ জন সিপাহী ও একজন জমাদার আছে। যাত্রী বৃদ্ধি হইলে আরও অধিক সিপাহী রাখা হয়। বদরীনারায়ণের অলঙ্কার, পোষাক, পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র লইয়া সমস্ত সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার টাকা হইবে বলিয়া প্রকাশ। পাণ্ডুকেশ্বরের লোকেরাও মন্দিরের কর্ম্মচারী। তাহারা ভোগ ও পাকের জন্য কাঠ ও জল সরবরাহ করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা বৎসরে ১২০৲ পায়। তিহরী গাড়োয়ালের রাজা বদরীনারায়ণের মন্দির তত্ত্বাবধান করেন। পূর্ব্বে কাশীর রাজার

হবে এই ভার ছিল কিন্তু দুরন্ত বিধায় তিনি এই ভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

রাওল সাহেবের তত্ত্বাবধানে ২২টী মঠ আছে। এই সব মঠের মধ্যে পঞ্চবদ্রীও আছেন,।

বিশাল-বদ্রী—বদরিকাশ্রমে

যোগ-বদ্রী—পাণ্ডুকেশ্বরে

নৃসিংহ-বদ্রী—জোশীমঠে

ভবিষ্য-বদ্রী—নিতি পাশের রাস্তায় তপোবন নামক স্থানের নিকট।

বৃদ্ধ-বদ্রী অথবা ধ্যান-বদ্রী—কুমার চটির নিকট উরগম মঠে।

আদি-বদ্রী—প্রত্যাবর্ত্তনের রাস্তায় চাঁদপুর নামক স্থানে।

পঞ্চবদ্রী সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। অনেকে বলেন বিশাল-বদ্রী পঞ্চবদ্রীর মধ্যে নয়, তিনি সকলের উপর। এই পঞ্চবদ্রীর অন্তর্ভুক্ত ভূভাগকে "বৈষ্ণব ক্ষেত্র" বলা হয়।

অন্যান্য মঠের নাম যথা—

রাবেশ্বর মহাদেব—জোশীমঠ হইতে ১ মাইল রবিগ্রামে।

জ্যোতিশ্বর মহাদেব—জোশীমঠ হইতে তিনপোয়া মাইল উপরে।

বিষ্ণুপ্রয়াগ।

সীতাদেবী—জোশীমঠ হইতে ২ মাইল চাই গ্রামে।

নারায়ণ—নন্দপ্রয়াগে।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কর্ণপ্রয়াগ হইতে ৬ মাইল ব্যবধান ডিমর গ্রামে।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কর্ণপ্রয়াগ হইতে ৩০ মাইল ব্যবধান নারায়ণ বাগরে।

বদরিকাশ্রমে যে পঞ্চতীর্থ আছে তথায় সকলেরই স্নান এবং পঞ্চশিলা ও কেদারালয়ের দর্শন ও পূজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। **পঞ্চতীর্থ**

যথা—ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদধারা, তপ্ত কুণ্ড ও নারদ কুণ্ড, ইহা ব্যতীত আরও দুইটী কুণ্ড আছে সূর্য্য কুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড।

পঞ্চশিলার নাম—নারদ শিলা, বরাহ শিলা, নরসিংহ শিলা, গরুড় শিলা ও মার্কণ্ডেয় শিলা।

বদরিকাশ্রমে শ্রীহরির চরণ প্রান্তে যে স্থানে অগ্নিদেব অবস্থান করিতেছেন তথায় কেদার নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দেবের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনা করিলে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

নারদ কুণ্ডের আরও উত্তরে ব্রহ্মকপাল অথবা ব্রহ্মকপালী নামক একটী প্রধান তীর্থ আছে। এস্থানে অলকানন্দা বক্রভাবে চলিয়াছে, নদীর পার খাড়া এবং তীরভূমি প্রস্তর দ্বারা বাঁধান সমতল স্থান। এখানে সকল যাত্রীরা তাঁহাদের মৃত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। এখানে পিণ্ড দান করিলে আর কোথাও পিণ্ডদান করিতে হয় না। ইহা গয়া অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ফলপ্রদ। ইহাকে পিতৃতীর্থও বলে। পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। সর্ব্বপাপ নাশক ব্রহ্মকপাল তীর্থে পাঁচটী কুণ্ড আছে, এখানে স্নান, দান, তপস্যা ও হোমাদি সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত সমস্তই অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

এই ব্রহ্মকপাল তীর্থ উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ অন্তর্গত বদরী মহাত্ম্যে নিম্নলিখিত গল্প পাওয়া যায় :—

পূর্ব্বকালে সত্যযুগের প্রথম ভাগে ভগবান ব্রহ্মা নিজ কন্যা সরস্বতী দেবীকে রূপ-যৌবন সম্পন্না দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাকে এতাদৃশ অন্যায় কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শিব ক্রোধে খড়্গ দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক পাঁচ ভাগে ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই

ছিন্ন কপাল ব্রহ্মহত্যা স্বরূপ তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিল। যখন শিব স্বর্গে, ভূতলে ও পাতালে তপশ্চরণ ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও এই কপাল তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল না তখন তিনি লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির দর্শনার্থে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া ভগবান শ্রীহরিকে বারংবার প্রণাম করিয়া সেই করুণাময় শ্রীহরির নিকট সকল বিপদবার্ত্তা বর্ণনা করিলেন। শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে শিব যেমন বদরিকা-শ্রমে উপস্থিত হইলেন তৎক্ষণাৎ তাহার করস্থিত কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা পুনঃপুনঃ কম্পিত হইয়া অন্তর্হিত হইল এবং কপাল হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। সেই অবধি শিব এই কপাল মোচন মহাতীর্থ বদরিকাশ্রমে পার্ব্বতীর সহিত আগ্রহ সহকারে বাস করিতে লাগিলেন।

এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ অত্যুত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন। পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপাতকী ও নারকী হইলেও তাঁহাদিগের উদ্ধার হইয়া থাকে। যাঁহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রহ্মকপালতীর্থে তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করেন তাঁহাদিগের গয়া ও অন্য তীর্থ গমনের প্রয়োজন কি? তর্পণ ও পিণ্ডদানের ফল তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে।

বিশাল বদ্রীর মন্দির বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস খোলা হয় এবং কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে অথবা অগ্রহায়ণ মাসের ২।১ দিনে একটী শুভ-মুহূর্ত্তে বন্ধ করা হয়। মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী সমস্তই শীতাবাস যোশীমঠে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় চতুর্দ্দিক বরফে ঢাকিয়া যায়। শীতের ছয় মাস যোশীমঠে পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করিবার সময় নৈবেদ্য দেওয়া হয় এবং দুই মণ ঘৃতের একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রদীপ শীতের ছয় মাস বরাবর জ্বলিতে থাকে এবং যখন মন্দিরের দরজা খোলা হয় তখন এই দীপশিখা দর্শন মহাপুণ্য

জনক। ইহাকে জ্যোতিদর্শন বলে। বায়ুর অভাবে যাহাতে এই প্রদীপ নিবিয়া না যায় তজ্জন্ত মন্দিরের কপাটের মধ্যে ছিদ্র রাখা হইয়াছে। যদি এই প্রদীপ নিবিয়া যায় তবে লোকে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক প্রভৃতি অশুভ ব্যাপারের আশঙ্কা করে।

রাওল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(১) বদরীনারায়ণের মন্দির বৈশাখ মাসের ২৮৷২৯ তারিখ মেষার্কে খোলা হয় এবং মার্গশীর্ষের ১৷২ তারিখে বৃশ্চিকার্কে বন্ধ হয়।

(২) শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্ব হইতে বদরীনাথের পূজা হইতেছে কিন্তু তিনি মন্দির মেরামত করিয়া পূর্ব্বমূর্ত্তির স্থানে অন্যমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

(আমরা অবগত আছি যে পূর্ব্বে তির্ব্বতীয়েরা পূজা করিত এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি অলকানন্দায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করে।)

(৩) শঙ্করাচার্য্যের পর নাম্বুরী সন্ন্যাসীরা পূজা করিতেন, পরে নাম্বুরী বংশীয় শত শত রাওল বদরীনারায়ণের পূজা করিয়া আসিতেছেন।

বসু ধারা

নারায়ণের মন্দির হইতে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া বসুধারা দর্শনাভিলাসে বেলা ১০টার সময় রওনা হইলাম। এইবার শান্তিকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট রাখিয়া প্রমথ বাবু, সাধুজী, জিয়োদা, ও আমি যাত্রা করিলাম। একজন ব্রাহ্মণও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি রাস্তা ঘাট দেখাইয়া দিবেন। আমি কোথায় যাইব শান্তিকে আর বলিলাম না। মাতাঠাকুরাণী তাহাকে ভুলাইয়া রাখিলেন। বসুধারাতে

কোনও দোকান নাই এবং খাবার জিনিষও কিছু পাওয়া যায় না। তাই আমরা পুরীও পেয়ারা বাজার হইতে আনাইয়া নিলাম। আর পাণ্ডাজী বলিয়াছেন যে ওখানে দুইজন সন্ন্যাসী থাকেন, সকল যাত্রীরাই তাঁহাদের জন্য কিছু খাবার নিয়া যান। আমরা ও তাঁহাদের জন্য পুরীও পেয়ারা ক্রয় করিয়া সঙ্গে নিলাম। বসুধারা বদরিকাশ্রম হইতে উত্তর-পশ্চিম কোনে ৫ মাইল ব্যবধান হইবে। আমরা ১০টার সময় রওনা হইয়া বেলা ১॥০টার সময় তথায় পেঁাছিলাম।

বদ্রীনারায়ণের মন্দির হইতে রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে গিয়াছে। আমরা সমতল রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কয়েকটী ধারা পার হইলাম, ইহাতে সামান্য জল। প্রথমে ভৃগু ধারা, কাক ঠোঁট, ইন্দ্র ধারা। অলকানন্দার বাম তীরে চারিটী ধারা দেখিলাম, পাণ্ডার লোকটী ইহাদের নাম বলিল সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদ। বেদের নাম অনুসারে ইহাদের নাম হইয়াছে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা অলকানন্দার উপরে কাষ্ঠের সেতু পার হইয়া "মানা" গ্রাম পাইলাম। এই গ্রাম বদরিকাশ্রম হইতে প্রায় দুই মাইল এবং অলকানন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত এবং সমুদ্র বক্ষঃ হইতে ১০,৫৬০ ফিট উচ্চ। এই সঙ্গমের নাম "কেশব প্রয়াগ।" এই গ্রামকে মনিভদ্রপুরও বলা হয়, কারণ এখানে মনিভদ্রের বাসস্থান ছিল। গ্রামের মধ্যে একটী বিষ্ণুর মন্দির এবং পাঠশালা আছে। এখানে স্কন্দ পুরাণোক্ত "মানসদ্ভেদ" তীর্থ। এই তীর্থে মনিভদ্রের আশ্রমে মহাবিষ্ণু বিরাজমান। পূর্ব্ব কালে ঐখানে ভীমসেন মন্ত্রতন্ত্র পুরঃসর গন্ধর্ব্ব দিগকে জয় করিয়াছিলেন। এখানে পাণ্ডবগণ ধৌম্য পুরোহিত ও ও লোমশ ঋষির সহিত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

এই গ্রামটী খুব বড় এবং প্রস্তরের দ্বিতল বাড়ী আছে। এখানে

ভুটিয়ারা বাস করিয়া থাকে। শীতের সময় এখানে কেহ থাকে না বদ্রীনারায়ণের মন্দির খোলার পর তাহারা এখানে আসিয়া কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। বদরিকাশ্রম হইতে মানা গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে সুন্দর শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিলাম। এই ক্ষেত্র গুলির চতুর্দ্দিক প্রস্তর বসাইয়া প্রায় ৪ ফিট উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে ইহাতে ঘোড়া ও ছাগলে ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিতে পারে না।

মানা গ্রামের উত্তর ধারে একটী উচ্চ স্থানে "ব্যাস গুহা" এবং তথা হইতে কিছু ব্যবধানে উৎরাই এর রাস্তায় "গণেশ গুহা"। আমরা বসুধারা হইতে ফিরিবার সময় এই দুইটী গুহা দর্শন করিয়াছিলাম। মানা গ্রাম হইতে বসুধারা ঠিক পশ্চিম।

গ্রামের উত্তর ধার দিয়া "মানাপাস" নামক গিরিসঙ্কটের রাস্তা। এই মানাপাস সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৮,৬৫০ ফিট উচ্চ এবং বদরিকা[illegible] হইতে ২৫।৩০ মাইল দূর। এই রাস্তা দিয়া তিব্বতের অন্তর্গত গর[illegible] নামক স্থানে গমন করা যায়। কিন্তু পথটী অতিশয় দুর্গম বলিয়া নি[illegible] পাস দিয়াই সকলে যাতায়াত করিয়া থাকে।

সরস্বতী গঙ্গার দুই ধার হইতে দুইখানা প্রস্তর আসিয়া নদী মধ্যস্থলে মিলিত হইয়াছে তাহাতে একটী সুন্দর সেতু তৈয়ার হইয়াছে আমরা এই সেতু পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর যাইয়া বলিলাম "এস সাধুজী ধূমপান করিয়া নেই"। তখনই কয়েকখান শুষ্ক ছোট ছোট ডালপালা সংগ্রহ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া [illegible] প্রজ্জলিত করিলাম। সাধুজী বলিলেন বসুধারাতে কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে না তাই আমরা রাস্তা হইতে কয়েকখানা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিলাম।

এ রাস্তায় কোন বৃক্ষ নাই। এক প্রকার ছোট ছোট কাঁটা গাছ

মধ্যে মধ্যে আছে তাহারই শুষ্ক সরু সরু ডাল এদিক ওদিক পড়িয়া আছে। আমরা তাহাই কুড়াইয়া নিলাম। মানা গ্রামের পর হইতেই বসুধারার রাস্তা কঠিন। রাস্তাতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। রাস্তায় কতকটা সমতল স্থানে বিস্তর লাল, নিল, সবুজ, নানা জাতীয় পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা অলকানন্দার বামতীর দিয়া চলিতেছি। তীর হইতে কিছু দূরে আকাশভেদী পর্ব্বতমালা দাড়াইয়া আছে। এই সব পর্ব্বতে বৃক্ষ লতাপাতা কিছুই নাই। দূর হইতে বসুধারার জলপ্রপাত দেখাইতেছিল কিন্তু নিকটে পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিল। বসুধারার জলে সে একটী ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়াছে যাহা পার হইয়া একটী খাড়া চড়াই উঠিতে হইল। এই চড়াইএর উপর সামান্ত একটু সমতল স্থানে একটী ক্ষুদ্র কুটীরের নিকট বেলা ১১৷০টার সময় উপস্থিত হইলাম। এই কুটীরে দুইজন সন্ন্যাসী থাকেন। একজন ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন অপর জন এখানে ছিলেন না আমরা উপস্থিত হইবার কিছু সময় পরে উপস্থিত হইলেন। এই কুটীরের সন্নিকটে বসুধারার জল হু হু শব্দে প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ হইতে প্রবলবেগে পতিত হইতেছে। যে স্থানে জল পড়িতেছে তথায় যাওয়ার সাধ্য নাই। দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল এবং বায়ু তাড়িত হইয়া ধারার জল উত্তর দিকে বৃষ্টির ন্তায় পড়িতেছিল, তাহাতেই আমরা স্নান করিলাম। ধারার জল যে প্রকার ঠাণ্ডা তাহাতে আর ভালরূপ স্নান করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রমথ বাবু আমাকে জোর করিয়া টানিয়া নিলেন। এক দিকে বরফের ন্তায় শীতল জল গায় পড়িতেছে অপর দিকে প্রস্তরে পায় তলায় যাতনা অনুভব হইতেছে। মনে হইল আমার অবস্থা শোচনীয়। যাহা হউক কোনও প্রকারে স্নান করিয়া কুটীরের নিকট আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। এখানে তর্পণ করা

সকলেরই কর্ত্তব্য। শীতে জড়সড় হইয়া সন্ন্যাসীদের ধুনীর নিকট বসিলাম। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে পাপীদের গায় বসুধারার জল পড়ে না তাই পাপ পুণ্যের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু সকলেই যখন নারায়ণ দর্শন করিয়া এখানে আসে তখন পাপ আর কোথায় থাকিতে পারে?

পরে সন্ন্যাসীদের পুরী ও পেয়ারা ভোজনার্থে প্রদান করিলাম এবং আমরাও আহার করিলাম। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শুধু পেয়ারা গ্রহণ করিলেন, তিনি অন্ন কিছু গ্রহণ করেন না। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা চা পান করি কি না। এই বরফের দেশে যখন শীতে জড়সড় হইয়া ধুনীর নিকট বসিয়া আছি তখন ২।১ পেয়ালা চা পানে যে কি আনন্দ তাহা যাহারা চা পান করিয়া থাকেন তাহারাই বুঝিতে পারেন। আমি ও সাধুজী সম্মতি জানাইলাম। চা প্রস্তুত হইল—তাহার যে প্রকার রং এবং আস্বাদন হউক না কেন আমরা আহ্লাদের সহিত পান করিলাম। প্রমথ বাবু চা পান করেন না, তাঁহার কুষ্টিতে চা পানের ব্যবস্থা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে তাই তিনি এ হেন তীর্থে, বলিতে কি ভারতের জনপ্রাণীর শেষ সীমানায় বসিয়া এক পেয়ালা চার আস্বাদন বুঝিতে পারিলেন না।

বসুধারার প্রায় অর্দ্ধেক জল ভূমিতে পড়িবার অনেক পূর্ব্বে বায়ুর হিল্লোলে বিতাড়িত হইয়া কুটীরের উপর এবং তৎসংলগ্ন স্থানে বৃষ্টির ন্যায় পড়িতেছে। ধারার যে জল ঠিক খাড়া ভাবে ভূমির প্রস্তরে পড়িতেছে, তাহাতে ঝট্ ঝট্ শব্দ হইতেছে। এই কুটীর হইতে দেখিলাম অনেকগুলি ছাগল অলকানন্দার তীরে চড়িতেছে। এখান হইতে অলকানন্দা বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল; বোধ হইল যে একটি শুভ্র মালা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বসুধারা হইতে পশ্চিমদিকে

দ তুষার ক্ষেত্র এবং এই স্থান দিয়াই সত্যপথ যাইতে হয়। আমরা বার আমাদের যাত্রার শেষ সীমা এই তুষার ক্ষেত্র দেখিতে লাগিলাম।

যে উচ্চ পর্ব্বত হইতে বসুধারা পড়িতেছে তথায় কুবেরের ভাণ্ডার আছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বসুধারা আসেন না কারণ ভাল রাস্তা নাই এবং যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। এখানে যে সকল যাত্রী আসেন তাঁহারা সকলেই এই দুই জন সন্ন্যাসীর জন্য খাদ্য সামগ্রী, জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতি নিয়া আসেন। অনেকে বদরিকাশ্রম হইতে পাণ্ডার মারফতে এসব পাঠাইয়া থাকেন। এখানে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই।

বসুধারা ত্রিলোকের মধ্যে দুর্লভ তীর্থ। অষ্টবসুগণ এই তীর্থের জলপান ও পত্র ভক্ষণ করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত অতি কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন।

সত্যপথ

বসুধারা হইতে যে তুষার ক্ষেত্র দেখা যায় তাহা পার হইয়া সত্যপথ যাইতে হয়। বদরিকাশ্রম হইতে সত্যপথ ১৮ মাইল এবং এখান হইতে ১০ মাইল দূর হইবে। আরও ১৷৷০ মাইল পরে চন্দ্রকুণ্ড এবং ৩ মাইল পরে সূর্য্যকুণ্ড, তৎপরে স্বর্গারোহণ। সত্যপথে পোণে এক মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী ত্রিকোণাকার হ্রদ আছে। এক একটী কোণে এক একটী ঘাট যথা—ব্রহ্মঘাট, বিষ্ণুঘাট ও মহেশ্বর ঘাট। দুইটী নদী আসিয়া বিষ্ণু ঘাটে ও মহেশ্বর ঘাটে পতিত হইয়াছে।

স্বর্গারোহণ একটী বৃহৎ বরফের পাহাড়, ইহাতে অনেক সিঁড়ি দেখা যায় কিন্তু যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা কেহই এই পর্ব্বতে উঠিতে

পারেন নাই। যুধিষ্ঠির এই পর্ব্বত দিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সত্যপথ ও স্বর্গারোহণের বিবরণ বদরিকাশ্রমের বাঙ্গালী সাধুটী ও এখানকার ধর্ম্মাধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি একবার এবং মৌনী বাবা দশ বার সত্যপথ গিয়াছেন। এক জন সন্ন্যাসী সত্যপথ গিয়াছিলেন কিন্তু শীতে তাঁহার পায়ের ও হস্তের আঙ্গুল সব খসিয়া পড়িয়া যায়—পরে হাস্পাতালে অনেক দিবস চিকিৎসার পর বদরিকাশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

সত্যপথ যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, রাস্তা নাই এবং থাকিবার স্থানও নাই। বৃক্ষ লতাদি পরিশূণ্য স্থানে যাইতে হইলে শুষ্ক কাষ্ঠ সঙ্গে করিয়া নিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না, সেজন্য প্রস্তুতকরা খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে নিতে হয়। রাস্তায় মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত গুহা আছে, তথায় রাত্রিবাস করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই চারি মাস সময়ে যাইতে হয় নচেৎ অন্য সময় এত অধিক তুষার পাত হয় যে তথায় যাওয়া সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ অসাধ্য।

বাঙ্গালী সাধুটী বলিলেন যে তিনি কিছু ছোলা ভাজা ও গুড় এবং প্রায় দুই তিন সের আটা ঘৃতে ভাজিয়া সঙ্গে নিবেন। মোটের উপর পাঁচ ছয় সের প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য লইয়া রওনা হইবেন। মৌনীবাবা ও এইভাবে খাদ্যদ্রব্য নিবেন কিন্তু তাঁহারা শুষ্ক কাষ্ঠ নিবেন না। এক সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে নিবেন।

ব্যাসগুহা

বসুধারা হইতে আমরা মানা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাসগুঁহা দর্শনার্থে কিছু চড়াই উঠিলাম। ইহা একটী প্রকাণ্ড গুহা সম্মুখে

দিকে প্রস্তরের দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে এবং একটী কাষ্ঠের দরজাও আছে। আমরা ভিতরে ঢুকিলাম কিন্তু নিবিড় অন্ধকার কিছুই দেখা যায়না, কয়েকটা দেশলাইর কাঠি জ্বালাইয়া অস্পষ্টভাবে ভিতরটা দেখিয়া নিলাম। গুহার মধ্যে ধুনীর দাগ লাগিয়া আছে। কথিত আছে ব্যাসদেব এখানে বসিয়া মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন। আমরা দেওয়ালের গায় ধুনীর দাগে কপাল ঠুকিলাম দেখি ইহাতে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় হয়। সাধুজীকে বলিলাম ব্যাসদেব এখানেত কত ধুনী জ্বালিয়াছিলেন আসুন আমরাও একটুকু ধুনী জ্বালিয়া নেই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুষ্ক ছোট ডাল সংগ্রহ করিয়া ধুনী জ্বালিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়া দিলাম।

প্রমথ বাবু যাওয়ার জন্য ব্যাগ্র হইলেন, তাঁহাকে বলিলাম আপনি আসুন আমরা মনের আশা না মিটাইয়া এক পদং ন গচ্ছতি। আমাদিগকে দেখিয়া গ্রামের কয়েকটী লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। গুহার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন এবং স্থানটী পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকাতে অপরিষ্কার ভাবে আছে। যে লোক কয়েকটী আমাদিগকে সাধু বিবেচনায় দর্শন করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিলাম "দেখ এ স্থানটী পরিষ্কার কর এবং কয়েকটী ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখ তাহাতে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইবে।" দেওয়ালের গায় পুনরায় কপাল ঠুকিয়া আমরা এস্থান ত্যাগ করিলাম।

গণেশ গুহা

ব্যাসগুহার কিছুদূরে উৎরাইএর রাস্তার পর্ব্বত গাত্রে গণেশ গুহা। এখানে গণেশের মূর্ত্তি আছে এবং পূজার উপকরণাদি আছে, একজন

পূজারীও এখানে থাকেন। আমরা ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া রওনা হইলাম। অলকানন্দার অপর পারে উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে মানসোদ্ভেদ সঙ্গমের পশ্চিমে মূর্ত্তিমাতার মন্দির আছে। পাণ্ডার গোমস্তা এই গ্রাম হইতেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই মন্দির দেখাইয়া দিলেন। আর বেলা নাই এবং সন্ধ্যার সময় আমাদের বদরিকাশ্রম পৌঁছিতে হইবে এই জন্য আর তথায় আমাদের যাওয়া হইলনা। ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র এবং এখানে নর ও নারায়ণ, মূর্ত্তিদেবীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহা মানবের মুক্তিক্ষেত্র এবং সর্ব্বক্ষেত্র মধ্যে দুর্লভ ক্ষেত্র। তথা হইতে দক্ষিণদিকে উর্ব্বশীসঙ্গম তীর্থ।

গ্রামের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম একটী বিস্তৃত ময়দানের মধ্যে বহু নর, নারী, বালক, বালিকা চক্রাকারে সমবেত হইয়াছে। মধ্যস্থলে ফাঁক আছে, এবং ইহার এক পার্শ্বে একজন লোক উন্মত্তপ্রায় হইয়া দাড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্ব শরীর মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কেহ কেহ বলিল নাচ হইবে কিন্তু আমাদের তাহা ভাল লাগিলনা। মনে কিছু কিছু ভয়ের উদ্রেক হইল। নাচ কি এভাবে হয়? এক একবার মনে হইতে লাগিল যে লোকটা কাঁপিতেছে তাহাকে হয়ত বা বলি দিবে। মোটের উপর আমরা কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। আমরা ভীত হইয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তাতে বালক বালিকারা বলিতে লাগিল "রানা, বেঙি দে, শুই তাপা দে" কিন্তু আমরা তাহাদের কথা ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। যখন আমরা গ্রাম ছাড়িয়া কিছু উৎরাইএর রাস্তায় আসিয়াছি তখন দেখি তাহারা উপর হইতে ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড সকল আমাদের উপর নিক্ষেপ করিতেছে। সাধুজী পশ্চাৎ ছিলেন তাঁহার গায় দুই একটা লাগিল। আমরা দ্রুত চলিয়া অলকা-

নন্দার উপরে সেতু পার হইয়া পর পারে আসিয়া হাপ ছাড়িলাম। অনেকে বলিয়াছেন যে পাহাড়ীরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক কিন্তু আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। ইহার প্রমাণ এই মানা গ্রামে পাইলাম। আরও অনেক স্থানে এই সম্বন্ধে প্রমথ বাবু ও আমি অনেক বলাবলি করিয়াছি। যাত্রীদের ঠগাইতে পাহাড়ীরা খুবই ওস্তাদ। এই বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে ভুক্তভোগী।

আমরা ঠিক সন্ধ্যার সময় বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন নারায়ণের আরতি হইয়া গিয়াছে, আমাদের আর দর্শন হইলনা। বাসায় উপস্থিত হওয়া মাত্র শান্তির কত আহ্লাদ সে যেন হারানিধি প্রাপ্ত হইল। মাতাঠাকুরাণী তাহাকে সমস্ত দিবস ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, কখন বা বাজারে, কখন বা মন্দিরে যখন যাহা চাহিয়াছে তখনই তিনি তাহা আনাইয়া দিয়াছেন। রাত্রিতে বাজার হইতে পুরী ও শাক আনাইয়া ভোজন করিলাম। আজ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে শরীরও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় আজ আর বৃষ্টি হয় নাই তাহা হইলে আরও কষ্ট পাইতে হইত। বৃষ্টিত এখানে রোজই লাগিয়া আছে। রাত্রিতে বদরী মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম।

নারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীকে ভোগ দেওয়ার জন্য রাত্রিতে বাজার হইতে রেশমী বস্ত্র, মেওয়া, ঘৃত, কর্পূর, ধূপ শলাকা, চানার দাল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলাম। এখানে তুলসী পত্র পাওয়া যায় না। আমি তুলসী, হরিতকি ও যজ্ঞ সূত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম।

৩৩ দিবস, ২৭শে আষাঢ়, বুধবার—

একখানা থালাতে শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের ও অন্য একখানাতে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবীর জন্য ভোগের উপকরনাদি সাজাইয়া মন্দিরে নিয়া

চলিলাম। মন্দিরের কর্ম্মচারীর নিকট দিলাম। সে নগদ টাকা মন্দিরের সিন্দুকের মধ্যে ফেলিয়া দিল আর সব জিনিষ নারায়ণের প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল পরে রাওল সাহেব আসিয়া তাহা উৎসর্গ করিলেন।

নারায়ণের আরতি ও স্নান দর্শনান্তে আমরা বাসায় আসিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নানের জন্য চলিলাম। তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া নারদ ও সূর্য্যকুণ্ডে মার্জ্জন করিলাম। পরে ব্রহ্মকপাল তীর্থে উপস্থিত হইয়া তর্পন ও মৃত পিতৃলোকের, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলাম। নারায়ণের মহাপ্রসাদে পিণ্ডদান করিলাম। এখানে সকলেই অন্ন মহাপ্রসাদে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এ স্থানে স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণে এসব কাজ করাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহারাও পতিত। দেখিলাম এখানে অনেকেই পিণ্ডদান করিতেছেন। যব, তিল সঙ্গেই ছিল। পরিশেষে পিণ্ডগুল অলকানন্দার গর্ভে নিক্ষেপ করিলাম।

আজ আমার পত্নীর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই তিথিতেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কে জানে দুই বৎসর পূর্ব্বে এমনি দিনে আমার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে, কে জানে বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকপাল তীর্থে আসিয়া তাঁহার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিতে হইবে। এই দুই বৎসরে আমার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভূতলের অতুল তীর্থে আসিয়া যে তাঁহার পরপারের কাজ কিছু করিতে পারিব তাহা কখনও ভাবি নাই এবং আশাও করি নাই। এই মহা সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিলাম না। শ্রীমান শান্তিকে দিয়া তাহার মাতার শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করাইলাম। যে অনলে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি তাহার কিছু শান্তি বোধ করিলাম, মনের আগুন কিছু নির্ব্বাপিত হইল। এই স্থানের এক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া কিছু দক্ষিণা দিয়া

সেই সব ঔষধ নাই। হাসপাতালে ডাক্তার নাই একজন কম্পাউণ্ডার মাত্র আছে।

অবশেষে আয়ুর্ব্বেদ ঔষধের জন্য ভিষক্‌ভূষণ কবিরাজ এ, সি, বিশারদকে, (২, হরকুমার ঠাকুরের স্কোয়ার, কলিকাতা) লিখিয়া দিলাম।

মন্দিরের তহবিল হইতে এখানকার হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এবং জোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত রাস্তার বাবদ ৫০০৲ টাকা P. W. D কে দেওয়া হইয়া থাকে।

বদরীনারায়ণের মন্দিরে রাওল সাহেবকে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। প্রাতে দুই ঘণ্টা এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক ঘণ্টার আগে কার্য্য সমাধা হয় না। এই সময় তাঁহাকে অন্ধকার ও বাতাস চলাচল হীন স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, ইহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গের খুবই সম্ভাবনা।

নারায়ণের সম্মুখের প্রকোষ্ঠে যখন সকল যাত্রীরা দাড়াইয়া থাকে তখন বাতাস বন্ধ হইয়া যায়। আমার মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস বন্ধের মত হইত। অন্য কাহারও এভাব হইয়াছে কি না তাহা আর জিজ্ঞাসা করি নাই।

আজ রাওল সাহেব আমাদিগকে ভগবানের বস্ত্র, তুলসীর মালা ও চন্দন প্রসাদ দিলেন। এই চন্দনে শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ দেবের চরণের চিহ্ন আছে। আমরা মহা আহ্লাদে গ্রহণ করিলাম। আমাদের আজই এই পুরী হইতে রওনা হইবার কথা ছিল কিন্তু রাওল সাহেবের অনুরোধে আজ থাকিয়া গেলাম। আমি ও প্রমথবাবু রাওল সাহেবকে বলিলাম যে মন্দিরের ক্ষীণালোকে নারায়ণের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন ভাল রকম প্রদীপ জ্বালিয়া আগামী কল্য ভগবানের মূর্ত্তি দেখাইবেন।

আজ একাদশী কিন্তু এখানে মহাপ্রসাদের লোভ পরিত্যাগ

করিয়া উপবাস থাকিতে ইচ্ছা হইলনা। মাতাঠাকুরাণী ও প্রমথবাবুর দলের বিধবারা উপবাস থাকিলেন। আজ বাজারে দধি পাওয়া গিয়াছিল। সমস্ত দিবস টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। এখানকার ধর্ম্মাধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম শাস্ত্রীর সহিত আলাপ হইল তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের বাসায় আসিয়া তাঁহার চক্ষু পরীক্ষা করাইলেন। কত নম্বরের চশমা তাঁহাব ঠিক হইবে তাহা একখানা কাগজে লিখিয়াদিলাম। তিনি একবার সত্যপথ গিয়াছিলেন তাঁহার নিকট সত্যপথেব রাস্তার বিষয় শ্রবণ কবিলাম।

খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে শাস্ত্রিব আজ পেটেব অসুখ হইয়াছে। তাহাকে ঔষধ খাওয়াইলাম তাহাতে ক্রমশঃ সারিয়া গেল।

গরুড়শিলার নিকট বসিয়া আমাদের পাণ্ডা যুগলকিশোর রামরতন সং ভাইয়া আমাদিগকে সুফল প্রদান কবিলেন। আমরা যৎসামান্য যাহা কিছু দিলাম তাহাই গ্রহণ করিলেন কোনও প্রকার পীড়াপীড়ি করিলেন না। অনেক পাণ্ডা বক্তৃতা করিয়া যাত্রীদের নিকট হইতে বেশীমাত্রায় আদায় করে অথবা গয়ার ন্যায় খত লিখাইয়া নিয়া থাকে।

পাণ্ডা সুফল প্রদান করিবাব সময় যে মন্ত্র পাঠ করিলেন তাহাতে বুঝা গেল কেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শন করাতে উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত সোয়া লক্ষ পর্ব্বত ও চুরাশি লক্ষ তীর্থ ভ্রমণ হইয়াছে।

বিকালে ৩টার পর রৌদ্র উঠিল। যখন রৌদ্র হয় তখন শীত বোধ হয় না। একটা সামান্য জামা গায় থাকিলেই হয়। আজ অপরাহ্নে মন্দিরে গীতা পাঠ করিয়া শেষ করিলাম।

ডাক্তার ডি, কে, পাঠক, এল্, এম্, এস্, সিন্দুয়ারো (নাগপুর) হইতে গঙ্গোত্তরী হইয়া বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে সস্ত্রীক গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁহছিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল।

৩৬ দিবস, ৩২শে আষাঢ়—

আজ সকালে নারায়ণ দর্শন করিলাম। বোধ হয় ইহজন্মের মত শেষ দর্শন হইল। দর্শন করিতেছি এমন সময় রাওল সাহেব তাল করিয়া কর্পূর ও ঘৃতের বাতি জ্বালিয়া ভগবান দর্শন করাইলেন। আমি শান্তিকে নিয়া ঠিক দরজার সম্মুখেই বসিয়া ছিলাম। রাওল সাহেব বলিলেন "ডাক্তার সাহেব, দেখা হ্যায়" আমি আরও কিছু সময় ভগবানকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আরও কর্পূর জ্বালাইয়া নারায়ণের সম্মুখে ধরিলেন। আমরা মন প্রাণে ভগবানকে দর্শন করিয়া মানব জন্ম সফল করিলাম। আমাদের এই দীর্ঘকালব্যাপী হিমালয়ে কঠোর পরিশ্রম আজ সার্থক হইল। মনে বিপুল আনন্দ বোধ হইল।

এখানে তপ্তকুণ্ডের নিকট একটী বানর থাকে। আমি স্নানান্তে তর্পণ করিতেছি এমন সময় আমার পৃষ্ঠের উপর এক লম্ফ প্রদান করিয়া পুনরায় আর এক লম্ফে কুণ্ডের অপর ধারে চলিয়া গেল। এই বানরের সহিত শান্তির খুব মিতালী ছিল। একদিন মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময় শান্তি আমার অগ্রে হাটিতেছে এমন সময় কোথা হইতে আসিয়া বানরটা তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, শান্তি চিৎকার আরম্ভ করিল কিন্তু তখনই আবার পা ছাড়িয়া দিল। শান্তি যখন বাসায় বসিয়াছিল তখনও এই বানর আবার তাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। এই বানরটাকে দেখিলেই শান্তি খুব চিৎকার করে। বদরিকাশ্রমে এই একটী বানরই দেখিয়াছি কিন্তু কেদারনাথে বানর নাই।

আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় শান্তির কাণ্ডীওয়ালা

কুলী ভারী গোলমাল আরম্ভ করিল। শ্রীনগর হইতে মেহেলচৌরী পর্য্যন্ত তাহাকে ৩৫৲ টাকা দিব এই বন্দোবেস্ত হইয়াছিল কিন্তু লিখাপড়া হইয়াছিল না। তাহাকে বিশ্বাস করিয়া রসিদ আদান প্রদান হয় নাই। এখন সে পঞ্চাশ টাকা চাহিতেছে। প্রমথবাবু ও আমি উভয়েই তাহার ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমাদের রাগও হইল। প্রমথবাবুর ঝাঁপানওয়ালা সের সিংও সাক্ষী দিল যে ৩৫৲ টাকাই ঠিক হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে ৩৫৲ টাকাতেই রাজী করাইলাম এবং এইবার রসিদ লিখাইয়া লইলাম। আমরা পদে পদে ঠেকিয়া গাড়োয়ালীদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি।

Garhwal District Gazetteer (1921) নামক পুস্তকে Mr. H. G. Walton, I. C. S লিখিয়াছেন, "The indolence of Garhwalee and his proneness to falsehood have been insisted upon by all writers."

* * "A very short acquaintance with him is sufficient to teach one where to look for the kernal of actuality in the shell of hyperpole. Still though a liar he is honest avove the average and faithful to his trust. Theft is practically unknown."

গাড়োয়ালীদের চরিত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য কথায় কথায় ঠিক। তাহারা মিথ্যা কথা বলে বটে কিন্তু চুরী করে না।

সকালে একবার রাওল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। রওনা হইবার পূর্ব্বে আমার মাতাঠাকুরাণী, শান্তি, ও প্রমথবাবুর পরিবারবর্গকে নিয়া তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি শান্তিকে একখানা ভগবানের বস্ত্র ও মালা দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে “এই ক্ষেত্র সত্যযুগে মুক্তিদা ত্রেতায় যোগসিদ্ধিপ্রদা, দ্বাপরে বিশালা এবং কলিকালে বদরী নামে প্রথিত হইয়াছে।”

“হরির ক্ষেত্র বদরিকাতীর্থ ত্রিলোকের মধ্যে দুর্লভ। স্বর্গ, ভূতল ও রসাতলে বহু তীর্থ আছে কিন্তু বদরীর সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেওনা।” “এইস্থানে ঋষিসঙ্ঘ বাস করেন। এই ক্ষেত্রে একটী বদরীতরু বিরাজিত, এই তরু হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, এজন্ম প্রাজ্ঞগণ এই ক্ষেত্রের নাম বদরী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু যুগভেদে কখন কখন অন্য তীর্থ সকল পরিত্যাগ করেন, কিন্তু হরি এই বদরী তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করেন না। ষষ্ঠি সহস্র বর্ষের যোগভ্যাসে এবং একদিন বারাণসী দর্শনে যে ফল, বদরী প্রাপ্তি মাত্রই তাহার তুল্য ফল লাভ হয়।”

এই ক্ষেত্র নিখিল তীর্থ, দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন, এইজন্য এই তীর্থ বিশালা নামে বিখ্যাত। “যেখানে মহালক্ষ্মী অন্ন পাক করেন নারদ নিবেদন করেন এবং মহাবিষ্ণু ভোজন করেন। সেখানে অন্ন ভোজনে দোষ কি? যে পাপের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে লিখিত আছে, সেই মহাপাপও বদরীনাথ শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণে দূরীভূত হইয়া যায়। নারায়ণ নৈবেদ্য চণ্ডাল কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলেও কখন দোষাবহ হয়না, অতএব বদরিকাশ্রমে প্রসাদ ভক্ষণে বিবাদ কর্ত্তব্য নহে, বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ মাত্রই সকল শুদ্ধ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।”

“জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন, সন্ন্যাসী বা ব্রতনিষ্ঠ হউন, যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন তাঁহাদের বদরিকাশ্রম অবশ্য দর্শন কর্ত্তব্য।”

প্রত্যাবর্ত্তন

আমরা ২৭শে আষাঢ় সোমবার সকালে এখানে উপস্থিত হই, ২৭শে হইতে ৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই মহাতীর্থেই কাটাইলাম। আজ ষষ্ঠ দিবস আমাদের যাত্রার দিন। সকল যাত্রীরাই তীর্থস্থানে আসিয়া ত্রিরাত্রি বাস করেন। অধিকাংশ যাত্রীরা এই তীর্থে আসিয়া ত্রিরাত্রি বাস করেন। কেহবা হনুমান চটি যোগ দিয়া ত্রিরাত্রি হিসাব করিয়া থাকেন। যাত্রার দিন ধার্য্য হইয়াছে বটে কিন্তু মন সরিতেছেনা। অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি কিন্তু এমন শান্তিলাভ আর কোথাও হয় নাই। সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে শান্তিলাভের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার পক্ষে বদরিকাশ্রমই উপযুক্ত স্থান। বহুদিবস যাবৎ সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে তাই পুনরায় শান্তি প্রাপ্তির আশায়ই হিমালয় ভ্রমণে আসিয়াছি। এস্থান যে কত শান্তিপ্রদ, কতটা হৃদয়ে পবিত্রতা আনয়ন করে তাহা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিয়াছি।

হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্য্যতা, অসীমতা ও ভীষণতা এবং অলকানন্দার গর্জ্জন একঘেয়ে হইলেও কখনও পুরাতন হইবার নহে। দিবারাত্রি দেখিয়াও আশা মিটে না। এখানে মৌনীবাবার কথা জীবনে ভুলিবনা। সংসার ত্যাগী বৃদ্ধের প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি এখনও চক্ষুর সামনে ভাসিতেছে। একটী বচন আছে "Do not tell me of holy waters or stone images; they may cleanse us if they do, after a long period. A saintly man purifies us at sight."

রাওল সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি শান্তিকে

নিয়া ভগবানের মন্দিরে আসিলাম। এখানে সকলেই বদরীনারায়ণকে ভগবান বলিয়া থাকেন। মন্দির এই সময় বন্ধ ছিল। আমরা মন্দিরের বারেন্দায় আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। শান্তিকে বলিলাম "শান্তি ভগবানের চরণে লুটাইয়া পর" সেও আমার ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিল। বদরিকাশ্রম পরিত্যাগ করিতে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হইতে লাগিল এবং চক্ষুর কোণে কয়েক ফোটা অশ্রুজলও দেখা দিল। পাণ্ডাকে প্রণাম করিয়া আমরা অপরাহ্ন ২টার সময় পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। অলকানন্দা পার হইয়া আমি বারংবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বদরিকাশ্রমের দৃশ্য দূর হইতে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকাতে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। বিশাল পর্ব্বতের পাদদেশে একখানা ছোট সহর এবং তাহার একপ্রান্তে নারায়ণের মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের পরিচয় দিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। সাধুজী ও আমি পুনঃ পুনঃ নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে একটী বাঁক ফিরিয়া উৎরাইএর রাস্তায় পরাতে সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। অদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে একটী বেগবতী নালা পার হইলাম। ক্রমে হনুমান চটিতে আসিয়া প্রমথবাবু শিলাজতু এবং আমি ভূর্জ্জপত্র ক্রয় করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামবাগাড় চটিতে পৌঁছিয়া এখানেই রাত্রি যাপন করিলাম। শান্তির পেটের অসুখ আজ অনেকটা ভাল আছে।

৩৭ দিবস, ১লা শ্রাবণ—

গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, আজ সকালেও বৃষ্টি হইতেছে। আমরা ৭টার সময় রওনা হইয়া পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া যোগবদ্রী দর্শন করিলাম

এবং আর বিলম্ব না করিয়া তখনই রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগে আসিয়া জলযোগ করিয়া নিলাম। পরে অপরাহ্ন ৩টার সময় জোশীমঠে উপস্থিত হইয়া কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে চড়াই উঠিবার সময় আমার মাতাঠাকুরাণী রাস্তা ভুলিয়া অন্য রাস্তায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের অনেক পূর্ব্বে রওনা হইয়াছিলেন কিন্তু প্রায় জোশীমঠের কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় দেখিলাম তিনি আমাদের অনেক পশ্চাতে চড়াই উঠিতেছেন। দেখিয়াই আমি দাঁড়াইলাম। তাঁহার এই ২ মাইল চড়াই উঠিতে আজ অনেক কষ্ট হইয়াছে বিশেষতঃ রাস্তা ভুলিয়া অন্য রাস্তায় আবার অধিক হাটিতে হইয়াছে।

তিনি যখন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন তখন দেখি পথশ্রমে মুখখানা মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার কষ্টে আমারও আন্তরিক কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু উপায় নাই। এই কঠোর পরিশ্রমের পর আবার রান্না করা কতদূর কঠিন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রমথবাবু বলিলেন আজ এক সঙ্গেই রান্না হউক। আমিও তাঁহার এই দয়াতে আনন্দ উপভোগ করিলাম। দ্বিতলের বারেণ্ডার একধারে সকলের রান্না হইল। অদূরে একটী ঝরণাতে আজ সাবান দিয়া শান্তিকে স্নান করাইয়া দিলাম। নিজেও সাবান দিয়া গায় ময়লা পরিষ্কার করিলাম। আমাদের শরীরে যে কত ময়লা পড়িয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমরা আহারে বসিয়াছি এমন সময় একজন সন্ন্যাসী, যাহাকে উখীমঠ ও বদরিকাশ্রমেও দেখিয়াছি, নীচে রাস্তায় বসিয়া গোলমাল আরম্ভ করিল। এই সন্ন্যাসী যেখানে যায় সেখানেই হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার সময় আমরা নৃসিংহ বদ্রীনারায়ণ দেবের আরতি দর্শন করিতে মন্দিরে গেলাম। পরে ভূতপূর্ব্ব রাওল সাহেবের পুত্র কুমার শ্রীরামচন্দ্র নম্বুরী শর্ম্মার পুস্তকের দোকানে এক টাকা দিয়া একখানা কেদারবদরী মাহাত্ম্য গ্রন্থ ক্রয় করিলাম। তাঁহার দোকানে মৃগনাভী, শিলাজতু প্রভৃতিও বিক্রয় হয় এবং ভিঃ পিঃ তে অনেক মাল স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর এখানকার হাস্পাতালে যাইয়া ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আসিলাম।

শান্তি এখন ভালই আছে। আজ শরীর বড়ই ক্লান্ত বোধ হইতেছে।

৩৮ দিবস, ২রা শ্রাবণ—

আজ ভোর বেলা বৃষ্টি হইতেছে ও চতুর্দ্দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। আমরা ৬৷৹টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাকঘরে একখানা পত্র দিলাম, টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করিবার দরকার ছিল কিন্তু পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন যে টেলিগ্রাফের লাইন বন্ধ, কাজেই আর তার করা হইল না। রাস্তাতে শ্রীমৎ সজনানন্দ ব্রহ্মচারীর সুন্দর ধর্ম্মশালা দেখিয়া নিলাম। ইহার কিছু ব্যবধানে রাস্তার বামধারে একটী ছোট পর্ব্বতের উপর দেখিলাম ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বিলাতী বেগুন ও মরিচের চাষ হইতেছে। আমরা কয়েকটা বাঁধাকপি, শালগম, ও কাঁচা মরিচ ক্রয় করিলাম। এক একটা বাঁধাকপি চারি আনা মাত্র দাম। আমাদের কুলিরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে কাজে কাজে আমাদেরই এই বোঝা বহন করিতে হইল। আমার চাদরখানা দিয়া কপিগুলি বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া লইলাম। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমরা চলিয়াছি।

প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর দেখি আমাদের কুলিরা একস্থানে

বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। কপির বোঝা তাহারা নিতে চায়না। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলাম।

মুরকপুর চটিতে পণ্ডিত শ্রীবালিরাম শর্ম্মার পুস্তকের দোকানে একখানা বাঙ্গলা বই ক্রয় করিলাম। বইখানার নাম "রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী"। রামচন্দ্রের নাম শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না অযোধ্যার রামচন্দ্র। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র। বইখানা ১৩১২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। এখান হইতে আরও এক মাইল রাস্তা চলিয়া বৃদ্ধ বদ্রীর মন্দিরে যাইতে হয়।

বৃদ্ধ বদ্রী

রাস্তা হইতে অর্দ্ধ মাইল উৎরাইএর পর বৃদ্ধ বদ্রীর মন্দির। আমাদের দলের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল প্রমথবাবুর মাতা, শান্তি ও আমি বৃদ্ধ বদ্রী দর্শনের জন্য পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এখানে অধিকাংশ যাত্রীরা যান না কারণ রাস্তা নাই। বহু পূর্ব্বে যাত্রীগণ এই পর্য্যন্ত আসিয়াই নারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইতেন। অধিকাংশ যাত্রীরা ইহার নাম পর্য্যন্তও জানেন না। ঝাঁপানওয়ালারা যাইতে অস্বীকার করিল, তাহারা বলিল এখানে ঝাঁপান নিয়া যাওয়া যাইবেনা। শান্তির কাণ্ডীতে প্রমথবাবুর মাতাকে বসাইলাম এবং শান্তিকে কুলী স্কন্ধে করিল। এই ভাবে আমরা নিম্নদেশে যাইতে আরম্ভ করিলাম। সামান্য জঙ্গল তাহা যষ্টিদ্বারা ফাঁক করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তাতে বিস্তর বিছটি গাছ আছে তাহার পাতাগুলি যখন গায় লাগে তখন তীব্র জ্বালা আরম্ভ হয়। মন্দিরে পৌঁছিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক লাগিলনা। এই স্থানটীকে অনীমঠ বলে। স্থানটী নির্জ্জন। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষ্ণুর সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। এখানকার পূজারী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত

গরীব অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। যাত্রীরা কেহ আসেন না, তাহার উপর রাওল সাহেব কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক খবরও লেন না। যৎ সামান্য চাষ আবাদ করিয়া অতি কষ্টে দিন চালাইতেছেন। মন্দিরের সংলগ্ন পূজারী ঠাকুরের বাসস্থান এবং চারিধারে কতকগুলি বৃক্ষ, কয়েকটা লেবু ও লঙ্কার গাছ আছে। আমরা কয়েকটা লেবু ও কাঁচা লঙ্কা চাহিয়া নিলাম। আমরা দর্শন ও প্রণাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম, এখানে যাত্রী থাকিবার জন্য কোনও ঘর নাই।

আমরা চড়াই উঠিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এখান হইতে কুমার চটি এক মাইল ব্যবধান। এখানে পোঁছছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। মাতাঠাকুরাণী কপি রান্না করিলেন। যখন আহারে বসিলাম তখন বোধ হইতে লাগিল যেন অমৃত ভক্ষণ করিতেছি। আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করিলাম।

প্রমথ বাবু তাঁহার পত্নীর উপর অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কারণ তিনি বৃদ্ধ বদ্রী দর্শন না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। সাধুজীও বাদ গেলেননা। কুমাব চটিতে নাগপুরের ডাক্তারেব সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বৃদ্ধ বদ্রী দর্শন করেন নাই ইঁহার অস্তিত্বও জানেন না।

অপরাহ্ন ৪টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাতাল গঙ্গা চটিতে উপস্থিত হইলাম। আমার এখানেই রাত্রি যাপন করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রমথ বাবুর তাড়নায় আরও অগ্রসর হইতে হইল।

যখন ঠাংনী চটিতে পোঁছছিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আমি এখানে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রমথ বাবু এখানে

থাকিলেন না। তাঁহারা গরুড় গঙ্গা চটিতে চলিয়া গেলেন। রাত্রিকালে এই পার্ব্বত্য রাস্তা চলা কোনও প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রমথ বাবুর ঝাঁপানওয়ালারাও রাত্রিতে চলিতে ইচ্ছুক ছিলনা। অনেক আপদ বিপদ ঘটিতে পারে। প্রমথ বাবু এই চটিতে না থাকিয়া গরুড় গঙ্গা চটিতে চলিয়া যাওয়াতে আমার ভাল বোধ হইল না। তিন দিবস তাঁহার সহিত ছাড়া ছাড়ি হইয়াছি এক দিবস গুপ্তকাশীতে, এক দিবস গোকুল চটিতে এবং আজ এই ঠাংনী চটিতে।

ধর্ম্মশালাটী নূতন তৈয়ার হইতেছে এখনও শেষ হয় নাই। যে লোকের তত্ত্বাবধানে আছে সে আমাদিগকে খুব খাতির যত্ন করিল। পাতিবার জন্য সতরঞ্চ, গায় দেওয়ার জন্য কম্বল ও জ্বালাইবার জন্য একটী মোমবাতি দিল।

৩৯ দিবস, ৩রা শ্রাবণ—

ভোর ৬৷৹টার সময় রওনা হইয়া ৭৷৹টার সময় গরুড় গঙ্গা চটিতে উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া দেখি প্রমথবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। কোনও কোনও কার্য্যে মতভেদ হইলেও প্রাণের টান কোথায় যাইবে। সুদূর হিমালয়ে দুইজন বাঙ্গালী ৩৯ দিবস যাবৎ একসঙ্গে আছি। আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় যাইবেন?

পিপল কোঠীতে আসিয়া কিছু জিলাপী এবং অন্যান্য জিনিষ ক্রয় করিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে একটী প্রকাণ্ড গুহা দেখিলাম। সিয়া চটিতে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিলাম। পুনরায় ৩টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় লাল সাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

লাল সাঙ্গা

আজ ১৫ মাইল হাটিয়াছি। রাস্তা অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রাস্তাতে কয়েকটী আমড়ার গাছ দেখিয়া অনেকগুলি আমড়া পাড়িলাম। সাধুজীকে গাছে চড়াইয়া দিয়া আমরা নিচু হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। আমাদের ছাতা ও যষ্ঠি দ্বারা ডালগুলি নত করিয়া দুই তিনটা গাছ হইতে প্রায় এক টুকরি আমড়া পাড়িলাম। ধর্ম্মশালায় রান্নার খুবই অসুবিধা। এক স্থানে থাকিতে হয় এবং অন্যস্থানে রান্নার জোগাড় করিতে হয়। প্রমথবাবুরা চানা ভাজা খাইয়া রাত্রি কাটাইলেন, আমি কৃষ্ণাকে দিয়া রুটি তৈয়ার করাইয়া আনিলাম। জ্যোৎস্না রাত বারেন্দায় বসিয়া অলকানন্দার কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং অপর পারের ভীমাকৃতি পর্ব্বতের গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই।

শেষ রাত্রিতে পায় তীব্র বেদনায় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। হাটিতে হাটিতে আমার পায় তলদেশ ফাটিয়া গিয়াছে এবং উপরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এক স্থানে পুঁজ জমিয়া ভয়ানক বেদনা দিতেছে। আমি "বাবাগো বাবাগো" করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম যন্ত্রনা অসহ্য হওয়াতে ব্যাগ হইতে একটী সূঁই বাহির করিয়া এই স্থানটা গালিয়া দেওয়াতে এক ফোটা মাত্র পূঁজ বাহির হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনার উপশম হইল। এই এক ফোটা পূঁজের এত জোর যে আমাকে অস্থির করিয়া উঠাইয়াছিল।

৪০ দিবস, ৪ঠা শ্রাবণ—

সকালে ডাকঘরে যাইয়া টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করিলাম। পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাদিগকে অনেক খাতির করিলেন।

প্রমথ বাবু গোপেশ্বর হইতে যে একটা কুলি আনিয়াছেন তাহাকে বিদায় করিবার সময় সে অনেক গোলমাল করিল। যে ভাড়া ঠিক হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভাড়া দাবী করিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া প্রমথ বাবু থানাতে গেলেন, আমি রাস্তাতে দাড়াইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই কুলিটার সহিত লিখা পড়া হইয়াছিল না। থানার দারগা প্রমথ বাবুর কথা বিশ্বাস করিয়া কুলিটাকে তাড়াইয়া দিলেন।

আমরা অলকানন্দার বাম তীর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। গোপেশ্বর হইতে বদরিকাশ্রম যাইবার কালীন আমরা দক্ষিণ তীর দিয়া গিয়াছিলাম; বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা লৌহ সেতু পার হইয়া লালসাঙ্গা আসি।

লালসাঙ্গা হইতে কুয়েড় চটি ১।৷০ মাইল এবং তথা হইতে মাঠাল চটি ২ মাইল, পরে নন্দপ্রয়াগ ৩৷৷০ মাইল। রাস্তাতে সাধারণ চড়াই, উৎরাই আছে। কয়েক স্থানে রাস্তা বর্ষায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নন্দ প্রয়াগ

নন্দ প্রয়াগ হিমালয়ের পঞ্চ প্রয়াগের অন্যতম। এখানে কণ্ব ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া এই স্থানের অপর নাম কণ্বাশ্রম। এখানে অলকানন্দার সহিত নন্দাকিনী নদী মিলিত হইয়াছে। সংযোগ স্থলের জল সমুদ্র বক্ষঃ হইতে ২৪৬৪ ফিট উচ্চ। এখানে অনেকগুলি আহার্য্য দ্রব্যের ও মনোহারী জিনিষের দোকান ও যাত্রী থাকিবার ঘর, একটী ডাকঘর এবং ৺মহেশানন্দ শর্ম্মার পুস্তকের দোকান আছে, তথায় শিলাজতুও বিক্রয় হয়। শিলাজতু ব্যতীত আরও অনেক খনিজ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধও পাওয়া যায়। এসব ছাড়া জুতা, কম্বল, চামর প্রভৃতিরও

দোকান আছে। এখানকার অধিবাসীরা সকলে ঝরণার জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। সঙ্গম স্থলে যাইতে রাস্তায় নন্দ, যশোদা, কৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মী প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে এবং আরও কিছু ব্যবধানে নাগ তক্ষকের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের গোহনা বন্যায় এস্থানেরও বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। পূর্ব্বে এখানকার ঘরবাড়ীগুলি আরও নিম্নে ছিল। বন্যায় সমস্তই ভাসিয়া যায় পরে নূতন করিয়া বাজার তৈয়ার হইয়াছে। এখানে দেখিলাম সকল বাটীগুলিই বেশ পরিষ্কার এবং দ্বিতল। বাজার হইতে অল্পদূরে মন্দাকিনী নদীর উপর একটী ১২০ ফিট লম্বা লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে।

সঙ্গম স্থলে যাওয়ার রাস্তার দুইধারে ময়লার গন্ধে নাসিকায় কাপড় দিতে হয়। নন্দপ্রয়াগ বাসীরা এখানেই মলত্যাগ করিয়া থাকে।

আহারাদির পর রওনা হইব এমন সময় প্রমথ বাবু বলিলেন যে সাধুজী যাইবেন না। তিনি এখানে থাকিবেন, তাঁহার শরীর ভাল না। আমি যাইয়া দেখি তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে একটী কুঠুরীতে কম্বল বিছাইয়া বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? এই কথা বলিয়াই তাঁহার কমণ্ডলু ও কম্বলখানা উঠাইয়া নিলাম। তাঁহাকে বলিলাম আপনি যে এখানে থাকিতে চান কি খাইবেন। ভিক্ষাই বা আপনাকে কে দিবে? এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে গাড়োয়ালের সর্ব্বত্র হাহাকার রব। আপনি কি শেষে না খাইয়া মারা যাইবেন? পরে আমি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া উঠাইলাম এবং রাস্তাতে আসিয়া পড়িলাম। তিনি আর ওজরআপত্তি না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ঘাড়ে আর বোঝা চাপান হইল না। এইটুকুই তাঁহার লাভ হইল। নন্দপ্রয়াগের বাজার পার হইয়া একটী ঝরণা আছে, তাহার স্রোতে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমরা অতি কষ্টে পার হইলাম। পরে আরও কিছুদূর যাইয়া নন্দাকিনীর সেতু পার হইলাম। এখানে রাস্তা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি নন্দাকিনীর তীর দিয়া গোয়ালধাম এবং অপরটী অলকানন্দার তীর দিয়া কর্ণপ্রয়াগ অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তা সমতল।

রাস্তার ধারে এবং পর্ব্বতোপরে বহু চিরবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। এই চিরবৃক্ষ কেদারের রাস্তায় দেখিয়াছিলাম এবং বদরীনাথের রাস্তায় গরুড় গঙ্গা হইতে পাতাল গঙ্গা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম পরে এই নন্দ-প্রয়াগের রাস্তায় দেখিলাম। নন্দপ্রয়াগ হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা ক্রমশঃ ছোট দেখাইতেছে। আমরা ৩ মাইল চলিয়া সোনলা চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। এই চটি শূন্য পড়িয়া আছে এবং ঘরগুলি আবর্জ্জনাতে পূর্ণ। আমাদের কুলি দ্বারা এই সব পরিষ্কার করাইয়া বিছানা পাতিলাম। দোকানদারকে ডাকাডাকি করাতে সে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া আমাদের আটা প্রভৃতি দিল। দুগ্ধের জন্য অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু পাইলাম না। আজ মাত্র ১০ মাইল হাটিলাম।

৪১ দিবস ৫ই শ্রাবণ—

শেষ রাত্রিতে শান্তি একবার পাতলা বাহ্য করিল। ভোরেও আর একবার বাহ্য হইল। তাহাকে ঔষধ খাওয়াইলাম। চটি হইতে কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া দেখি একটী সরকারি বাংলা। রাস্তা সমতল, সোনলা চটি হইতে লঙ্গাসু চটি পর্য্যন্ত একস্থানে কিছু চড়াই উৎরাই আছে কিন্তু নদীর তীরভূমি দিয়া চলিলে আর চড়াই নাই। লঙ্গাসু চটিতে কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখানকার চটিগুলি দ্বিতল নহে। নদীর তীরে বেশ চাষ আবাদ হইতেছে। চটিতে

কয়েকখানা ঘর আছে। পরে জয়কাণ্ডী চটিতে পৌঁছিয়া শান্তি আর একবার বাহ্ করিল। এই ৩ বার বাহ্ করাতে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কাণ্ডীতে বসিতে চায় না, শুইয়া থাকিতে চায় কিন্তু শয়ন করিবার স্থান কোথায়? বিরোজা চটিতে উপস্থিত হইতে অনেক দেরী হইয়া গেল। প্রধান কারণ কৃষ্ণা হাটিতে পারে না, তাহার উপর আবার শান্তির অসুখ। বিরোজা চটিতে যখন উপস্থিত হইলাম তখন দেখি আমাদের দলের সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল আমার মাতাঠাকুরাণী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমার এত দেরী দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বুঝিতে পারেন নাই আমি কিপ্রকার মুস্কিলে পড়িয়াছি। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি শান্তিকে নিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রামান্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই চটিতে মাত্র ২খানা ঘর। ২ মাইল হাটিয়া বেলা ১২॥ টার সময় কর্ণপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম।

কর্ণপ্রয়াগ

এই প্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম। প্রথমেই আমরা সঙ্গম স্থানের উপরে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের বাঁধান তলদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। শান্তি আবার বাহ্ করিল। আমি অত্যন্ত চিন্তায় পড়িলাম। এখানে ঘাটপুরোহিতের একখানা ঘর ও মহাদেবের মন্দির আছে। পর্ব্বতের উপরে চাণ্ডকা দেবীর একখানা প্রাচীন মন্দির আছে এবং নিকটেই কর্ণের মন্দির। মন্দিরটী রাস্তা হইতে একটী উচ্চস্থানে অবস্থিত। পিণ্ডার নদী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থলের নাম কর্ণপ্রয়াগ। পিণ্ডার নদীকে কর্ণগঙ্গাও বলা হইয়া থাকে। সঙ্গমস্থল সমুদ্রবক্ষ হইতে ২,০০০ ফিট উচ্চ। প্রয়াগস্থল অলকানন্দার বামতীরে ও কর্ণগঙ্গার দক্ষিণ তীরে

অবস্থিত। এখানকার বাজার ও যাত্রী থাকিবার ঘরগুলি কর্ণগঙ্গার বাম তীরে জল হইতে অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিত। কর্ণগঙ্গার উপর ২২১ ফিট লম্বা একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে।

সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া কর্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানে মহাবীর কর্ণ সূর্য্যদেবের তপস্যা করিয়া বহু সুবর্ণ ও ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে দাতাকর্ণ ১০০/ মণ স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এখানে অন্ন দান করিলে অনেক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তদর্থে ঘাট পুরোহিতকে ডাল, চাল দান করিলাম। কর্ণের মন্দিরে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম। একটী বৃহৎ ঘণ্টাও আছে। মন্দিরটী বহু প্রাচীন, শুনাযায় মাহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা মন্দিরাদি দর্শন করিয়া লৌহসেতু পার হইয়া চড়াইএর রাস্তায় কর্ণপ্রয়াগের বাজারে উপস্থিত হইলাম। বাজারটী পর্ব্বতগাত্রে সমতল স্থানে অবস্থিত। কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালার দ্বিতল গৃহে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বাজারে অনেকগুলি নানাবিধ জিনিষের দোকান, ডাক ও তার ঘর, পুলিশের চৌকীও একটী সরকারী হাস্পাতাল আছে। এখানে সরকারী ডাকবাংলাও আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ২০ মাইল। এই রাস্তায় নাগরাসু নামক স্থানে একটী সরকারী বাংলা আছে।

কর্ণপ্রয়াগ রাস্তার একটী কেন্দ্র স্থল। এখান হইতে তিনদিকে তিন রাস্তা গিয়াছে। এক রাস্তা নন্দপ্রয়াগ হইয়া বদরিকাশ্রম, দ্বিতীয় রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বার, এবং তৃতীয় রাস্তা মেহেলচৌরী হইয়া রামনগর।

ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া শান্তি আরও কয়েকবার বাহ্যে গেল। ঔষধে উপকার হইতেছে না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

আজ মোটের উপর ৭ বার বাহ্য হইল। বৈকালে হাস্পাতালে যাইয়া কিছু ঔষধ নিয়া আসিলাম। ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপাদি হইল তিনি দয়া করিয়া আমাকে শান্তির জন্য অর্দ্ধ সের গরুর দুগ্ধ দিলেন; তাহা বেলের শুঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। বেলশুঠ আমার সঙ্গেই আছে। হরলিক্স্ মিল্ক্, করনফ্লোর ও সঙ্গে আনিয়াছি। সন্ধ্যার পর একবার বাহ্য হইল কিন্তু তাহার পর রাত্রিতে আর বাহ্য হয় নাই। ডাক্তার বাবুও ধর্ম্মশালাতে আসিয়া শান্তিকে দেখিলেন এবং অভয় দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪২ দিবস, ৬ শ্রাবণ—

গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছে, অদ্য সকালেও বৃষ্টি হইতেছে। প্রমথ বাবু ও আমি পরামর্শ করিলাম আহারাদির পর আপন আপন গন্তব্য রাস্তায় রওনা হইব তাই আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। আজ সকালে শান্তি একবার বাহ্য করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল, গতকল্যের ন্যায় পাতলা নয়। প্রাণে জল আসিল। আহারাদির সময় শান্তি ভাতের জন্য কাঁদিতে লাগিল। আমার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খাওয়াইলাম। কপালে যাহাই থাকুক ক্রন্দন সহ্য করিতে পারি না, এই জন্য প্রমথ বাবু আমাকে কত কথাও শুনাইলেন। কি করিব এখন নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি। বেলা ১০টার সময় দেখি নাগপুরের ডাক্তার যাঁহাকে আমরা কুমার চটিতে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম তিনি বাজারের রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি এখানে আর বিশ্রাম করিলেন না, বলিয়া গেলেন ৪ মাইল দূরবর্ত্তী সিমলী চটিতে মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিবেন।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে আমি মাতাঠাকুরাণী ও শান্তিকে নিয়া

রামনগর যাইয়া ট্রেণ ধরিব, আর প্রমথ বাবুর দল রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইবেন। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখনকার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। সাধুজীও প্রমথ বাবুর সঙ্গে যাইবেন। আজ ৪২ দিবস যাবৎ আমরা এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছি, আমাদের মধ্যে কখনও বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। সুখেদুঃখে একেঅন্যের সাথী। যে সাধুজীর সঙ্গে কত গল্প ও গান করিতে করিতে রাস্তা চলিয়াছি তিনি এখন পৃথক হইবেন। এখন আমার একাই এই কঠিন রাস্তা হাটিতে হইবে। আমার মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারি না। সকলের নিকটেই বিদায় গ্রহণ করিলাম হয়ত বা এ জন্মে আর কখনও সাক্ষাৎ হইবে না। লোকের যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন একা আসে না। একেত বন্ধুবিচ্ছেদ তাহার উপর আবার শান্তির অসুখ। আর মাতাঠাকুরাণীর কথা কি লিখিব? তাঁহার কষ্টের পরিসীমা নাই। প্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি রাস্তা অতিক্রম করিয়া রাস্তার কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। সুদূর আসামের নিভৃত জঙ্গলে বসিয়া যখন এই সব কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি তখনও সেই দিবসের কথা মনে করিয়া চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে। পরে প্রমথ বাবুর সহিত নারায়ণগঞ্জে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু আমার সাধুজীর সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। হরিদ্বার ও হৃষীকেশ হইতে তিনি কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আমিও উত্তর দিয়াছিলাম, কিন্তু পরে আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার পত্র Dead letter office হইতে ফেরৎ আসিয়াছে। তিনি যে এখন কোথায় তাহা বলিতে পারি না। হিমালয়ের নিভৃত চটিতে বসিয়া যখন তিনি তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিতেন তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইত। এখনও তাঁহাকে আমার ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে পাইলে

তাহাকে প্রাণভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া যে কত সুখী হই এবং আমাদের হিমালয়ের দীর্ঘ প্রবাসের গল্প বলিতে বলিতে যে কত রজনী যাপন করিতে পারি তাহা বলিতে পারি না।

গত রাত্রিতে ধর্ম্মশালার বারেন্দায় আমরা সকলেই শয়ন করিয়াছিলাম। সকালে টের পাই নাই, যখন বেলা হইয়াছে তখন দেখি আমার দুইটা ছাতা নাই আরও পরে জিনিষপত্র বাঁধিবার সময় দেখি একখানা কম্বলও নাই। রাত্রিতে এখানে আরও যাত্রী ছিল তাহারাই বোধহয় চুরী করিয়াছে। ধর্ম্মশালা হইতে আমরা রওনা হইয়া প্রমথ বাবুকে সঙ্গে করিয়া থানায় যাইয়া এজাহার করিয়া আসিলাম কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আর চুরীর তদন্ত হইয়াছে কি না তাহাও জানি না। কম্বলখানা চুরী গিয়াছে তাহাতে আক্ষেপের কিছু নাই কিন্তু ছাতার জন্য বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখন গরম দেশে আসিয়া পড়িয়াছি, রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিয়াই আছে। মাতাঠাকুরাণী ও আমার মাথার উপর দিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি চলিয়া যাইতে লাগিল। যে একটা ছাতা ছিল তাহা দ্বারা শান্তিকে রক্ষা করিলাম। ভ্রমণের শেষ সময়টা কষ্টের উপর কষ্ট পাইতে লাগিলাম।

প্রমথ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তিকে সঙ্গে করিয়া রওনা হইলাম। রাস্তা উৎরাই।

দুই মাইল পরে দেখি **আরাম চটি** শূন্য পড়িয়া আছে। আরও দুই মাইল চলিয়া **সিমলী চটিতে** উপস্থিত হইলাম, তথায় নাগপুরের ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখন আমরা একসঙ্গে হাটিতে আরম্ভ করিলাম। এই চটিতে কয়েকখানা ঘর, দোকান ও ডাকঘর আছে। চটির কিছু পরে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে, তাহা পার হইয়া অল্প চড়াই উঠিতে

হইল। পরে সিলোণী চটি অতিক্রম করিয়া ভাটোলী চটিতে উপস্থিত হইয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। চটিতে পিচ্ ফলের গাছ আছে। আমরা কয়েক পয়সার ক্রয় করিলাম। এখানে থাকিবার জন্য চটিওয়ালা বলিল কিন্তু আমরা তাহার কথা গ্রাহ্য করিলাম না। তখনও অল্প বেলা আছে আমরা আরও দুই মাইল চলিয়া সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল চটিতে উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টি হওয়াতে আমাদিগকে ভিজিতে হইয়াছিল।

উজ্জ্বল চটিতে উপস্থিত হইয়া আমাদের চক্ষু স্থির। স্থানাভাব, একখানা মাত্র ঘর, আর একখানা ছোট ঘরে দোকান। চটির ঘরে একধারে জল পড়িয়া কাঁদা হইয়াছে, অপর ধারে কতকগুলি যাত্রী স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে। দোকানদারকে বলাতে ছোট ঘরখানা আমাদের ছাড়িয়া দিল। আমরা তিন জনে তাহাতেই রাত্রি বাস করিলাম। ঘরখানা জিনিষপত্রে ভরিয়া গিয়াছে আর একটা বিচ্ছুও মারা গেল। আর এই ঘরখানিতে এত অধিক ছার পোকা যে আমাদের সমস্ত বিছানাময় হইয়া গেল। এই ছারপোকার কামড়ে সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারিলাম না। মাতা-ঠাকুরাণী দুইএক ঘণ্টা ঘুমাইলেন। আর আমি বারংবার বিছানা ঝাড়িয়া ছারপোকা তাড়াইতে তাড়াইতে রাত্রি ভোর করিলাম। এই রাত্রির কষ্টের কথা চিরজীবন স্মরণ থাকিবে।

৪৩ দিবস ৭ই শ্রাবণ—

গত কল্য কর্ণপ্রয়াগ হইতে রওনা হইবার সময় দেখি কৃষ্ণার হাত ও পা ফুলিয়া গিয়াছে। সে চলিতে পারে না অতি কষ্টে চলিতেছে। সিমলী চটিতে পৌঁছিয়া সে একটা লোকের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

এই নূতন লোকটীই এখন শান্তির কাণ্ডী বহন করিতেছে। কৃষ্ণাও আস্তে আস্তে হাটিয়া আসিয়া এই উজ্জ্বল চটিতে রাত্রি বাস করিল। হিসাব করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা দিলাম। এখন তাহার বিদায় গ্রহণের সময়। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। শান্তিও কাঁদিতে লাগিল। কৃষ্ণাও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। এই ৪৩ দিবস আমাদের সঙ্গে হিমালয়ের রাস্তায় ঘুরিতেছে এবং শান্তির জন্য সে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। দোকানদার আমাদের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল এবং সেও আক্ষেপ করিতে লাগিল। দেড় মাস যাবৎ শান্তিকে পিঠে করিয়া ঘুরিয়াছে এবং কত খেজমৎ করিয়াছে। আমি চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে কৃষ্ণার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। এখনও তাহার কথা মনে পড়ে। তাহাকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছি এবং সেও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে উত্তর দিয়াছে।

আমার মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বেই নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত রওনা হইয়া গিয়াছেন। আমরা ৬॥ টার সময় রওনা হইলাম। শান্তির রাত্রিতে বাহ্য হয় নাই। চটির প্রায় এক মাইল পরে রাস্তার কিনারে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরের মন্দির দেখিলাম তথায় এক দেবতা আছেন, প্রণামও করিয়াছিলাম কিন্তু দেবতার নামটী আমার খাতায় লেখা নাই। নিকটে একটী রাস্তা পৌড়ীরদিকে এবং অন্য একটী রাস্তা লোভার দিকে গিয়াছে।

আদবদ্রী

২৮ মাইল দূরবর্ত্তী আদবদ্রীতে উপস্থিত হইয়া দেবদর্শন করিলাম। এখানে ১৬টী ছোট ছোট মন্দির আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি

ভগ্নাবশেষ মাত্র। এই মন্দিরগুলি ৬ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। সকল মন্দিরগুলিই প্রস্তরনির্ম্মিত। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। অন্নপূর্ণা, হনুমান, গরুড়, কেদারেশ্বর, জানকী প্রভৃতিরও মূর্ত্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদ যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সকলগুলি মন্দির ৮৫ ফিট দীর্ঘ ও ৪২ ফিট প্রস্থ একটী ছোট স্থানের মধ্যে অবস্থিত। এখানে সরকারী বাংলা ও গ্রাম্য ডাকঘর আছে। আদবদ্রীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে "বেণীতাল" নামক একটী ক্ষুদ্র হ্রদ আছে তথায় পূর্ব্বে একটী চা-বাগান ছিল কিন্তু এখন তাহার অবস্থা শোচনীয়।

আদবদ্রী লোভা হইতে ১০।০ মাইল এবং কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১১৮ মাইল।

আদবদ্রী হইতে যাত্রী রাস্তা দেওয়ালী খাল নামক গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৫,৪৭৯ হইতে ৮,৫৫৩ ফিট। দেওয়ালীখাল সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৭,২০০ ফিট উচ্চ। এই গিরিসঙ্কটের নিকটে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেড় মাইল নিম্নে ডিমডিমা নামক স্থানে বনবিভাগের একটী বাংলা আছে।

আমি শান্তিকে নিয়া শ্রীশ্রী৺বদ্রীনারায়ণ দেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অন্যান্য দেবতা দর্শন করিলাম। এদিকে বেলাও হইতেছে তাই শান্তিকে Horlick's milk (হরলিক্স 'মক্') খাওয়াইবার জন্য মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক জন লোকের নিকট হইতে দুইটী পয়সা দিয়া এক বাটি গরম জল করাইয়া নিলাম। তাহাকে খাওয়াইয়া পরে রওনা হইলাম। এখান হইতে চটি অনদূরে, অনেকগুলি ঘর দেখিলাম। এক দোকান-দারের নিকট গরুর দুগ্ধ ছিল তাহা অর্দ্ধ সের ক্রয় করিলাম।

এখান হইতে অর্দ্ধ মাইল পরে চড়াই আরম্ভ। চড়াই তেমন কঠিন নয়, রাস্তা ভাল। আদবদ্রী হইতে জঙ্গল চটি ৫ মাইল ইহার মধ্যে সারে চারি মাইল চড়াই। **ক্ষেত্রী চটিতে** পৌঁছিয়া দুগ্ধ গরম করার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। দোকানদার কাষ্ঠ দিল না চটিতে একখানা মাত্র ঘর তথায় কয়েক জন লোক রান্না করিতেছে। রাস্তার মধ্যে একখানা অয়েলক্লথ বিছাইয়া শান্তিকে শোয়াইয়া রাখিলাম, জ্বর ও উদরাময়ে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে সে আর এখন বসিয়া থাকিতে পারে না। মাছির উপদ্রবের জন্য তাহার শরীর আমার চাদরখানা দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। রাস্তার কিনারে যে সব শুষ্ক ডাল ছিল তাহা জ্বালাইয়া দুগ্ধ গরম করিয়া শান্তিকে খাওয়াইলাম। শান্তিকে নিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। অদৃষ্টে যে কি আছে বলিতে পারি না।

জঙ্গল চটিতে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত করিলাম। মাতাঠাকুরাণী নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চটিতে কয়েকখানা খড়ের ঘর আছে কিন্তু দোকান নাই। আমাদের সঙ্গে চাউল, ডাইল ছিল তাই রক্ষা নচেৎ উপবাস থাকিতে হইত। কতক যাত্রী এখানে রান্না করিতে লাগিল আর কতক আটা প্রভৃতি না পাইয়া পরবর্ত্তী চটিতে চলিয়া গেল। এখানে আসিয়া শান্তি শুইয়া পড়িল কিছুই খাইতে চায় না। Cornflour (করন্ ফ্লোর) তৈয়ার করিয়া কিছু খাওয়াইলাম। ঝরণার জলে কয়েকখানা কাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিলাম পরে আহারাদি করিয়া রওনা হইলাম। নাগপুরের ডাক্তার আমাদের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে রওনা হইয়া গেলেন। এইবার মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল।

আমরা রওনা হইয়া উৎরাইর রাস্তায় এই গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেড় মাইল দূরবর্ত্তী **দেওয়ালী চটিতে** একখানা সুন্দর দ্বিতল চটি আছে। ঘরখানা বেশ পরিষ্কার, এখানেও শাস্তি একবার বাহ্যে গেল। পরে **কালিমাটি ও রসুইঘাট চটি** অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় **গোহার গাধেরা** চটিতে উপস্থিত হইলাম। চটির ঘরখানা দ্বিতল কিন্তু আবর্জ্জনাতে পরিপূর্ণ। অল্প কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া তথায় বিছানা পাতিলাম। নিকটে আরও কয়েক জন যাত্রী বিশ্রাম করিতেছে। রাস্তায় একদল মারোয়ারী যাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দলে প্রায় ২০।২৫ জন লোক। ২।৩ জন পুরুষ আর সকলেই স্ত্রী লোক। তাঁহারা নারায়ণ দর্শন করিতে চলিয়াছেন। শাস্তি রাত্রিতে আর কিছুই খাইল না। জ্বরও হইয়াছে। আমি ও মাতাঠাকুরাণী উভয়ে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন মনে হইতেছে কতক্ষণে এই হিমালয় ভ্রমণ শেষ হইবে। রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী সকল রাত্রির মত খিচুড়ী রান্না করিয়া দিলেন।

৪৪ দিবস, ৮ই শ্রাবণ—

প্রাতে রওনা হইলাম। অল্প দূরে সরকারী বাংলা, এখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বেশ সুন্দর। এই স্থানটী একটী বিস্তৃত খোলা জায়গায় অবস্থিত, নাম **লোভা**। নিকটে গেরসেন ও রাঁধিয়া নামক স্থানের নামানুসারে এই স্থান ও এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামগঙ্গার বামতীরে অবস্থিত। পটৈ হইতে ১৪ মাইল এবং আদবন্ত্রী হইতে ১১।০ মাইল ব্যবধান। কুমাউন ও গাড়োয়াল

জেলার সীমানার মধ্যস্থিত সূচাগ্র উচ্চ পর্ব্বতের উপর লোভা নামকএকটী দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের নামানুসারে এই স্থানের নাম লোভা হইয়াছে।

লোভা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে **খুনার ঘাট** চটি। ইহা একটী বড় চটি, রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেক গুলি ঘর, ও দোকানপাট আছে। এখানে একটী ডাকঘর ও পুলিশের ফাঁড়ি আছে। ডাক ঘরের নাম লোভা। এস্থানে অল্প বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা ঠিক গ্রাম্য রাস্তার ন্যায়, চড়াই উৎরাই নাই।

ভারিমডালি চটির নিকট মুসলমানের একখানা বড় দোকান আছে। তথায় সর্ব্বপ্রকার জিনিষপত্র পাওয়া যায়। দোকানদারের নাম মিরজান খান ও আবদুলবলি খান। এখানে দেখিলাম পার্ব্বত্য লোকের নির্ম্মিত বেশ সুন্দর কম্বল পাওয়া যায়, আমাকে খুব আদর যত্ন করাইয়া বসাইল এবং কয়েকটী পিচফল ও এপেল দিল। রামগঙ্গার পার দিয়া বরাবর চলিতেছি। শান্তির বসিয়া থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। আমি তাহার কাণ্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছি। শান্তি যখন মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল "বাবা, ভাল লাগে না"। তখন তাহার কথাগুলি এভাবে আমার প্রাণে আঘাৎ করিতে লাগিল যে হৃদয়ের তন্ত্রী সকল যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। আমি এখন কলের পুতুলের ন্যায় চলিতেছি। এখন মনে হইতেছে আমার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াও যদি এই শিশুর জীবন রক্ষা করিতে পারি তবে তাহাতেও রাজী আছি। কায়মনবাক্যে বদরীনারায়ণকে ডাকিতেছি "প্রভো একি করিলে, তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়া অবশেষে আমাকে এ প্রকার বিপদে ফেলিলে, শিশুর জীবন ভিক্ষা করিতেছি, এই দীনহীন জনের কাতর আহ্বান অবহেলা করিও না, আমার এ মিনতি"।

মেহেল চৌড়ী

বেলা ১২টার সময় মেহেল চৌড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম এ না জানি কত বড় স্থান, কিন্তু এখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির। কয়েকখানা নীচু খড়ের ঘর, একখানা মাত্র দ্বিতল পাকা বাড়ী তথায় একধারে নাগপুরের ডাক্তার ও অপর ধারে অন্যান্য যাত্রীরা আহারাদি করিতেছে। ঘরের ঘরের যে অবস্থা তাহাতে আর থাকিতে প্রবৃত্তি হয় না। নাগপুরের ডাক্তার যথায় ছিলেন তথায় একখানা বিছানা করিয়া শান্তিকে শোয়াইলাম। আমাদের আহারাদির জন্য একখানা কোঠা পরিষ্কার করাইয়া নিলাম। আহারাদির পর তিনি চলিয়া গেলে আমাদের স্থান হইবে। একখানা মাত্র ছোট দোকান আছে সেখানে আমাদের ডাইল, চাউল খরিদ করিলাম। আমাদের জিনিষপত্র এখানে ওজন করিয়া আমাদের কুলিদের বিদায় করিয়া দিলাম। যে কুলিটার নিকট আহার্য্যদ্রব্যের বস্তা ছিল সে কতক জিনিষ চুরি করিয়াছে। রাস্তাতে বস্তা খুলিয়া নারিকেল প্রভৃতি জিনিষ অপহৃত করাতে তাহার প্রাপ্য ভাড়া হইতে দুই টাকা কম দিলাম সে কিন্তু অনেক আপত্তি করিল, আমি তাহা শুনিলাম না। এখানকার পুলিশের হেড কনেষ্টবলও উপস্থিত ছিল, সেই সব হিসাব করিয়া কুলিদের বুঝাইয়া দিল। এখন আমাদের নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপরাহ্নে একজন কাণ্ডীওয়ালা ও তিন জন কুলির বন্দোবস্ত হইল। এখান হইতে শ্রীকোট পর্য্যন্ত কাণ্ডীওয়ালার ভাড়া ৯৲, আর মালের ভাড়া মণ প্রতি ১০৲। এখানে ঘোড়াও পাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি মাল ও যাত্রী উভয়ই বহন করিতে পারে।

এখান হইতে রামনগর ৭০ মাইল এবং কর্ণপ্রয়াগ ২ মাইল। এস্থানটী গাড়োয়াল ও আলমোরা জেলার সীমাস্থল এব রামগঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে ডাকঘর ও পুলিশে চৌকী আছে।

নাগপুরের ডাক্তারও শান্তিকে দেখিলেন এবং অভয়দান করিয় বলিলেন কোনও চিন্তার কারণ নেই, ভাল হইয়া যাইবে। আমা মন আর মানে না; আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনিও আক্ষে করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোড়াব বন্দোবস্ত করিয়া প্রায় ৪ টার সময় চলিয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী শান্তির জন্য থানকুনি পাত ও কাঁচা কলার ঝোল ও গলাগলা ভাত পাক করিলেন। আমাদের আহারাদি করিতে ৩টা বাজিয়া গেল। আজ এখানেই থাকিব। শান্তি আর কাণ্ডীতে বসিয়া থাকিতে চায় না, বিছানায় শুইয়া থাকিলে যে আরাম বোধহয় ও রোগের উপসম হয় তাহা বসিয়া বসিয়া কখনই হইতে পারে না। ২ দিবস যাবৎ আমি খালি পায় হাটিতেছি। এখন আর জুতা পায় দিতে পারি না, পায় ঘা হইয়াছে ও ফাটিয়া গিয়াছে। রামনগর পর্য্যন্ত আর জুতা পায় দেই নাই। যেখানে রাস্তা ভাল তথায় খালি পায় বেশ আরাম বোধহয়, আর যেখানে ছোট ছোট প্রস্তরের টুকুরা পড়িয়া আছে তথায় অত্যন্ত কষ্ট বোধহয়।

শান্তির জ্বর ও উদরাময় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কমিয়াছে। বহু চেষ্টায় সামান্য গরুর দুগ্ধ সংগ্রহ করিলাম। আমার সঙ্গের Horlick's milk এখানে শেষ হইয়া গেল। শুধু Cornflour আছে। বিকালে খুব বৃষ্টি হইল। চটির পশ্চাৎদিকে এক উচ্চ পর্ব্বত, ইহা আমাদিগকে পার হইতে হইবে।

১৫ দিবস, ৯ই শ্রাবণ—

গত রাত্রিতে শান্তির বাহ্য হয় নাই, সকালেও হয় নাই। সকালে রওনা হইয়া এক মাইলের একটী উচ্চ চড়াই উঠিতে হইল। এই চড়াইর নাম "পাণ্ডুয়া খাল"। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৬,০০০ ফিট উচ্চ। এখানকার লোকেরা গিরিসঙ্কটকে "খাল" বলে। চড়াইর উপরিভাগে জলছত্র আছে। আমরা চড়াই উঠিতেছি এমন সময় দেখি একজন খুব বলিষ্ঠ লোক, লেংটি ও একটী কমণ্ডলু ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাদের অগ্র পশ্চাতে কখনও বা রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলের ও নালার মধ্য দিয়া চলিতেছে। এই লোকটী কাহারও সহিত কথা বলে না নিজের মনে চলিতেছে। কয়েক মাইল পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম, পরে আবার রামপুর চটির নিকট দেখি ঝরণার নিকট বসিয়া আহার করিতেছে। পরে আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই।

এই এক মাইল চড়াইএর পর আবার উৎরাই, পরে সিমল-খেত চটি। চটিওয়ালা বলিল নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে লৌহখণি আছে। পূর্ব্বে এই স্থানকে লোহাগড় বলিত এবং নেপালের রাজধানী ছিল।

এখান হইতে রাস্তা ঠিক গ্রাম্য রাস্তার ন্যায় সমতল। ৯।১০ মিঃ সময় শান্তির জ্বর আসিল, দ্বিপ্রহরে শরীরের তাপ ১০৩·৬ ডিগ্রি। অত্যন্ত চিন্তায় পড়িলাম। কাণ্ডীতে বসিয়া ছটফট করিতেছে, হাত পা ঠাণ্ডা। এক ঝরণার নিকট বসিয়া তাহার মাথায় জল দিলাম এবং মকরধ্বজ খাওয়াইলাম। রাস্তার ধারে চটির নিকট অনেক কাঁচা কলার গাছ আছে। কিন্তু কেহ বিক্রয় করিতে চায় না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া একটী লোকের নিকট কয়েকটা কাঁচা কলা

অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিলাম। এক স্থানে দেখিলাম একটা লোক লাল কুমড়ার ডোগাগুলি কাটিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিতেছে। তাহাকে বলাতে সে কয়েকটা কুমরের ডোগা দিল। অবশ্য তাহাকে পয়সা দিতে হইয়াছিল। পাহাড়ীরা বিনামূল্যে কিছুই দেয় না। আমরা অবশেষে একটা বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়া ১২টার সময় গনাই চটিতে পৌঁছিলাম।

গনাই বা চৌখাটীয়া

এই চটি রামগঙ্গার তীরে আলমোড়া জেলার অন্তর্গত শস্যশ্যামলা সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। চটির নিকট বিস্তৃত সুন্দর উপত্যকা। চটির ঘর বেশ বড় ও পরিষ্কার। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে "তড়াগ-তাল" নামক একটী হ্রদ আছে। লৌহনির্ম্মিত সেতু পার হইয়া বাজার এবং এই স্থানে রাস্তা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, একটী রাস্তা "খারাগাধ" নামক জলস্রোতের তীর দিয়া দোয়ারাহাট ও রাণীক্ষেত হইয়া কাঠগুদাম গিয়াছে এবং অপরটী রামগঙ্গার তীর দিয়া মাসী, ভুজারঘাটী হইয়া রামনগর গিয়াছে। এই শেষোক্ত রাস্তায় যাত্রীরা যাতায়াত করিয়া থাকে। বাজারের সংলগ্ন একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি সরকারী ডাকবাংলা, নিম্নে রাস্তার পার্শ্বে হাস্পাতাল। এই হাস্পাতাল সদাব্রতের ব্যয়ে চলে। নিকটেই পুলিশের থানা।

যে পারে চটি সেই পারে ডাকঘর। পূর্ব্বে যাত্রীরা কাঠগুদাম হইয়া যাতায়াত করিত কিন্তু এখন আর এই রাস্তায় কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করে না কারণ রাণীক্ষেতে ছাউনি থাকায় যাত্রীদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এখন রামনগর রেলষ্টেশন হইয়াছে বটে কিন্তু রাস্তার চটির অবস্থা ভাল নয়। চটিগুলি ছোট ছোট এবং মধ্যে মধ্যে জলকষ্টও

আছে। গনাই চটি হইতে দুই মাইল দূরে "লক্ষণপুর" নামক একটী পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে এখানে বিরাট রাজার রাজ্য ছিল, এবং কিচকবধের স্থানও ঠিক হইয়া গিয়াছে! আমরা শুনিয়াছি কুচবিহারে বিরাটরাজার গড় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন কোনটা সত্য?

চটিতে উপস্থিত হইয়া আমরা মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত করিলাম। রামগঙ্গাতে স্নান করিলাম ও কয়েকখানা কাপড় সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিলাম। জল বেশ পরিষ্কার। চটিওয়ালার নিকট বেশ বড় বড় অনেক পাঁকা আম দেখিলাম। বড় বড় আম টাকায় পাঁচটা বেশ মিষ্টি। আমি কয়েক টাকার আম ক্রয় করিলাম। ছোট মিষ্টি আমও বিস্তর পাওয়া গেল। এত পাকা আম হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেখি নাই। আম দেখিয়া প্রমথ বাবু ও সাধুজী প্রভৃতির কথা মনে হইল। রাস্তায় এই প্রকার আম পাওয়া গেলে তাঁহারা কত সন্তুষ্ট হইতেন।

নাগপুরের ডাক্তার এই চটিতে মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন। তিনি শান্তিকে দেখিলেন, বলিলেন কোনও ভয় নাই। অপরাহ্নে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এ জীবনে আর হইবে কি না কে বলিতে পারে?

এত ভাল ভাল আম শান্তিকে না খাওয়াইয়া রাখিতে পারিলাম না। বিকালে দুই বার বাহ্য হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল, জ্বরও এখন ছাড়িয়াছে। অপরাহ্নে হাসপাতাল হইতে ঔষধ নিয়া আসিলাম। ডাক্তারের নাম C. D. Pant, S. A. S. তাঁহার সহিত আলাপ হইল এবং তিনিও শান্তিকে দেখিয়া গেলেন। আজ আমরা এখানেই থাকিলাম। যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও শান্তির জন্য রওনা হইতে

পারিলাম না। বিশেষতঃ চটিখানা ভাল এবং আহার্য্যদ্রব্য সকলই পাওয়া যায়।

৪৬ দিবস, ১০ই শ্রাবণ—

সকালে ৬।০ টার সময় রওনা হইলাম। কাণ্ডীওয়ালা আমের বোঝা নিতে গোলমাল আরম্ভ করিল। আমার অপরাধ যে কাণ্ডীর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আম দিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম রাস্তায় এ সব খরচ হইয়া যাইবে সেজন্ত এত ভাবনা কেন, না হয় কিছু অতিরিক্ত পয়সা দিব।

শান্তি আজ অনেকটা ভাল আছে। গনাই চটি ছাড়িয়া কিছু দূর যাওয়ার পর দেখিলাম একস্থানে তেজমল নামক বৃক্ষের যষ্টি বিক্রয় হইতেছে। এই যষ্টির গুণ এই যে ইহানাকি সর্পভয় নিবারণ করে। অনেক যাত্রীর হস্তে এই তেজমলের যষ্টি দেখিয়াছি। রাস্তা বেশ ভাল গ্রাম্য রাস্তার ন্যায় কিন্তু চটিগুলি খুবই খারাপ। রামগঙ্গার বামতীর দিয়া চলিতেছি। মাসী চটিতে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। এই চটিতে কয়েক ঘর মুসলমান দেখিলাম। আমরা ভিন্ন চটিতে অপর যাত্রী নাই। চটির ঘরখানা বড় এবং দ্বিতল। সম্মুখে রামগঙ্গা কিন্তু ইহার জল কেহ ব্যবহার করে না। চটি হইতে ৫ মিনিটের রাস্তায় একটী প্রস্তরের চৌবাচ্চার মধ্যে পরিষ্কার ঝরণার জল। গ্রামবাসীরা তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে। নিকটেই বেগবতী স্রোতস্বিনী, তাহাতে স্নান করিয়া আসিলাম। চটির নিকটে রামগঙ্গার উপর একটী লৌহনির্ম্মিত ঝোলান সেতু আছে। সেতু পার হইয়া একটী রাস্তা পৌরী গিয়াছে এবং একটী রাস্তা নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া বুড়া কেদার নামক শিবমন্দিরের দিকে গিয়াছে। নদীতে জল অধিক থাকিলে এই রাস্তায় যাইয়া বুড়া কেদার দর্শন

করিতে হয়। আমরা রামগঙ্গার বামতীর দিয়া যখন বুড়া কেদারের ঠিক অপর তীরে উপস্থিত হইলাম তখন নদীতে অনেক জল থাকাতে পার হইতে পারিলাম না। আর এখানে আমাদের দেশের স্থায় নদীতে খেয়া নৌকা নাই। তাই আমাদের ভাগ্যে বুড়া কেদার দর্শনলাভ হইল না। বুড়া কেদার একটী গোল দীর্ঘ প্রস্তর, দৈর্ঘ্যে ৬।৭ হাত ও বেড় ৩।৪ হাত, ভূমিতে পতিত অবস্থায় বিরাজমান। আমরা তীর হইতে অপর পারের মন্দির ও লোকজন সকলই দেখিতেছিলাম কিন্তু যাইতে পারিলাম না। আমরা দেবাদিদেব কেদার নাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। এই স্থানে হিমালয়ের তীর্থ শেষ হইল। এখানে দেখিলাম ছত্রী ও ব্রাহ্মণেরা জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে। একজন লোকে আমাকে একটী মাছও দিতে চাহিল কিন্তু আমার "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।"

আজ বেলা প্রায় ১টার সময় শান্তির অল্প জ্বর হইল কিন্তু আবার বিকালে ছাড়িয়া গেল। সে আজ অনেক ভাল বোধ করিতেছে। বুড়া কেদারের পর রাস্তা ছোট ছোট প্রস্তরে পরিপূর্ণ। আমি খালি পায় হাটিতেছি, এ যাবৎ বেশ আরামের সহিতই হাটিয়াছি কিন্তু এখন এই ছোট ছোট প্রস্তরে লাগিয়া পা দুখানা ব্যাথা হইয়া গেল। আমরা অনেকগুলি ছোট ছোট চটি পার হইয়া সন্ধ্যার সময় অগুলা চটিতে উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইখানা বড় বড় ঘর আছে। কাণ্ডীওয়ালা ব্রাহ্মণ তাহাকে দিয়া অপর ঘরগুলি খালি পড়িয়া আছে। রাত্রিতে রুটি তৈয়ার করাইয়া নিলাম।

৪৭ দিবস, ১১ই শ্রাবণ—

আজ শান্তি ভাল আছে জ্বর নাই এবং তাপ বাহ্য করিয়াছে। আমার মনটাও ভাল। সকালে রওনা হইবার সময় আমার মাতাঠাকুরাণী

ভুলক্রমে বদরীনারায়ণের রাস্তায় অর্থাৎ আমরা যে রাস্তায় আসিয়াছি সেই রাস্তায় কতকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। কাণ্ডীওয়ালাকে পাঠাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলাম। ভিখিয়াসৈন আসিয়া আমাদিগকে হাঁটিয়া নদী পার হইতে হইল, নদীর নাম "গগাস" বা "চন্দ্রভাগা"। রামগঙ্গা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে ভিখিয়াসৈন গ্রাম। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি ও ডাকঘরংআছে। সঙ্গমস্থলে নকুলেশ্বর দেবের একটী মন্দির আছে। নদীতে খুব স্রোতের বেগ, লোকের সাহায্যে যষ্টি ধরিয়া পার হইতে হয় নচেৎ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। জন প্রতি ৴১০ পয়সা নিয়া থাকে। আমরা নদী পার হইয়া একটী চড়াই উঠিতে লাগিলাম। ভিখিয়াসৈন হইতে একটী ফাঁড়ি পথে মোহন নামক স্থান দিয়া রামনগর যাওয়া যায় কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্গম।

শ্রীকোট—তিন মাইল চড়াই উঠিয়া বেলা ১০॥০ টার সময় এখানে উপস্থিত হইলাম। আজ আমরা হিমালয় ভ্রমণের শেষ চড়াই অতিক্রম করিলাম। এই চড়াই উঠিতে জল কোথাও পাওয়া যায় না। চটির নিকটবর্ত্তী হইয়া একস্থানে সামান্য জল পাইলাম। এখানে জল কষ্ট। চটি হইতে অনেক নিম্নে এক স্থান হইতে জল আনিতে হয়। এখানে উপস্থিত হইয়া মেহেল চৌড়ার কুলিদের বিদায় দিলাম। কেবল একজন লোক সঙ্গে থাকিল। সে রামনগর পর্য্যন্ত যাইবে কিন্তু কোন মাল বহন করিবে না; আমাদের সঙ্গে থাকিবে এবং যে সামান্য কাজের দরকার হয় তাহা করিয়া দিবে। তাহাকে এক টাকা অতিরিক্ত দিব। এই চটিতে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত করিলাম। দিনের বেলা কোন গরুর গাড়ী মিলিল না। নিকটবর্ত্তী গ্রামে সংবাদ দিলাম কিন্তু অতিরিক্ত ভাড়া চাহিল। এখান হইতে রামনগর পর্য্যন্ত গাড়ীর ভাড়া জনপ্রতি তিন চারি টাকা। প্রত্যেক গাড়ীতে ৪ জনের বেশী

বসিতে পারেনা, শয়ন করা ত দূরের কথা। সন্ধ্যার সময় খরগপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামবালক মিশ্র, তাঁহার মাতা, স্ত্রী এবং একটী শিশুকে নিয়া গরুর গাড়ীতে এখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আবার ২ জন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণী আছেন। তাঁহাদের ভাষা বুঝিবার সাধ্য নাই। মিশ্র মহাশয়ের সহিত রাস্তার বিষয় অনেক আলাপাদি হইল। তিনি B. N. Ry. Loco Departmentএ কাজ করেন। তাঁহার গাড়ীখানা ২০৲ টাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া লিখাপড়া করিয়া নিলাম। এখানে দেখিলাম একজন মেথর আছে। হিমালয়ের আর কোনও চটিতে মেথর দেখি নাই। যাত্রী বন্ধ হওয়াতে তাহাদেরও আর কাজ নাই। শ্রীকোট হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য খুব চমৎকার। দূরে পর্ব্বতগায় রাণীক্ষেতের রাস্তা দেখাইতেছে। এখান হইতে আরও দেখিলাম যে একটী নূতন রাস্তা তৈয়ার হইতেছে, তাহা চন্দ্রভাগা নদীর অপর তীর দিয়া ভিথিয়াসৈন পর্য্যন্ত যাইবে।

৪৮ দিবস, ১২ই শ্রাবণ—

অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতেই ৪।৹ টার সময় যাত্রা করিলাম। শান্তির জন্য বাধ্য হইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিতে হইল। মাতাঠাকুরাণী হাঁটিয়া চলিলেন। রাস্তা খুব ভাল। ব্যাসকোট ও ছোট সিম চটির মধ্যে শিয়ালকোটে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাকে ভিখিয়াসৈনের ডিস্পেনসারী বলে। এখানে যাইয়া পায় ঘায় ঔষধ লাগাইলাম। একটী বেণ্ডেজও চাহিয়া আনিলাম। ডাক্তার একটী ছোট বেণ্ডেজ দিলেন বলিলেন আজকাল কেহ ঘাতে বড় বেণ্ডেজ বাঁধে না। তথাস্তু! ডাক্তার খানায় দ্বিতীয় জন প্রাণীর দেখা পাইলাম না। গুজর ঘাটিতে আসিয়া খুব প্রশস্ত রাস্তায় পড়িলাম।

এই রাস্তা দিয়া সৈন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে। রাস্তা এত ভাল যে মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এই রাস্তা রাণীক্ষেত হইতে রামনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই চটিতে জল কষ্ট।

নয়াপানী নামক স্থানে একখানা দোকান ও একখানা চালা ঘর আছে, তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিলাম। এখানে বাঘের ভয় আছে। রাত্রিবাসের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য স্থান। রাস্তাতে বহু গরুর ও মহিষের গাড়ী মালপূর্ণ করিয়া রামনগর হইতে আসিতেছে এবং অনেক খালি গাড়ী রাণীক্ষেত হইতে রামনগর ফিরিতেছে। এখন আর রাস্তার ভীষণতা নাই। দেওখান চটিতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিবাস করিলাম। একখানা মাত্র দোকান এবং তাহার সংলগ্ন একখানা কোঠা ঘর। ছাদ এত নীচু যে মাথায় ঠেকে। এখানে দেখিলাম ঘোড়া, গরু ও মহিষ প্রভৃতি মাল বহনকারী পশুর জলপানের নিমিত্ত ঝরণার নিকট বড় বড় চৌবাচ্চা করিয়া রাখিয়াছে। তথায় তাহারা ইচ্ছা মত জলপান করিয়া থাকে।

গুজর ঘাটি হইতে রামনগর পর্য্যন্ত রাস্তা অল্প অল্প উৎরাই। আজ শান্তি ভাল আছে।

৪৯ দিবস, ১৩ই শ্রাবণ

ভোরে ৬৷৹ টার সময় রওনা হইয়া ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। দেওখান চটি হইতে গরজীয়া পর্য্যন্ত ভীষণ অরণ্য, গবর্ণমেন্টের রিজার্ভ জঙ্গল। পদো চটির পর দুই মাইলের একটী কাঁড়ি রাস্তা দিয়া চৌটাম যাওয়া যায় কিন্তু সরকারী রাস্তা দিয়া ৩ মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। মাতাঠাকুরাণী এই সহজ রাস্তায় চলিয়া গেলেন। আমরা যখন চৌটাম উপস্থিত হইলাম

তখন দেখি তাঁহার রান্না প্রায় হইয়া গিয়াছে। এখানে একটী সরকারী বাংলা আছে। একখানা ছোট ধর্ম্মশালার ঘরও আছে কিন্তু তাহা আবর্জ্জনাতে পরিপূর্ণ। রামনগরের রাস্তায় চটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একখানাও ভাল ঘর দেখি না। টোটাম হইতে একটী ফাঁড়ি পথে কুমেরিয়া যাওয়া যায় কিন্তু অত্যন্ত জঙ্গল।

সন্ধ্যার সময় আমরা কুমেরিয়া চটিতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করি। চটির ঘরখানা আমাদের দেশের আটচালা ঘরের ন্যায়, ভাঙ্গা চাল, জল ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, একধারে দোকান। দোকানদার আমাদিগকে পুরী তৈয়ার করিয়া দিল। অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইলাম। এখানে একখানা সরকারী বাংলা ছিল কিন্তু তাহা পুড়িয়া গিয়াছে। এখান হইতে রামনগর ১৭॥০ মাইল। হিমালয়ের চটিতে রাত্রিবাস আজই শেষ হইল। আগামী কল্য যে প্রকারেই হউক রামনগর পৌঁছিতে হইবে। চটির নিকট কুশী নদী।

৫০ দিবস, ১২ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৮ সাল—

আজ আমাদের হিমালয় ভ্রমণের শেষ দিবস। গাড়োয়ানকে বলিলাম আজ যে প্রকারেই হউক সন্ধ্যার মধ্যে রামনগর উপস্থিত হইতে হইবে। আমি পদব্রজে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণী শান্তির সহিত গাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। প্রথমে বেশ উৎসাহের সহিত চলিতেছিলাম কিন্তু শান্তির অসুখে এখন আর আমার তেমন সাহস ও বল নাই। এখন শুধু কলের পুত্তলিকার ন্যায় রাস্তা অতিক্রম করিতেছি। মনে হইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে সমস্ত আনন্দ যেন নিঃশেষে লোপ পাইয়া আমার মনের মধ্যে একরূপ কালিমা পড়িয়া গিয়াছে।

টাকার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি আজ ডাকঘরে না গেলে আগামী কল্য রবিবার টাকা পাইব না। সামান্য জলখাবার কাপড়ে বাঁধিয়া দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া রওনা হইলাম। দলে দলে খচ্চর ও গর্দ্দভ মাল বহন করিয়া চলিতেছে। এক এক দলে প্রায় শতাধিক থাকে। কুশী নদী হাঁটিয়া পার হইলাম। যখন খচ্চরের দল চলিতে থাকে তখন রাস্তায় ভয় করেনা কিন্তু যখন একা একা চলিতে হয় তখন জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় না এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে ভীষণ অরণ্য থাকাতে বিলক্ষণ ভয়ের উদ্রেক হয়।

একটী নালার নিকট বসিয়া জলযোগ করিয়া নিলাম পরে আবার চলিতে লাগিলাম। **গরজীয়া ও চিকলী চটিতে** কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। এই শেষোক্ত চটিতে সুন্দর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। এখান হইতে রামনগর ৬॥০ মাইল এবং রাস্তার জঙ্গলও অনেক কম। অপরাহ্ন ঠিক ২টার সময় আমি **রামনগর** ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম, এখানে কয়েকখানা পত্র পাইলাম কিন্তু টাকার কোনও খবর নাই। টাকা না পাওয়াতে মনটা দমিয়া গেল। এখন দেশে ফিরি কি করিয়া? সঙ্গে যে কয়েকটা টাকা আছে তাহাতে এটোয়া পর্য্যন্ত যাইতে পারি। ডাকঘরের নিকটে হাস্পাতাল ও বাজার। এখানে পুলিশের থানা, ধর্ম্মশালা, সরকারী বাংলা ও বনবিভাগের আফিস ইত্যাদি আছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি রামনগর আছে। চিঠিপত্রে ও মণি অর্ডারে নাইনিতাল জেলা না লিখা থাকিলে তাহা আর ঠিক সময়ে পাইবার আশা নাই। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। মণি অর্ডার ভারতবর্ষের বহু রামনগর ঘুরিয়া পরে প্রেরকের নিকট ফেরৎ গিয়াছিল। বাজার হইতে রেলষ্টেশন ৫ মিনিটের রাস্তা হইবে। কুশী নদী হইতে একটী খাল

কাটিয়া আনা হইয়াছে। তাহা পার হইয়া ষ্টেশনে যাইতে হয়। খালের উপরে স্থানে স্থানে পুল ও বাঁধান ঘাট আছে। ষ্টেশনে যাইয়া রেলগাড়ীর সংবাদ নিয়া আসিলাম। রোহিলখণ্ড—কুমাউন রেলপথের একটী শাখা রামনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাজারটা ঘুরিয়া আসিলাম ও এক মিঠাইর দোকানে বসিয়া কিছু মিষ্টি আহার করিলাম, পরে ডাকঘরে আসিয়া গরুর গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। সন্ধ্যার সময় পোষ্টমাষ্টার বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক পেয়ালা চা দিলেন। বসিয়া বসিয়া মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল আমি বরাবর রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছি। ঠিক সন্ধ্যার সময় মাতাঠাকুরাণী ও শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। পরে ষ্টেশনে যাইয়া রেলগাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলাম। আমাদের হিমালয়-ভ্রমণ এইখানেই শেষ হইল।

পর দিবস প্রাতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এখন আর চাটাচাটির ভয় নাই, সে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা নাই, আর অলকানন্দার ভীষণ গর্জ্জনও নাই। এখন শুধু শুনিতেছি ট্রেণের গর্জ্জন।

কাশীপুর ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিতে হইল। ষ্টেশনের নিকটে একখানা সুন্দর ধর্ম্মশালা তথায় ১১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া মুরাদাবাদের ট্রেণ ধরিলাম। মুরাদাবাদ পৌঁছিয়া অনেক সময় অপেক্ষা করিতে হইল। এই অবসরে মাতাঠাকুরাণীকে ষ্টেশনে বসাইয়া শান্তিকে সঙ্গে করিয়া একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া সহরের দিকে চলিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পাইয়া লম্ফঝম্ফ করিয়া উঠিল এবং আমরা টঙ্গা সহিত উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। নিমিষের মধ্যে এতকাণ্ড হইয়া গেল। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন

দেখি শান্তি একধারে ও আমি একধারে রাস্তার মধ্যে পড়িয়া আছি। পকেটের ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু দৈব অনুগ্রহে আমাদের শরীরে কোনও আঘাৎ পাই নাই। টঙ্গাওয়ালাত ভয়েই অস্থির। আমি শান্তিকে উঠাইলাম পরে আবার টঙ্গাতে উঠিয়া সহরটা বেড়াইয়া আসিলাম। মুরাদাবাদ হইতে আলিগড় রাত্রি প্রায় ১২টার সময় পৌঁছিলাম পরে Express trainএ এটোয়া রওনা হইলাম। গাড়ীতে এত ভীর যে বসিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী ও শান্তিকে উঠাইয়া দিলাম পরে আমি অন্য গাড়ীতে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়া বসিয়া রহিলাম। হাথ্রাস্ জংসনে যখন ট্রেণ উপস্থিত হইল তখন মাতাঠাকুরাণী ও শান্তিকে যাইয়া দেখিয়া আসিলাম। টুণ্ডলা জংসনে ট্রেণ উপস্থিত হইবা মাত্র একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখি চিৎকার করিতেছেন "রাজেন বাবু আছেন" "রাজেন বাবু আছেন" আমি বলিলাম "কেন কি হয়েছে, আমার নাম রাজেন বাবু?" তিনি বলিলেন "বেশ, আপনার সব চুরী হইয়া গেল আর আপনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন?" আমি তখনই গাড়ী হইতে নামিয়া মাতাঠাকুরাণীর গাড়ীর দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী "রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র" বলিয়া চিৎকার করিতেছেন। আমিও "পুলিশ পুলিশ" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিলাম। তখনই রেলপুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতাঠাকুরাণী সকল অবস্থা নিম্নলিখিত ভাবে বলিলেন।

হাথ্রাস্ জংসনে আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাওয়ার পর স্ত্রীলোকের গাড়ী হইতে কয়েক জন স্ত্রীলোক নামিল তাহাদের জিনিষপত্রের সহিত আমার একটা বস্তাও প্লেটফরমে নামাইল। মাতাঠাকুরাণী দেখিলেন আমার জিনিষত গেল তখন তিনিও প্লেটফরমে নামিলেন

এবং বস্তাটা ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকদের দলের একজন পুরুষ মাতাঠাকুরাণীকে বস্তাটা উঠাইতে দিল না। তখন মাতাঠাকুরাণী একধারে টানেন আর ঐ লোকটা একধারে টানে। এই টানাটানীতে ২।১ মিনিট গেল। মাতাঠাকুরাণী বলেন "এ আমার জিনিষ" এবং লোকটা বলে "হা, তোমার জিনিষ!" এইভাবে ধস্তাধস্তি হইতেছে এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী বস্তা ছাড়িয়া দিয়া ট্রেণে উঠিলেন এবং চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাই এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী মাতাঠাকুরাণীর পক্ষ হইয়া আমাকে তালাস করিতেছিলেন। তাঁহার নামধাম আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাই নাই। তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিতেছি।

পুলিশ তখনই হাথ্রাস টেলিগ্রাফ করিল। ভোরে এটোয়া উপস্থিত হইবা মাত্র দেখি পুলিশ ট্রেণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে বলিলাম "শরীর বড়ই ক্লান্ত এখন আর এজাহার লিখিতে পারিব না। আমি সহরে যাইতেছি পরে লিখিয়া পাঠাইব"।

এটোয়াতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী থাকে, তাহার স্বামী শ্রীমান প্রমথ নাথ সেন এখানকার এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন। এখানে পরম সমাদরে তিন দিবস বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া পরে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বারদী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া স্বস্থানে আসিয়া চাকুরীতে যোগদান করিয়াছি। এখানে আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে একজন লোক আমার বস্তাটা ষ্টেশনে ফেরৎ দিয়া গিয়াছে। পরে যথাসময়ে আমার সকল জিনিষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। দীর্ঘ ৩ মাস ব্যাপি পর্য্যটনে শরীরও কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। শান্তিও অনেক শুকাইয়া গিয়াছে, বারংবার জ্বর ও উদরাময়ে ভুগিয়া তাহার চেহারাও খারাপ হইয়া গিয়াছে। বহুদিবস চিকিৎসার পর এখন সে সুস্থ ও সবল হইয়াছে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহুতীর্থ আছে কিন্তু হিমালয়ের তীর্থের ন্যায় মনে বৈরাগ্যভাব আনয়ন করিতে বুঝি কেহ সমকক্ষ হইতে পারে না। নির্জ্জননিস্তব্ধতা অথচ মাঝে মাঝে নির্ঝরের কল কল ধ্বনি দ্বারা যে শুরু গম্ভীর ভাবের উন্মেষ হয় তেমন উদ্দীপক আর কোথায় পাইব? মন বহুকাল হইতে সংসার ভালবাসিতেছে। কিন্তু তাহার প্রকৃত ভালবাসার বস্তু যে কি তাহার সন্ধান কয়জন রাখে? মহাপুরুষেরা বলেন আত্মা বলিয়া কিছু রহিয়াছে; আত্মার দর্শন পাইলে সকল ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, নিত্য সুখী হইতে পারিবে, তোমার নিত্যপ্রিয় বস্তুকে পাইলে অপর অনিত্য, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। যখন হিমালয়ের তীর্থে কম্বল বিছান যায় তখন সংসার ভুলিতে হয় কিন্তু শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণিক। রাস্তার কঠোর পরিশ্রমের সময়েও আর অন্য বিষয় মনে উদয় হয় না; ঘরে ফিরিয়া আসিলে তাহার সমস্তই অতলে ডুবিয়া যায়। ভারতের সকল তীর্থই সুগম, কোথাও বা রেলে কোথাও বা জাহাজে চড়িয়া আরামের সহিত তীর্থ দর্শন হইতে পারে কিন্তু সেই হিমালয়ের দেবতা দর্শন করিতে হইলে বিলাসিতা ও পার্থিব লালসা করা আর চলিবে না। এ রাস্তায় তাহাদের সম্পূর্ণ অভাব। মনের মান, অভিলাষ সকল বিসর্জ্জন দিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া চিরপরিচিত সংসারের উল্টা দিকে ধাবিত হওয়ার পক্ষে হিমালয় ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট উপায়। তাহাতে মনে বিপুল আনন্দ হইবে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে যে হৃদয় তিলেতিলে দগ্ধ হইতে থাকে তাহা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কাহারও হিমালয়ের দেবতা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয় তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। নিবেদনমিতি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

পরিশিষ্ট

জোশীমঠ হইতে কৈলাশ যাওয়ার রাস্তার বিবরণ

আমার একজন পরিচিত ব্যক্তি কৈলাশ গিয়াছিলেন তিনি যেভাবে
রাস্তা বর্ণনা করিয়াছেন আমি সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

জোশীমঠ হইতে ৯ মাইল পরে তপোবন। এখানে ভাল বাসস্থান
পাওয়া যায়। ৪ মাইল পরে শ্রীশ্রীলতানন্দা দেবীর মন্দির
১ মাইল চড়াইর উপর অবস্থিত। মনোরম স্থান। সাধকেরা এখানে
যন্ত্রমন্ত্রের সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। জোশীমঠ হইতে ভবিষ্যবদ্রী
১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এক মাইল পরে ধবলা ও ঋষিগঙ্গার সঙ্গম,
এখানে স্নান করিতে হয়। লাতাগ্রাম হইতে ৪ মাইল সিধা রাস্তায়
সমুন গেঠা, পরে ৮ মাইল ব্যবধানে জুমাগ্রাম—রাস্তা চড়াই ও উৎরাই।

জুমা গ্রাম হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে মলাবা গ্রাম, রাস্তা চড়াই ও
উৎরাই, এই গ্রাম খুব বড়। ৫ মাইল পরে বাম্পা গ্রাম, এখানে বকরী ও
ভেড়ীর হিসাব হইয়া থাকে। পশ্চিম দেশের চুঙ্গির (Octroi) ন্যায় আফিস
আছে। এখানে ডাকঘরও আছে। বাম্পা গ্রাম হইতে ১ মাইল
পরে গমশালী গ্রাম—সিধা রাস্তা, গ্রাম বড়। ৪ মাইল পরে নিতি
নামক খুব বড় গ্রাম। এখান হইতে রাস্তা নির্জন ও দুর্গম। চড়াই
উৎরাই ও পাকদণ্ডীর রাস্তা। এই গ্রামে খাদ্যসামগ্রী খরিদ করিয়া
নিতে হয় কারণ পরে আর সহজে কোনও জিনিষ পাওয়া যায় না।
নিতি গ্রাম হইতে ৩ মাইল পরে কলোড়া ডাঁপ। আরও ৩ মাইল
পরে কালা জাবর (কালবাজার)। বেশ সুন্দর ময়দান, নিকটে

নদী। ইহার পরে রন্ধন করিবার জন্য কাঠ পাওয়া যায় না। কিন্তু বকরীর লাদি (ময়লা) ও একপ্রকার কাঁটার ঝাড় আছে তাহা দিয়াই রন্ধনকার্য্য শেষ করিতে হয়। এখান হইতে বকরী ও ঘোড়ার ব্যাপারীদের সঙ্গে যাত্রা করিলে আরাম পাওয়া যায়।

কালাজাবর হইতে ৩ মাইল দূরে এক শৃঙ্গ (ধুরা) পাওয়া যায়। রাস্তা কেবল চড়াই আর ধূলাতে পরিপূর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে আন্ধি উঠে। এই রাস্তায় এত জোরে বাতাস বহিতে থাকে যে যাত্রীদের পর্য্যন্ত উড়াইয়া নিয়া যাইতে চায়, তখন জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। এই রাস্তায় চষমা (Eye preserver) ব্যবহার করিতে হয় নচেৎ প্রস্তরের ধূলিকণাতে চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বাসস্থানের অভাব। এই শৃঙ্গ হইতে ৬ মাইল উৎরাইর পর রীমখোল গ্রাম পাওয়া যায়। এখানে থাকিবার কিছু সুবিধা আছে। এখানে একটি শৃঙ্গ আছে তথায় বড়াবড়ই বরফ থাকে। রীমখোল হইতে ৩ মাইল দূরে হোতী (ননী হোতী) গ্রাম—রাস্তা চড়াই ও উৎরাই। ইহা গবর্ণমেন্টের শেষ সীমানা। চতুর্দ্দিকে ময়দান। এখানে ঘোড়া, বকরী ও চামরী গরুর ব্যাপার হইয়া থাকে। নেপাল রাজ্যের একজন কর্ম্মচারীও এখানে থাকে। এখানে নেপালের ২০০ পর্য্যন্ত সোলডারী (তাম্বু) আছে। এখান হইতে রাস্তা চড়াই। এখান হইতে দক্ষিণ ধারের রাস্তায় ২৪ মাইল দূরে জোঙ্গচু গ্রাম এবং বামধারের রাস্তায় ৪ দিনের পর দাপানারায়ণ গ্রাম পাওয়া যায়। পরে দক্ষিণ ধারের রাস্তায় ৫ মাইল ব্যবধানে চোরহতী গ্রাম। ২ দিবসের পর একটী বড় মোকাম পাওয়া যায়। এই রাস্তাই কৈলাশ যাইতে সুগম। তীর্থপুরী, মিস্ত্রিথ, ভস্মসুর নামক দানব এখানে ভস্ম হইয়াছিল। সেই সব ভস্ম এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটী

মঠ ও লামাগুরু এখানকার পূজারী। এখানে চড়াইর বর্ণনা শেষ করিলাম।

হোতী হইতে চোরহোতী ৫ মাইল—রাস্তা চড়াই ও উৎরাই। এখান হইতে ৩ মাইল চড়াইর উপর একটী শৃঙ্গ তথায় অনেক শালগ্রাম শিলা ও গোমতী চক্র পাওয়া যায়। ৪ মাইল উৎরাইর পর একটী নদী পাওয়া যায়, এই নদী ডোলফু হইতে আসিয়াছে। ডোলফু হইতে ৪ মাইল চড়াইর উপর সেঙ্গরা শৃঙ্গ। এখানে এত প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হয় যে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। আঁধি চলিতে থাকে। এখানে আসিলে মনে হয় যে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। শৃঙ্গ হইতে ২ মাইল উৎরাইর পর থেংগুর নদী। এখানে দুইটী রাস্তা—একটী গেমসর আর একটী শিবচিলিমের দিকে গিয়াছে। থেংগুর নদী হইতে ৪ মাইল দূরে কাগচা ধুরা নামক বড় পাহাড়। দক্ষিণে নীল বর্ণের পর্ব্বত চক্ চক্ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে জহরমোরা বলে। বদরীনারায়ণের রাস্তায় এই পর্ব্বতের টুকুরা চারি আনা সের বিক্রয় হয়। ইহা অপেক্ষা উত্তম জহরমোরা এই পর্ব্বতে পাওয়া যায়।

কাগচাধুরা হইতে ৫ মাইল উৎরাইর পর লড্ডাক সরক। এখানে থাকিবার জন্য ময়দান আছে। এই পর্য্যন্ত চড়াই উৎরাইর রাস্তা। এখান হইতে আগে ময়দান ও ভয়ানক নদী—ইহা চওড়া এবং কোমর পর্য্যন্ত গভীর। এখানে খুব শীত। উৎরাইর রাস্তা চলিতে চলিতে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সব বেগবতী নদী ছোট ছোট ভেড়া ও বকরী অনায়াসে পার হইয়া যাইতেছে। লড্ডাক হইতে ৩ মাইল দূরে সুম নদী এবং এক মাইল ব্যবধানে দুরীং নদী। এই উভয় নদী পার হইয়া ৫ মাইল

পরে শিবচিলিম নামক তেজারতি কারবারের জন্য বড় গ্রাম পাওয়া যায়। এখান হইতে মানস সরোবর পর্য্যন্ত গুর, ছাতু ও চা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। যাহারা মাংসভোজী তাহারা ভেড়ার মাংস পাইতে পারে। সকালবেলা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চা তৈয়ার করার অবসর পাওয়া যায়, পরে এ প্রকার আন্ধি চলিতে থাকে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই স্থান ব্যাপারীদের কেন্দ্রস্থান। এখানে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। শিবচিলম হইতে ৩ মাইল দূরে মানিমন সাঙ্গা, মধ্যে একটী ছোট নদী পার হইতে হয়। পরে ৬ মাইল দূরে গামোচন নামক বড় গ্রাম পাওয়া যায়। এখানে ব্যাপার হইয়া থাকে। পরে ৩ মাইল দূরে গুরম্যাতী নদী; ইহা জোহার হইতে আসিয়াছে। দিনের মধ্যে কয়েকবার ইহার জল বেশীকম হইয়া থাকে। এই নদীর জল কোমর পর্য্যন্ত গভীর। গুরম্যাতী নদী হইতে ৩ মাইল দূরে দরম্যাতী নদী। ইহাও জোহার হইতে আসিয়াছে। এই নদীর বেগ খুব প্রবল। এখানে উপরোক্ত নদীর সঙ্গমস্থান। এই উভয় নদী পার হইয়া জ্ঞানীম মণ্ডী নামক বড় গ্রাম পাওয়া যায়। এখানে তিব্বতের ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড্ কোয়ার্টার। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও একজন কর্ম্মচারী এখানে থাকে, সে ব্যাপারীদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। তিব্বতের বহু দূর স্থানের জিনিষপত্র এখানে পাওয়া যায়। চামর গরুর পুচ্ছ, ঘোড়া, কম্বল ও অন্যান্য প্রকার পরিধানের গরম কাপড় পাওয়া যায়। উল, বকরী, সোহাগা, লবণ, চা, চামর গরুর ঘৃত ইত্যাদিও পাওয়া যায়। বড় বড় বস্তিতে এই সব জিনিষের ব্যাপার হইয়া থাকে।

জ্ঞানীম হইতে ১২ মাইল দূরে সুমরশিলা নামক এক ষ্টেশনে ভুটিয়াদিগের সোলডারী (তাম্বু) ও পশু থাকে। থাকিবার জন্য

ময়দান আছে কিন্তু জলাভাব। সুমরশিলা হইতে ৬ মাইল দূরে রাকতাছু্য ষ্টেশন, খুব জল পাওয়া যায় এবং এখানে প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। পরে ৯ মাইল দূরে জিনভাগ ষ্টেশন। আরও ১০ মাইল দূরে দারজিনের পশ্চিম ধার। থাকিবার জন্ত ময়দান আছে। দারজিন হইতে ১০ মাইল দূরে কৈলাশ পর্ব্বত।

কৈলাশ

এই পর্ব্বত সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ২১,৮১৮ ফিট উচ্চ, চতুর্দ্দিকে ময়দান ও জল। মধ্যে ২ মাইল উচ্চ ও ৩০ মাইল ঘের। অতি উত্তম বরফে আচ্ছাদিত। কৈলাশ পরিক্রমার পথের চারি কোণে চারিটী গুম্ফা আছে। এই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে লামারা থাকেন। এখানে বহু দেবতার মূর্ত্তি আছে। প্রতি ১।২ মাইল অন্তর লামাদের যোকাম আছে, ইহাকে গোনবা বলে। ইহাতে লামারা থাকেন এবং দিবারাত্রি প্রদিপ জ্বালাইয়া রাখেন। লামাগুরুরাই এখানকার পূজারী। এই লামাদের মধ্যে ২০০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সত্যবাদী, জ্ঞানবান এবং লোভশূন্য। চারি আনা হইতে যাহা অভিরুচি তাহাই দক্ষিণা দেওয়া যায়, কোনও-প্রকার জুলুম করে না। চামরগরু ও বকরীও পূজাতে চড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এখানকার অনেক মূর্ত্তি অষ্টধাতু নির্ম্মিত। এই সব গোনবাতে বহুমূর্ত্তি আছে—৯০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটী গোনবাতে ৪ হস্ত লম্বা হস্তির দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর ৪টী বড় গোনবা আছে। চতুর্থ গোনবাতে খুব বেশী রকমের বন্দোবস্ত আছে। দেওী হইতে

৪ মাইল দূরে ডেরফু গোনবা, এখানে ৪ হস্ত পরিমিত লম্বা মহিষের শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়।

ডেরফু হইতে ৪ মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড। রাস্তা বরফে আচ্ছাদিত। বরফ ভাঙ্গিয়া স্নান করিতে হয়। গৌরীকুণ্ড হইতে ৭ মাইল ব্যবধান জুমলফু গোনবা, এখানে প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। পরে ২ মাইল দূরে গ্যাংগটাং গোনবা, এখান হইতে সমস্ত গোনবার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। বহু আকথনীয় মূর্ত্তি এবং একটী ১৫ হাত পরিমিত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সকল রাস্তায় কৈলাশ যাওয়া যায় তাহার বিবরণ।

(১) হরিদ্বার, গঙ্গোত্তরী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতে হইলে প্রথমে গারটক গিরিসঙ্কট পার হইয়া আসিতে হয় পরে থৈলিংমংলাং স্থান পাওয়া যায়।

(২) নৈনিতাল, আলমোরা, বাগেশ্বর ও জোহার হইতে প্রথমে শিবচিলিম পরে জ্ঞানীম প্রভৃতি স্থান পাওয়া যায়।

(৩) দারমা হইতে যাত্রীরা প্রথমে ছাগরা নামক স্থান পাইয়া থাকে।

(৪) ব্যংস হইতে প্রথমে ছুমজু নামক স্থান পাওয়া যায়।

(৫) চৌদবাংস হইতে প্রথমে ঠোকর নামক স্থান পাওয়া যায়।

(৬) বীরজমনগঞ্জ (নেপাল) হইতে যাত্রীদের প্রথমে খোজরনাথ নামক স্থানে মিলিয়া থাকে।

(৭) শিবচিলিম হইতে নিতিগ্রাম ও জোশীমঠ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারা যায়।

(৮) কৈলাশ হইতে চীনে যাইবার রাস্তা আছে।

ভোটে ব্যপারীদিগের কেন্দ্রস্থান।

লড্ডাক, গারটক্, লাসা, তাকলাকোট, জ্ঞানীম এবং দাপা। সকল রাস্তা হইতে সুগম ও নিকট নিতিপাসের রাস্তা।

মানস সরোবর

কৈলাশ পর্ব্বত হইতে ৩ মাইল উৎরাইর রাস্তায় দারচিন বাজার। এখানে গরফু রাজার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। বাজারে অনেক প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায়। দারচিন হইতে ৩০ মাইল দূরে মান-সরোবর (রাক্ষসতাল)। ইহার পরিধি প্রায় ৪৫ মাইল, ব্যাস ১৫½ মাইল, এবং বৈদিক ও বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। কৈলাশ ও মানস সরোবরের ন্যায় তীর্থ ভারবর্ষে আর নাই।

"মান-সরোবর কোন পরশে জাঁহা বিনা বাদল, হিম বর্ষে।"

এই সরোবরে স্নান, তর্পণ ও হ্রদের তটে পরিক্রমই প্রধান কার্য্য। হ্রদ সর্ব্বদা দক্ষিণদিকে রাখিয়া পরিক্রমণ করিতে হয়। লামাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা সরোবর বামদিকে রাখিয়া পরিক্রমণ করিয়া থাকে। হ্রদের তট দিয়া রাস্তা আছে। তীরে আটটী মঠ আছে, ইহাকে গুম্ফা বলে। তাহাদের নাম—Serolung-Gompa, Yanggo-Gompa, Tugu-Gompa, Gossul-Gompa, Chin-Gompa, Chergip-Gompa, Langbo-nau-Gompa, Pindu-Gompa. প্রত্যেক গুম্ফাতে একটী শিলালিপি আছে। প্রতিদিন এই সকল গুম্ফা হইতে শঙ্খ-নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন যাত্রীদের আহ্বান করিতেছে। মানস সরোবরের নিকট বড় গুহাটীর নাম ধূকায়। ইহার মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মৃত্যুরপর যে প্রকার গলাতে

অস্থি ও ভস্মাবশেষ বিসর্জ্জন করিতে হয় সেইপ্রকার মানস-সরোবরের জলেও হইয়া থাকে এবং সমতুল্য পবিত্র বলিয়া খ্যাত। মানস-সরোবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম। নিকটে রাক্ষস তাল নদী। প্রায় সাতটী নদী ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এই হ্রদে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এই হ্রদের জল বাহির হইবার কোনও রাস্তা নাই। এখানে নানাজাতীয় হংস, চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, বক ও অন্যান্য জলচর পক্ষী বিচরণ করে। এখানকার দৃশ্য এত চমৎকার যে কেহ তাহা বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় না। এ যে দেবস্থান, চতুর্দ্দিকে অনন্ত তুষার ক্ষেত্র। দৃশ্য এত মহান যে এখানে আসিলে ভগবৎ প্রেমে আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। মানস সরোবরের চারিধারে ৮।১০টী প্রসিদ্ধ গুহা আছে। এই গুলি এত বড় যে বণিকেরা পণ্যদ্রব্য আনিয়া এই গুহার মধ্যে অবস্থান করে এবং সুবিধামত বাণিজ্য করে। জিয়াওন নামক গুম্ফার নিকট একটী তপ্তকুণ্ড আছে ইহার জলে স্নান করিলে অনেক কঠিন ব্যারাম আরোগ্য হইয়া যায়। ইহার নিকটে একটী স্বর্ণ খনি আছে। প্রবাদ আছে যে মান্ধাতা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং যোগবলে এই সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানস সরোবর। এখানে হিন্দুরা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। স্থানটা এতই নির্জ্জন যে এখানে প্রকৃত সাধনার স্থান। আমরা গৃহী আমাদের এ স্থান ভাল লাগিবে কেন? আমরা যে মৃত্যুকে ভয় করি। যাঁহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যুভয় সাধন বদ্ধ, তাঁহাদের হৃদয় কৃতান্তের করাল-হাস্য দেখিয়া হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাম্পিত হয় না।

নিম্নলিখিত সংবাদ ১০ই আশ্বিন, ১৩৩১ সন, তারিখের
দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশ হইয়াছিল।

ভূ-পর্য্যটকের কথা

মানস-সরোবরে সাধুমণ্ডলী

"১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি তিব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে মানস-সরোবরে উপনীত হই। মানস-সরোবর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে আমি একটী সুন্দর ও সুপরিষ্কৃত স্থানে ২২ জন সাধুকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে একটী যুবক ও একজন যুবতী নগ্নদেহে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিয়া আছেন দেখিতে পাই। এই যুবক ও যুবতীর ন্যায় সুন্দরাকৃতি মানব আমি পৃথিবীর কুত্রাপি আর দেখিতে পাই নাই। যুবকটির একটী হাত যুবতীর স্তনে ন্যস্ত, অন্য হস্ত করধরা (জপের মত) রহিয়াছে। যুবতী তাহার সম্মুখে যুক্তকরে বসিয়া আছেন। কাহারও চৈতন্য নাই। সকলেই ধ্যানমগ্ন। অবশিষ্ট কুড়ি জন বৃদ্ধ। তাঁহাদের শ্মশ্রু আজানুলম্বিত ও ধবল। কাহারও একটুমাত্র বস্ত্রও নাই, গলায় উপবীতও নাই। উঁহারা সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে উপবিষ্ট। এই দারুণ শীতে মূত্র বা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে উহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া যায়; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, উঁহারা সেই অতি দুরন্ত শীতে অনাবৃত গাত্রে তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। আমি উঁহাদের সকলেরই নাড়ী টিপিয়া দেখিয়াছিলাম,—নাড়ী অতি ক্ষীণভাবে বহিতেছিল। আমি এবং আমার সঙ্গী সিকিমের একজন ধনাঢ্য জমিদারের পুত্র উভয়ে দশ দিনকাল তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে কখনও নড়িতে চড়িতে দেখি নাই। উঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আমরা দুইজন এতই ব্যাকুল

হইয়াছিলাম যে, তাঁহাদের কাহারও হাতে কাপড় বাঁধিয়া আমরা দুইজন অনেক টানাটানি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদিগকে একটুও নড়াইতে পারি নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমি পুনরায় ঐ স্থানে গিয়াছিলাম, সে বার তথায় ২১ জনকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখিতে পাই। কেবল একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধকে দেখিতে পাই নাই। আমি উহাঁদের প্রত্যেকেরই ফটো লইয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয়বার আমি একাকীই গিয়াছিলাম, তখন শীত এত অধিক যে, তথায় চারি পাঁচদিন ছিলাম। এই চারি পাঁচ দিন আমি তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাদিগকে একবারও নড়িতে দেখি নাই। পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, পরবারেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম। কাহারও কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখি নাই।"

শীতের সময় জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। হ্রদমধ্যে কোথাও বালুস্তর, কোথাওবা প্রস্তরখণ্ড সকল বিস্তৃত। বালুস্তরের নীচে কোথাও কোথাও আটালু মাটি আছে। হ্রদের তটে কোথাও কোথাও একপ্রকার ঘাস আছে, তথায় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। বন্যগর্দ্দভ দলে দলে চড়িয়া বেড়ায়। সরোবরে জলজ তৃণাদি আছে। জলের মধ্যে বড় বড় মাছ খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। কোথাও কোথাও পঙ্গপাল, ডাঁস প্রভৃতি দেখা যায়। রাজহংস এবং আরও কয়েক রকম পাখী জলে বিচরণ করিয়া থাকে।

হিন্দুদের নিকট সরোবরের জল অত্যন্ত পবিত্র। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহারা শিশিতে ভরিয়া সরোবরের পবিত্র জল সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসেন। মানস-সরোবর সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৫,০৯৮ ফিট উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহা ২৭০ ফিট গভীর। মানস-সরোবর ও রাক্ষস তালের মধ্যে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সরোবরের তীরে

ডাকাতের ভয় আছে। সরোবরের দক্ষিণে মান্ধাতা মহাপর্ব্বত (২৫,৩০০ ফিট উচ্চ)। উচ্চ-পর্ব্বতমালা হ্রদটীকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া আছে।

রাক্ষসতাল

এই হ্রদ মানস-সরোবরের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহাকে রাবণ-হ্রদও বলিয়া থাকে। মানস-সরোবর অপেক্ষা দৈর্ঘ্য কিছু বড়, ইহার পরিধি প্রায় ৬০ মাইল হইবে। হ্রদটী গিরিমালার মধ্যে আঁকিয়া-বাঁকিয়া মান্ধাতা হইতে কৈলাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই হ্রদ হইতে শতদ্রু নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৫,০৫৬ ফিট উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত।

রাক্ষস তাল নদীর তীরে বহু প্রাচীন একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। নদীর মধ্যে একটী ছোট দ্বীপ আছে। প্রবাদ আছে যে রাবণ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে শীতের কয় মাস লোকজন বাস করে না। এই হ্রদে নানা জাতীয় হংস, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী নির্ভয়ে ক্রীড়া করে। এখানে হিংসা নাই, এ স্থানে মানুষ, জলচর, স্থলচর প্রভৃতি প্রাণীগণ নির্ভয়ে একসঙ্গে চলাফেরা করিয়া থাকে। জঙ্গলী মহিষ, ঘোড়া, গরু, হরিণ, খরগোস, সাদা চিতাবাঘ ও অন্যান্য জন্তু হ্রদের নিকটস্থ জঙ্গলে বহুল পরিমাণে বাস করিয়া থাকে। তিব্বতীয়রা ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি হ্রদের নিকটস্থ মালভূমিতে চড়াইতে নিয়া আসে। রাক্ষস তাল বা রাবণ হ্রদ হইতে মানস সরোবর ৩ মাইল হইতে ৬ মাইল ব্যবধান কিন্তু বর্ষার সময় এই দুইটী হ্রদ একত্র হইয়া বিশাল আকার ধারণ করে। এই উভয় হ্রদের মধ্য দিয়া কৈলাশ যাইবার রাস্তা।

আলমোরা হইতে মানস সরোবর ও কৈলাশ।

আলমোরা হইতে আসকোট প্রায় ৯০ মাইল দূরস্থ। কতক রাস্তা অশ্ব পৃষ্ঠে এবং কতক রাস্তা পদব্রজে যাইতে হয়। আসকোটের পর অল্প চড়াই পরে ২ মাইল উৎরাই। আসকোট হইতে এক রাস্তা গারবাং গিয়াছে। বালবাকোটে ১০।১৫ খানি মাত্র ঘর আছে। এখান হইতে ধারচুলা ১০ মাইল উত্তরে, এখানে গবর্ণমেণ্টের অফিস আছে। ধারচুলা ৩ হাজার ফিট উচ্চ। ইহার পর চড়াই এবং ১০ মাইল পর্য্যন্ত বহু চড়াই ও উৎরাইর রাস্তা। পরে খেলা, এখানে ডাকঘর এবং P. W. D. র কর্ম্মচারী আছে। নিম্নে ধবলী গঙ্গা। খেলার পর ১ হাজার ফিট নিম্নে ধবলী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইতে হয়, ইহাকে দরমা নদীও বলে। এখান হইতে রাস্তার কঠোরতা দৃষ্ট হয়।

সশা—ইহা চৌদাম পট্টির অন্তর্গত, এখানে ভুটিয়া পাটোয়ারী আছে। সশা চৌদাম বড় গ্রাম, ৮ হাজার ফিট উচ্চ। এখানে শীত বোধ হইয়া থাকে। একটী উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। এখানকার মন্থর ডাল প্রসিদ্ধ।

সামখেলা—এখাণে ৮।১০ খানা ঘর আছে। ২ মাইল দূরে গালা বা গালা গড়ে—এখানে ডাক পিয়নের আড্ডা। কয়েক মাইল উৎরাইর পর সেতু পার হইতে হয়। বহু চড়াই উৎরাই ও বহু পার্ব্বত্য নদী পাওয়া যায়।

মালপা—পিয়নের আড্ডা একখানা ক্ষুদ্র ঘর। পরে কালী নদী অথবা সারদা নদী, রাস্তা চড়াই ও উৎরাই।

বুধি—এখানে স্কুল আছে। এখান হইতে গারবাং ৪ মাইল ব্যবধান।

গারবাং—এখানে ডাকঘর, স্কুল ও প্রায় একশত খানি গৃহ আছে। শীতের সময় স্কুল ও ডাকঘর থাকে না। রুমাদেবী সকল সাধু ও সন্ন্যাসীদের অভ্যার্থনা করিয়া থাকেন। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই স্থান ১০ হাজার ফিট উচ্চ। এখানে খুব শীত বোধ হইয়া থাকে।

কালাপাণি—এখানে বৃক্ষের অভাব। অল্প অল্প চড়াইর পর সঙ্গচান। এখানে লোকালয় নাই। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এইস্থান ১৫ হাজার ফিট উচ্চ।

লিপুলেখ—সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই স্থানের উচ্চতা :৬,৭৮০ ফিট। এখানে খুব জল ও ঝড় হইয়া থাকে। এত প্রবল বেগে ঝড় বহিতে থাকে যে সময় সময় পথিকের প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা হয়। এই রাস্তায় শিরপীড়ায় সময় সময় যাত্রীকে আতুর করিয়া ফেলে। উচ্চ হইতে অবতরণ করাই এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক।

শ্বাসকৃচ্ছতারও বিলক্ষণ কষ্ট দিয়া থাকে। এখান হইতে রাস্তা উৎরাই পরে নদীর তীর দিয়া ১ মাইল নিয়ে পালা নামক স্থান, এখানে ২ খানা প্রস্তরের গৃহ আছে। লিপুলেখ হইতে দূরে তাকলাকোট দুর্গ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় কিন্তু কর্ণালীর তটে আসিয়া স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর তটে একখানা বড় গ্রাম ইহাকেও তাকলাকোট বলে। উচ্চপাড় হইতে নদী অনেক নিম্নে। নদীর বিস্তার অর্দ্ধ মাইল হইবে।

তাকলাকোট—এখানে কাঠের অত্যন্ত অভাব। গরু, ভেড়া প্রভৃতির পুরীষ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় তাহাই জ্বালানী কাঠের কাজ করে। এখান হইতে কৈলাশ ৪ দিনের রাস্তা।

এই তাকলাকোটের শেষ সীমানায় কর্দ্দাম নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাকলাকোট হইতে কর্দ্দামের দূরত্ব ১২ মাইল। এই গ্রামে

ব্রহ্মার একটী চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি আছে। কৈলাশ পর্য্যন্ত যাইতে রাস্তায় যে সব প্রস্তর স্তম্ভ আছে তাহাতে পালি ভাষায় খোদিত লিপি আছে। যাত্রীরা এই সকল স্তম্ভ পবিত্র জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কর্দ্দামের নিকটে টোয়া নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। রাস্তায় জলাভাব কারণ ঝরণা ও নালার জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়।

টোয়া হইতে ১৫ মাইল দূরে গৌরী উদ্ধার নামে একটী গুহা আছে। মানস সরোবরের রাস্তা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানে আরও তিনটী গুহা আছে। প্রবাদ এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্ম হইয়াছিল। এই স্থানটী বড়ই নির্জ্জন। ভুমা নামক কাঁটা গাছ ব্যতীত অন্য কোন বৃক্ষাদি নাই। এই গাছ কাঁচা অবস্থায় জলে, শুষ্ক কাষ্ঠের দরকার হয় না। এখানে ডাকাতের ভয় আছে। এই ডাকাতেরা যাত্রীদের লুণ্ঠন করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া রাত্রিবাস করিতে হয়। ইহার পর চড়াইএর রাস্তা। একস্থানে একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের স্তূপ আছে তথায় যাত্রীরা দুই এক খানা করিয়া প্রস্তর ফেলিয়া দেয়। এই প্রকার করাতে এখানে একটী প্রকাণ্ড স্তূপে পরিণত হইয়াছে। এইস্থান হইতে মানস সরোবর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং ৯ মাইল দূরে অবস্থিত।

বরখা—তারজুম নামক একটী ১৫ মাইল বিস্তৃত মালভূমি মানস সরোবরের নিকট আছে। এই স্থানটী ১৫,০০০ ফিট উচ্চ। এখানে একটী ধর্ম্মশালা আছে কিন্তু বাহিরের লোক বাস করিলে ভাড়া দিতে হয়। এখানে কেহ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তিব্বতীয় রাজসরকারের কোনও উচ্চ পদের নাম তারজুম। এই তারজুম এখানে বাস করেন। মালভূমিকে তিব্বতীয়া বরখা বলে। এইজন্য এই স্থানের নাম বরখা—তারজুম হইয়াছে। তিব্বতের রাজধানী লাসা ও

তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের সহিত যাহাতে সরকারের কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হয় তাহাই তত্ত্বাবধান করা তারজুমের কাজ।

কৈলাশের নিম্নে ভারচিন নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এখান হইতে ডোসাক্ নামক একটী স্বাধীন ভুটীয়া রাজ্য ৭ মাইল ব্যবধান। তির্ব্বতী ও ভুটীয়াদের বাণিজ্য করিবার জন্য এই স্থানটী একটী কেন্দ্র স্থান এবং এই স্থানটী কৈলাশ প্রদক্ষিণের আরম্ভ ও শেষ। কৈলাশের নিকট নন্দী গুম্ফা নামক একটী গুহা আছে, এখানে যাত্রীরা ত্রিলোচনের পূজা করিয়া থাকেন। গুহার দরজা গজদন্তময়। চীনেরা এই স্থানটী স্থাপন করিয়াছে। এখান হইতে ১২ মাইল দূরে দিদিফু নামক আর একটী গুহা আছে। এখানে বুদ্ধের একটী প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই গুহায় লামা জোবি নামক একজন অতি বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করেন।

দিদিফু হইতে ডালমালা তীর্থে আসিতে হয়। এই ডালমালা তীর্থ ঠিক কৈলাশের পাদদেশে অবস্থিত। এই স্থানটী খুব উচ্চ। ডালমালা চীনা ও তির্ব্বতীদিগের প্রধান তীর্থস্থান। তাহারা এখানে তর্পণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া থাকে। ডালমালার কিছু নিম্নে গৌরীকুণ্ড কিন্তু বরফে ঢাকিয়া থাকাতে কিছু দেখা যায় না। এইজন্য ইহাকে গুপ্ত-কুণ্ডও বলিয়া থাকে। ইহার পর আরও দুইটী গুহা আছে। একটী অত্যন্ত বৃহৎ এবং ইহার মধ্যে শ্রীরাম, রাবণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গের প্রায় দুই সহস্র প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই সব গুহা কৈলাশ প্রদক্ষিণ করিবার সময় পাওয়া যায়। কৈলাশের আয়তন ৩০ মাইল। সমস্ত কৈলাশ প্রদক্ষিণ করিতে ৭।৮ দিবস সময় লাগে। সকলে প্রদক্ষিণ করে না, কয়েকটী গুহা দেখিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে। কৈলাশের চারিধারে একটা দড়ির চিহ্নের ন্যায় দাগ আছে। এখানকার লোকের ধারণা রাবণ রাজা যখন কৈলাশ উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই চিহ্ন তখনকার।

এই অতুল তীর্থ কৈলাশের খুব নিকটেই শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি।

এই রাস্তায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব। গুরপাপড়ি (চিনি ও ময়দা দিয়া ভাজা একপ্রকার জিনিষ), ছাতু, মাখন ও চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। মানস সরোবরের নিকট প্রচুর পরিমাণে উল্ পাওয়া যায় এবং ইহা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। লবণ ও সোহাগাও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তীর্থতীরা কৈলাশ ধামকে "গনরুমুরচি" ও ভুটিয়ারা "গঙ্গারি" বলিয়া থাকে।

যমুনোত্তরীর রাস্তা

হারদ্বার হইতে রেলপথে দেরাদুন আসিতে হয় এখানে ঘোড়ার গাড়ী, দাণ্ডী প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে মোহন্ত শ্রীমৎ লছমন দাস জিউর একটী বৃহৎ দেবালয় ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা আছে। ইহা নানক পন্থী সাধুদের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে হিমালয় ভ্রমণোপযোগী যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়। দেরাদুন একটী প্রসিদ্ধ সহর। গবর্ণমেণ্টের স্কুল, কলেজ, বনবিভাগের প্রধান আফিস ইত্যাদি আছে। এখান হইতে **রাজপুর** ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া যায়; পরে **মসুরি** ৮ মাইল, অত্যন্ত চড়াই। ল্যাণ্ডোরে বাজার। এখানে সাধুদের জন্য একটী শিবালয় ও ধর্ম্মশালা আছে। ল্যাণ্ডোর হইতে **ঝালকী** ৬ মাইল, এখানে খুব জলকষ্ট, প্রায় ১ মাইল দূর হইতে জল আনিতে হয়। এক টিন জলের মূল্য এক আনা। এখান হইতে এক মাইল **সুবাখোলী** নামক স্থান হইতে একটী পার্ব্বত্য পথে যমুনায় যাওয়া যায় কিন্তু মধ্যে একটী দুর্গম চড়াই আছে। ঝালকী হইতে **ধনোল্টী** ৯ মাইল। রাজপুর হইতে ধনোল্টি একটী সহজ রাস্তায়

১৮ মাইল। এখানে কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালা, টিহরী রাজের ডাকবাংলা, পুলিশ চৌকী ও দোকান আছে। জল অল্পদূর হইতে আনিতে হয়। ঝালকী হইতে ৩ মাইল দূরে একটী রাস্তা টিহরীর দিকে গিয়াছে। ধনোটী হইতে কানাতাল ৮ মাইল। এখান হইতে একটী রাস্তা টিহরীর দিকে গিয়াছে। এখানে কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালা ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। রাস্তার মধ্যে সুরকণ্ডার দেবীর মন্দির। কানাতাল হইতে বলডিয়ান ৯ মাইল। এখান হইতে একটী রাস্তা প্রতাপনগর, একটী টিহরী এবং অন্য একটী উত্তর কাশীর দিকে গিয়াছে। বলডিয়ানে ধর্ম্মশালা ও একখানা মাত্র দোকান আছে। এখান হইতে ছাম ৫ মাইল। এখানে নেপালের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি দেবশমসের জঙ্গ বাহাদুরের একটী ধর্ম্মশালা আছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর স্মরণার্থ এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছাম একটী মাঠের মধ্যে অবস্থিত। অতি মনোরম দৃশ্য। এখান হইতে প্রোলা ৩ মাইল। পরে ৫ মাইল দূরে নোগাঁও। এখানে রামসীতা ও লক্ষণদেবের মূর্ত্তি আছে। তলদেশদিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। পরে ধরাসু ৫ মাইল। এখানে কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালা ও দোকান আছে। এখান হইতে একটী রাস্তা গঙ্গোত্তরীর দিকে গিয়াছে। ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী ৪৬ মাইল। ধরাসু হইতে রাড়ীখাল ৭ মাইল, নিকটবর্ত্তী গ্রামে ধর্ম্মশালা আছে, তথায় থাকা যায়। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যদিয়া রাস্তা। ধরাসু হইতে গঙ্গানলী ১৪ মাইল। রাড়ীখাল হইতে রাস্তা ১৫ মাইল চড়াই পরে কিছু উৎরাই। গঙ্গানলী যমুনার তীরে অবস্থিত। গঙ্গা হইতে একটী শাখা আসিয়া যমুনায় পড়িয়াছে। এখান হইতে ওজিরি গ্রাম ১ মাইল, রাস্তা চড়াই ও উৎরাই। পরে ৬ মাইল দূরে রাণীগাও। এখানে গ্রাম্য ধর্ম্মশালা আছে। রাণীগাও হইতে

খরসালী ৬ মাইল এবং গঙ্গাননী হইতে ২১ মাইল। এই গ্রামটী খুব বড় এবং চড়াইর উপর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। এখানে যমুনোত্তরীর পাণ্ডারা বাস করেন। শীতের সময় যমুনাদেবীর পূজা এখানে হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মশালা শনৈশ্বর ও সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরাদি আছে।

খরসালী হইতে যমুনোত্তরী ৬ মাইল, চড়াই ও উৎরাই এবং পথিমধ্যে ভৈরবনাথের মন্দির আছে, তাঁহাকে ছিন্নবস্ত্র দিয়া পূজা দিতে হয়। গঙ্গাননী হইতে আর চটি নাই, রাস্তার মধ্যে মধ্যে যে গ্রাম আছে তথায় যাত্রীরা অবস্থান করিয়া থাকেন।

যমুনোত্তরী

এই ধামে জুতা পায় দিয়া প্রবেশ নিষেধ। যাত্রীদের জুতা পশ্চিম পারস্থিত দোকানদারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিতে হয়। এখানে খুব কম যাত্রী যাইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে আসিবার জন্য ভাল রাস্তা ছিলনা কয়েক বৎসর হইল টিহরীর রাজা নিজব্যয়ে ধরাসু হইতে একটা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে গরমজলের ঝরণা, কুণ্ড ও ফোয়ারা দেখিতে অতীব মনোহর। গরমজলের কুণ্ডের তাপ ১৯৪০৭ ফাঃ, এখানে চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই অন্ন প্রস্তুত হইয়া যায়। রুটিও এই জলে বেশ তৈয়ার করিয়া নেওয়া যায়। এখানে শ্রীশ্রী৺যমুনাদেবীর মন্দির, নারদ কুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, গোমুখী প্রভৃতি গরমজলের কুণ্ড ও ফোয়ারা আছে। এখানে ধর্ম্মশালা আছে তথায় যাত্রীরা বাস করিয়া থাকেন। যমুনার অপর পারে খাদ্যদ্রব্যের দোকান। যথায় গরম জলের ধারা যমুনাতে পতিত হইয়াছে তাহাকে অসিসঙ্গম বলে, এখানে যাত্রীরা স্নানাদি করিয়া থাকেন। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই

স্থানের উচ্চতা ১০,৪০০ ফিট এবং বান্দারপাঞ্চ নামক যে পর্ব্বতের গায়ে অবস্থিত তাহার শিখর দেশের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ২০,৭৩১ ফিট। ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বরফস্তুপ (Glacier) হইতে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে।

দেরাদুন হইতে যমুনোত্তরী ১১০ মাইল।

গঙ্গোত্তরীর রাস্তা

ধরাসু হইতে ডুণ্ডা ৮ মাইল। এখানে ধর্ম্মশালা এবং একটী বৃহৎ গুহা আছে। জঙ্গলের মধ্যদিয়া রাস্তা। ডুণ্ডা হইতে উত্তর কাশী ৮ মাইল। যমুনোত্তরী হইতে একটী রাস্তা গুপ্ত কাশী গিয়াছে, ৩৮ মাইল ব্যবধান। খরসালী হইতে ধাঙ্গর ৬ মাইল, পরে উপরি কোট ১৬ মাইল এবং উত্তর কাশী ১০ মাইল। ইহা টিহরী রাজের সাবডিভিসন। এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর থাকেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, পুলিশ চৌকী, বনবিভাগের অফিস, শ্রীমৎ মদন মোহন ব্রহ্মচারীর আশ্রম, শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারীর ও কালীকমলী বাবার ধর্ম্মশালা, সদাব্রতের বন্দোবস্ত ও দোকানাদি আছে। এখানেও কাশীর ন্যায় অনেক দেবতার মন্দির আছে। কাশী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, গুরুদত্তাত্রেয়, পরশুরাম, দুর্গা, লক্ষেশ্বর মহাদেব, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং কেদারঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, গোঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, জ্ঞানবাপীকুণ্ড, অসি সঙ্গম, বরুণা সঙ্গম প্রভৃতি আছে। শ্রীশ্রীপরশুরাম এখানে কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া অনুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই প্রার্থনায় মহাদেব এখানে মরকত-মণি সদৃশ লিঙ্গ মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

এখানে ১৬ ঘর পাণ্ডা ও একটী পাঠশালা আছে। এই গ্রামের উত্তর পার্শ্বে বারণাবত পর্ব্বত, অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া

আছে। পাণ্ডারা জতুগৃহ দাহের চিহ্ন এখানে দেখাইয়া থাকেন। এক মাইল উপরে বিমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। আরও দুই মাইল উপরে বরুণেশ্বর মহাদেব আছেন। উত্তর কাশী হইতে পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া এই সকল স্থান দর্শন করিতে হয়। জ্ঞানব্যাপী নামক স্থানে নানকপন্থী সাধুদের একটী আস্তান ও তাহার পশ্চিম-উত্তর কোনে কুষ্ঠ রোগীর হাস্পাতাল আছে।

উত্তরকাশী হইতে দুই মাইল দূরে **বিনসীপাড়** পরে চার মাইল দূরে **নিতানা**। এখানে একখানা দোকান আছে। নিতানা হইতে **মনেরি** চার মাইল। এখানে শ্রীমৎস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর ও কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা আছে। পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। মনেরি হইতে **মানুহা** পরে **ভাটোয়ারী** নয় মাইল। এখান হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ যাইবার রাস্তা আছে।

এখানে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রী৺ভাস্করেশ্বের শিব, টিহরী রাজের ডাকবাংলা, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত ও এক খানা দোকান আছে। ভাটোয়ারী হইতে **বুখী** চটি চার মাইল, পরে ছয় মাইল দূরে **গঙ্গানানী**। এখানে এক খানা ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে কিছু দক্ষিণে পরাশর দেবের আশ্রম, গরম জলের ঝরণা এবং দুই খানা ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে এক মাইল দূরে **বঙ্গেলীপাড়** এবং চার মাইল পরে **লুহারীনাগ**। এখানে স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর একটী ধর্ম্মশালা ও দোকান আছে। এখান হইতে রাস্তা চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। লুহারীনাগ হইতে আট মাইল দূরে **সুখী**, পরে এক মাইল চড়াই এর পরে **ঝোলা**। এখানে টিহরী রাজের ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে রাস্তা উৎরাই এবং পাঁচ মাইল পরে **হরশিলা**। এখানে

টিহরী রাজের কাছারী এবং একখানা দোকান আছে, অদূরে একটী মন্দির ও ধর্ম্মশালা। হরশিলা হইতে চার মাইল দূরে **ধরালী** এখানে জয়পুর মহারাণীর ও টিহরী মহারাজের দুইটী ধর্ম্মশালা, এবং একখানা দোকান আছে। গঙ্গাতে বাঁধান ঘাট এবং ঘাটের উপর দুইটী শিবালয় আছে। গঙ্গার অপর পারে **মুখুবাগ্রাম**, এখানে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডারা বাস করেন। এই গ্রামে প্রায় ৪০।৫০ খানা বাড়ী আছে। এখান হইতে এক মাইল পূর্ব্বে মার্কণ্ড দেবের আশ্রম, তথায় শীতের ছয়মাস গঙ্গাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। এখান হইতে তিন মাইল দূরে **জঙ্গল চটি**। এখানে টিহরী রাজের ডাকবাংলা এবং এক খানা দোকান আছে। চড়াইর রাস্তায় চার মাইল দূরে **ভৈরবঝোলা**। ইহা গঙ্গার উপর লৌহ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী সেতু। এখান হইতে অৰ্দ্ধ মাইল দূরে **ভৈরব চটি**, এখানে এক খানা ধর্ম্মশালা, দোকান ও ভৈরব নাথের মন্দির আছে। এখানে চটিওয়ালা কাঠ বিক্রয় করে না, নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। ভৈরব চটি হইতে **গঙ্গোত্তরী** ছয় মাইল, রাস্তা মধ্যে মধ্যে চড়াই ও সমতল। ঝোলা হইতে একটী রাস্তা গঙ্গার তীর দিয়া নীলাংমঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই মঠ তিব্বতবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে তুটিয়া বলিয়া থাকে। এখানে আরও কয়েকটী মঠ আছে কিন্তু তাহা শীতের সময় তুষারাবৃত হইয়া থাকে। এই সময় স্থানীয় লোকেরা উত্তর কাশীতে অবস্থান করে। রাস্তায় গৌরী কুণ্ড আছে।

ধরাসু হইতে গঙ্গোত্তরী ৭৬ মাইল এবং গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল।

গঙ্গোত্তরী

ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে সমুদ্রবক্ষ: হইতে ১০,৩১৯ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে তিনটী মন্দির আছে। দক্ষিণের মন্দিরে মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি, হর পার্ব্বতী, নন্দী, ভৃঙ্গী ইত্যাদি, মধ্যের বড় মন্দিরে গঙ্গাদেবী, যমুনাদেবী, সরস্বতী দেবী, মহারাজ ভগীরথ, জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং উত্তর-পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ মন্দিরে অন্নপূর্ণাদেবীর মূর্ত্তি আছে। বড় মন্দিরটী চতুষ্কোন ও ২০ ফিট উচ্চ। এই মন্দির নেপালের অমর সিং থাপা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শীতের সময় মন্দির বন্ধ থাকে মন্দিরে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয় তাহা ছয় মাস পরে মন্দিরের দরজা খুলিবার সময় দর্শন করিতে পারা যায়। এখানে কোনও রাওল নাই। পাণ্ডাদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান আছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদত্ত মহারাজ অধ্যক্ষ। এখানে কালীকম্বলী বাবার কয়েক খানা ধর্ম্মশালা আছে। এক খানা মাত্র খাদ্যদ্রব্যের দোকান। যাত্রীরা এখান হইতে গঙ্গাজল নিয়া যায় এবং এই জল রামেশ্বর সেতুবন্ধে মহাদেবের লিঙ্গোপরি ঢালিয়া থাকে। এই জল নেওয়ার জন্ত হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থান হইতে পিতলের পাত্র আনিতে হয় এবং এখানে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া ঝালাই করিয়া নেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এখানে গঙ্গার কিনারে দুইটী গুহা আছে তাহা যোগীদের উপযুক্ত।

গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল। এখান হইতে গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই স্থানে যাইতে হইলে বৈশাখ মাসে অথবা আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে যাইতে পারা যায়। এই সময় গঙ্গার উপর জমাট বরফ থাকে। তথায় আহার্য্য সামগ্রী পাওয়া যায় না। সমস্তই সঙ্গে নিয়া যাইতে হয়। গোমুখী হইতে নয় মাইল দূরে চিরবাসা,

এই স্থান পর্য্যন্ত কাঠ পাওয়া যায়, পরে সমস্তই চির তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা।

ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণের রাস্তা।

ভাটোয়ারী এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং ভাহর গঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ ৭৮ মাইল। ৯ মাইল পরে চোরনা, এখানে একখানা ধর্ম্মশালা আছে। পরে রাস্তা চড়াই, তিন মাইল দূরে বেলক। এখানে ধর্ম্মশালা ও দোকান আছে। বেলক হইতে পাঙ্গরাণা পাঁচ মাইল, রাস্তা উৎরাই। এখানে স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মশালা ও আহার্য্য দ্রব্যের দোকান আছে, জল কিছু দূরে। এখান হইতে ঝালোচটি ছয় মাইল, রাস্তা চড়াই ও উৎরাই। ছয় মাইল দূরে বুড়াকেদার। রাস্তা অপরিষ্কার কিন্তু বিশেষ চড়াই উৎরাই নাই। বুড়াকেদার বালগঙ্গা ও ধর্ম্মগঙ্গা নাম্নী দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে কেদারনাথের বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। লিঙ্গের গায় হর পার্ব্বতী, গণেশ ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। এখান হইতে কিছু দূরে পর্ব্বত গুহামধ্যে বশিষ্ঠাশ্রম। বুড়াকেদার হইতে বেস্তী তিন মাইল ও পাঁচ মাইল পরে হতকুঁড়ু। এখানে ভৈরব নাথের মন্দির আছে, রাস্তা চড়াই। এখান হইতে ভৌত পাঁচ মাইল, পরে পন্থেশ্বী আট মাইল, তথা হইতে থুত্তু ১০ মাইল। গ্রামে রঘুনাথ দেবের মন্দির আছে। এখানে ভৃগুগঙ্গা প্রবাহিতা। এখানে ধর্ম্মশালা ও দোকান আছে। থুত্তু হইতে পঁবালো ১০ মাইল কিন্তু এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে কুদ্রচটি আছে—১ মাইল পরে গোয়ালা, ৩ মাইল পরে গোয়ালমাড়ে, ৩ মাইল চড়াইএর পর দোফান্দা

চটি। দোকান্দা হইতে ৩ মাইল চড়াইর পরে **পঁবালী চটি**। এখানে কয়েক খানা দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। পঁবালী হইতে **মগু চটি** ৯ মাইল। এখানে একখানা ধর্ম্মশালা ও একখানা মাত্র খাদ্যদ্রব্যের দেকান আছে। মগু চটি হইতে ত্রিযুগী-নারায়ণ ৫ মাইল।

টিহরী হইতে শ্রীনগর

টিহরী হইতে পৌ ১১ মাইল, পরে ডাঙ্গচোরা ১৪ মাইল। ডাঙ্গচোরা হইতে শ্রীনগর ৮ মাইল।

কালীকম্বলী বাবা

হৃষীকেশে বহু সাধু সন্ন্যাসী সাধন ভজন করিয়াছেন এবং এখন ও করিতেছেন। সকলেই নিজের কার্য্য লইয়া ব্যাস্ত ছিলেন কিন্তু কালীকম্বলীর ন্যায় সর্ব্বসাধারনের উপকার কেহ করিয়া যান নাই। কালীকম্বলী বাবা হিমালয় ভ্রমণের রাস্তা সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি হৃষীকেশের তপোবনে সাধন ভজন করিতেন। তাঁহার নাম শ্রী ১০৮ শ্রীমৎপরমহংস বিশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি সর্ব্বদা একখানা কাল কম্বল ব্যবহার করিতেন, এইজন্য সকলে তাঁহাকে কালীকম্বলী বলিয়া থাকে। তাঁহার চেষ্টায় হিমালয়ের তীর্থ ভ্রমণের রাস্তায় রাস্তায় ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, মধ্যে মধ্যে চড়াইর উপর জলসত্র ও হৃষীকেশে ঔষধালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইয়া সেই সাধু মহাত্মার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কলিকাতা বড় বাজারের বিখ্যাত মারোয়ারি বণিক রায় শেঠ সুরজমল শিবপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থ দর্শন অভিলাষে হৃষীকেশে উপস্থিত হন। তথায় কালীকম্বলী বাবার নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনাভিলাষে

তপোবনে উপনিত হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার দ্বারা কি উপকার হইতে পারে। প্রথম প্রশ্নে বাবাজী কোনও উত্তর দেন নাই। পরে ২।৩ বার প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন যে সাধু সন্ন্যাসীর বাসের ও আহারের অত্যন্ত অসুবিধা। যাহাতে এই অভাব দূর হয় তাহার বন্দোবস্ত করিলেই তিনি অত্যন্ত সুখী ও উপকৃত হইবেন। বণিক প্রবর ইহাতে সম্মতি জানাইলে বাবাজী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সমস্ত উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং কোথায় কি প্রকারে যাত্রীদের সুবিধা হইবে তাহা দেখাইয়া দেন। ইহার পর ক্রমে উক্ত শেঠের ও অন্যান্য লোকের চেষ্টায় ও অর্থবলে নিম্নলিখিত স্থানে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত হইয়া তীর্থপর্যাটনকারীদের অশেষ প্রকারের সুবিধা হইয়াছে। সকল ধর্ম্মশালাতেই লিখা আছে কালীকম্বলী বাবার আজ্ঞায় অমুক শেঠ কর্ত্তৃক স্থাপিত ইত্যাদি।

লছমন্ ঝোলার লৌহ সেতু ও সুরযমলের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই সেতু তাঁহার মাতৃভক্তির নিদর্শন। তাঁহার মাতার আদেশ অনুসারে তিনি নির্ম্মান করিয়াছেন।

যে সকল স্থানে ধর্ম্মশালা আছে তাহার নাম :—

হৃষীকেশ রোড ষ্টেসন
সত্য নারায়ণ
হৃষীকেশ
রাম আশ্রম
লছমন ঝোলা
ব্যাসঘাট
দেবপ্রয়াগ
ত্রিযুগী নারায়ণ
রামবাড়া
কেদারনাথ
লালসাঙ্গা
গরুড় গঙ্গা
কুমার চটি
যোশীমঠ

শ্রীনগর	পাণ্ডুকেশ্বর
ভট্টিসেরা	রামবাগাড়
রুদ্রপ্রয়াগ	হনুমান চটি
অগস্ত্যমুণি	বদরিকাশ্রম
গুপ্ত কাশী	কর্ণপ্রয়াগ
রামপুর	

গঙ্গোত্তরীর ও যমুনোত্তরীর রাস্তায় যে সব স্থানে ধর্ম্মশালা আছে তাহার নাম :—

বুড়া কেদার	নগুনা
গঙ্গোত্তরী	ভাটোয়ারী
উত্তর কাশী	ধরাসু
মনেরি	খরসালী
ডুণ্ডা	ধনোটী
ছাম	কানাতাল

স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য লোকের ধর্ম্মশালা যে স্থানে আছে তাহার নাম :—

দেরাদুন	হরশিলা
ল্যাণ্ডোর	ধরালী
বলডিয়ান	ভৈরব চটি
গঙ্গানানী	পাঙ্গরাণা
মানেরি	পবালী চটি
সুহাগীবাগ	মন্সু চটি
খোলা	

বদ্রীনারায়ণের রাস্তা বন্ধ হওয়ার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য।

বিগত ১৩২৮ সনের ৮ই আশ্বিন তারিখের বসুমতীতে প্রকাশ হইয়াছিল "সে দিন এক সাধু সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বদ্রিনারায়ণের পথ বন্ধ করা হইয়াছে কেন বলিতে পারেন? কেন,—এ কথা জানা দূরে থাকুক, পথ যে বন্ধ হইয়াছে, এ কথাও বাঙ্গালার অনেকে জানেন না। এই জবাব দিলে সাধু বলিলেন, "কেন, তোমরা কি জান না, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে আজ ৭ বৎসরের মধ্যে তীর্থযাত্রীরা মাত্র তিন বার বদ্রির পথ খোলা পাইয়াছে, অবশিষ্ট চারি বার নানা ওজুহতে সরকার পথ বন্ধ রাখিয়াছেন। এবারও যথারীতি গত বৈশাখ মাসে প্রায় ২০ হাজার সঙ্গ সাধু বদ্রির পথে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু লছমনঝোলায় তাঁহাদিগকে আটক করা হয়। সরকার-পক্ষের লোক বলেন, এবার বদ্রিনারায়ণে কলেরা ও দুর্ভিক্ষ হওয়াতে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা শুনিয়াও বিস্তর সাধু লছমনঝোলায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া প্রায়োপবেশন করেন। তিন দিন তাঁহারা অনশনে থাকিলেও কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। আমরা সাধুর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। অবশ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্যহেতু যাত্রিসমাগম বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ৭ বৎসরের মধ্যে ৪ বারই কি পথে এই বাধা উপস্থিত হইয়াছিল? আর যদিই বা এই বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে পূর্ব্বাহ্নে এ সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় না কেন? দিলে বহু যাত্রীকেই লছমনঝোলা পর্য্যন্ত গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া

আসিতে হইত না। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে কোনও কোনও সাধু বলেন, সংক্রামক রোগের সংবাদের মূলে কোনও ভিত্তি নাই, গাড়োয়াল প্রদেশে অশান্তি হেতু ঐ দিকে অপরের যাত্রার পথ বন্ধ হইয়াছে। এ কথা সত্য হইলে ব্যাপার সহজ নহে। কিন্তু সরকার এমন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া হিন্দু তীর্থযাত্রীর তীর্থযাত্রায়—ধর্ম্মাচরণে বাধা দিবেন, এমন ত বিশ্বাস হয় না। আশা করি, এ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য অবিলম্বে প্রকাশ করিয়া সরকার সকলের সন্দেহভঞ্জন করিবেন।"

১৯২২ খৃঃ অব্দের ২৪শে জুন তারিখের "Times of Assam" পত্রিকার নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ হইয়াছে :—

PILGRIMS TO BUDRINATH :—A Government communique says that in continuation of previous communiques issued on the subject, notice is hereby given for the benefit of pilgrims for Badrinath that owing to the failure of rains in March the situation with regard to the shortage of food stocks in Garhwal has been aggravated. Intending pilgrims are therefore strongly advised to postpone their visit to a more favourable year. Those who disregard this warning will incur the risk of starvation and it may become necessary to stop pilgrims definitely at Lachman Jhula.

এভাবে প্রতিবৎসর যাত্রীর রাস্তা বন্ধ হওয়ার কারণ কি? গাড়োয়ালে যে দুর্ভিক্ষ তাহা সত্য কিন্তু কলেরার জন্য যে রাস্তা বন্ধ হইয়াছে তাহা ঠিক মনে হয় না, কারণ যদিও আমরা হরিদ্বারে ও হৃষীকেশে কলেরার সংবাদ পাইয়াছিলাম এবং তখন এই উভয় স্থানে লোকও মরিতেছিল কিন্তু লছমনঝোলা পার হইয়া যখন আমরা হিমালয়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি তখন কোথাও কলেরার রোগী দেখি

নাই, তবে রুদ্রপ্রয়াগে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সেনিটারী অফিসার বলিয়াছিলেন যে অগস্ত্যমুনিতে কলেরা আছে। আমরা কিন্তু চটিতে কোনও রোগী দেখি নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামে আছে কি না তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অপর এই ৪০০ মাইল রাস্তার মধ্যে আমরা কুত্রাপি কলেরা দেখি নাই। সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে কলেরার জন্য রাস্তা বন্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ দুর্ভিক্ষ। উহা সমস্ত গাড়োয়াল ব্যাপি, সমস্ত গাড়োয়াল দেশটাকে ভীষণভাবে করাল ব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতেছে তবে এখনও গিলিয়া ফেলে নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট যাত্রীরাস্তা বন্ধ না করিতেন তবে এই গ্রাস উদ্‌গার দিয়া ফেলিয়া দিত অথবা আস্তে আস্তে গিলিতে থাকিত কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বশতঃ গারোয়ালকে এই রাক্ষসীর গ্রাস হইতে অব্যাহতি দিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি কেদারনাথে এবং অন্যান্য স্থানে প্রচুর জিনিষপত্র মজুত ছিল কিন্তু যাত্রী সমাগম না হওয়াতে দোকানদারেরা অন্যত্র বিক্রয় করিয়াছে। এই দুর্গম তীর্থের রাস্তা বন্ধ করিবার প্রধান নায়ক কালীকম্‌লী বাবার ধর্ম্মশালার ম্যানেজার শ্রীমৎ রামনাম জী। তিনি পৌড়ীর ডেপুটী কমিশনারকে লিখাতে রাস্তা বন্ধ হইয়াছে। যে সব স্থানে কালীকম্‌লী বাবার ধর্ম্মশালা আছে তথায় সদাব্রত দেওয়া হয়। রাস্তা খোলা থাকিলে সাধু সন্ন্যাসীরা তথায় উপস্থিত হইয়া সদাব্রত গ্রহণ করিবেন এবং বিস্তর অর্থ ব্যয় হইবে তাই তিনি এই দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। রাস্তা বন্ধ হওয়াতে যে সব অসুবিধা হইয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

(১) সকল চটির দোকানদারেরাই চৈত্র ও বৈশাখ মাসে রামনগর অথবা কাঠগুদাম হইতে মাল সরবরাহ করিয়া মজুত রাখিয়াছিল কিন্তু

ক্রেতা না পাওয়াতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। অনেক দোকান-দারেরা আমাদের নিকট এই বিষয় অভিযোগ করিয়াছিল।

(২) কাণ্ডী ও ঝাঁপানওয়ালারা এই সময় বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে কিন্তু রাস্তা বন্ধ হওয়াতে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে এবং বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ হরিদ্বার এবং হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে যাত্রীর অপেক্ষায় থাকে।

(৩) যাত্রীদের নিকট হইতে পাণ্ডারা বিস্তর অর্থ পাইয়া থাকেন, তাঁহারাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন।

(৪) তীর্থস্থানের মন্দিরের আয়ও বন্ধ হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আক্ষেপ করিয়াছেন।

(৫) চটির মেথরেরা স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। ছয় মাসের রোজগার তাহাদের বন্ধ হইয়াছে। তাহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাকে।

কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণের রাস্তার সকল দোকানদারেরা কাঠগুদাম ও রামনগর হইতে মাল আনাইয়া থাকে। হিমালয়ের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য যাত্রীদের ব্যবহারে খুব কম আসিয়া থাকে কারণ যাহা উৎপন্ন হয় তাহা পাহাড়ীদেরই প্রচুর নহে।

বদ্রীনারায়ণের রাস্তায় প্রতিবৎসর ৫০।৬০ হাজার যাত্রী চলাফেরা করিয়া থাকে। ১৩২৭ সনে ৪৬ হাজার যাত্রী গিয়াছিল। ১৩২৮ সনে বৈশাখ মাসে যখন রাস্তা খোলা ছিল তখন প্রায় ৩।৪ হাজার যাত্রী পার হইয়া গিয়াছিল। আমি লছমন ঝোলাতে অবগত হইলাম যে একদল "পুরবিয়ার" সহিত পুলিশের মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, পরে জোর করিয়া বদরিকাশ্রম অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা দলে ২০।২৫ জন ছিল।

আমরা ভ্রমণের সময় দেখিয়াছিলাম কতকগুলি যাত্রী তিহরীর রাস্তায় গঙ্গোওরী ও যমুনোত্তরী হইয়া ত্রিযুগীনারায়ণে আইসে পরে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করিয়া হরিদ্বার অথবা রামনগরের রাস্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই রাস্তায় তাহাদিগকে কেহই বাধা দেয় নাই অথবা তাহারা অনশনেও মরিয়া যায় নাই। কুলির দরকার হইলে দেরাদুন অথবা মসুরী হইতে কাণ্ডীর বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়। আমাদের হৃষীকেশে অবস্থান সময়ে একদল যাত্রী লছমন ঝোলাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দেরাদুন হইয়া গঙ্গোত্তরী যায়, পরে ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন করে। কেদারনাথের রাস্তায় তাহাদের সহিত যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা যে জয়ধ্বনি করিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। কি ধর্ম্মের প্রাণ, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা কত কঠোর পরিশ্রম করিয়া নারায়ণ দর্শন করিতে গিয়াছিল। ধন্য তাঁহাদের জীবন, ধর্ম্মের জন্য যাঁহাদের এত আকুল পিপাসা, যাঁহাদের নারায়ণের প্রতি এত অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস, সাধ্য কি তাঁহাদের কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারে?

শ্রীবদ্রীনারায়ণস্যারত্রিকম্

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতম্।
শ্রীনিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, ধুনিকর ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
শ্রীসিদ্ধ মুনি জন ধুনি করত জয় জয় শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
শক্তি গৌরি গণেশ সারদ নারদ মুনি ধুনি উচ্চরৈ।
যোগ ধ্যান অপার লীলা শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
যক্ষকিন্নর করত কৌতুক গায়ন গন্ধর্ব্ব প্রকাশিতম্।
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চামর ঢোরে শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
কৈলাশমে একদেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত জয় জয় শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥
শ্রীবদ্রীনাথজীকে পঞ্চরত্নম্ পড়ত পাপ বিনাশনম্।
কোটি তীরথ লভয়ে পুণ্যং প্রাপ্যতে ফলদায়কম্ শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।
শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥

জ্যৈষ্ঠ	৩	৪।০	ব্যাসঘাট	উৎরাই	গঙ্গা ১,৪১৪	বাংলা	ধর্ম্মশালা
(রাত্রি)		৩	ছুলারী				জলাভাব, চটি নাই
দিবা		২	উমরাশু				
		১।০	সাউর				
৩১ জ্যৈষ্ঠ	৪-৩	১।০	দেব প্রয়াগ		গঙ্গা ১,৫৫০	বাংলা ও পোঃ	তারঘর, ফাঁড়ি, ধর্ম্মশালা, সদাব্রত।
২ আষাঢ়						বাংলা	কোতলা নামক স্থানে।
৩ আষাঢ়	৭	৭।০	রাণীবাগ				জলাভাব
		৩।০	রামপুর				
দিবা		৪	বিল্বকেদার				
৪-৫ আষাঢ়	৮-৯	৩	শ্রীনগর		১,৭০৬	বাংলা ও পোঃ	ডাকঘর, হস্পিতাল, থানা, ধর্ম্মশালা, কুলি এজেন্সি।
		৪	সুকারতেঃ				
দিবা		৬।০	ভট্টি সেরা	চড়াই ও উৎরাই		বাংলা	১॥ মাইল চড়াইয়ে বাংলা, অন্নছত্র ও কুলি এজেন্সি, চটিতে ধর্ম্মশালা।
৬ই আষাঢ়	১০	৩	বাংলা	ঐ			
(রাত্রি)		২	মাঝকোট	ঐ			
		৪	গোলাপ রায়	ঐ			
দিবা		৫।০	রুদ্রপ্রয়াগ		নদী ১,৯১২	বাংলা ও পোঃ	বদরিকাশ্রমের যাইবার রাস্তা, কুলি এজেন্সি, বাঘের ভয়, ধর্ম্মশালা।
৭ই আষাঢ়	১১	৫	ছাতোলী	চড়াই ও উৎরাই			বাঘের ভয়
(রাত্রি)		০					

হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত চটির বিবরণ।

তারিখ	দিবস	চটির দূরত্ব মাইল	চটির নাম	চড়াই ও উৎরাই	সমুদ্র বক্ষঃ হইতে উচ্চতা (ফুট হিঃ)	সরকারী বাংলা ও ডাকঘর	অন্যান্য সংবাদ
		২।০	রামপুর				
		৩।০	অগস্ত্যমুনি			পোঃ	
দিবা		২	সাউরী				
		২	চন্দ্রাপুরী	... ...	... ...	... ...	চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গার মন্দির, চন্দ্রা নামে ক্ষুদ্র নদী।
৮ই আষাঢ়	১২	৩	ভিরি				উখীমঠ যাইবার রাস্তা।
(রাত্রি)		৪	কুণ্ড	চড়াই			
৯ ১০ আষাঢ়	১৩-১৪	২।০	গুপ্তকাশী	চড়াই		বাংলা ও পোঃ	উখীমঠ যাইবার রাস্তা।
		১।০	নালা				
		২।০	ভেতা বা নারায়ণ	উৎরাই	... ..	.. ...	কালীমঠ যাইবার রাস্তা। এখান হইতে মধ্য মহেশ্বর যাইতে হয়।
		২	বিঁউ (ভগ্না ও মলা)	চড়াই ও	উৎরাই		
		২	দুর্গা বা মৈখণ্ডা	চড়াই			মহিষমর্দ্দিণীর মন্দির ও বৃহৎ দোলনা।
		১	ফাটা			বাংলা ও পোঃ	ধর্ম্মশালা, ১ মাইল দূরে পর্ব্বতোপরি জামদাগ্নি মহাদেব, জঙ্গল আরম্ভ।
১১ আষাঢ়	১৫	২	বাদলপুর	ঐ			
(রাত্রি)		২	রামপুর	ঐ	... ...	... ...	
			(ত্রিযুগী নারায়ণ)	ঐ		ধর্ম্মশালা	এখান হইতে পতিগাধ প্রস্রবণ ৩ মাইল উৎরাই। পরে ত্রিযুগী নারায়ণের রাস্তা আরম্ভ। প্রস্রবণ হইতে দূরত্ব ৩ মাইল। ফিরিবার সময় অপর [illegible]
দিবা		৩।০	গৌরীকুণ্ড	ঐ			
১০ আষাঢ়	[illegible]	১	আরাম	ঐ	ভিত্তি ১১ ৫৫০ [illegible]	[illegible]	

প্রধান প্রধান স্থানের দূরত্ব

			মাইল
হরিদ্বার	হইতে	হৃষীকেশ	—১৪
হৃষীকেশ	„	লক্ষণ ঝোলা	— ৩
লক্ষণ ঝোলা	„	দেবপ্রয়াগ	—৪১
দেবপ্রয়াগ	„	রুদ্রপ্রয়াগ	—৩৮
রুদ্রপ্রয়াগ	„	গুপ্তকাশী	—২৪
গুপ্তকাশী	„	কেদার নাথ	—২৫
কেদার নাথ	„	নালা	—২৪
নালা	„	লালসাঙ্গা	— ৩
লালসাঙ্গা	„	জোশীমঠ	—১৮।০
জোশীমঠ	„	বদরিকাশ্রম	—১৯
বদরিকাশ্রম	„	লালসাঙ্গা	—৪৸০
লালসাঙ্গা	„	কর্ণপ্রয়াগ	—১৯।০
কর্ণপ্রয়াগ	„	মেহেল চৌরী	—২৯
মেহেল চৌরী	„	রামনগর	—৭০
		মোট	৪১৫।০
রুদ্রপ্রয়াগ	„	কর্ণপ্রয়াগ	—১৯
টিহরী	„	শ্রীনগর	—৩১
দেবপ্রয়াগ	„	টিহরী	—৩৩
হরিদ্বার হইতে কর্ণপ্রয়াগের রাস্তায় বদরিকাশ্রম			—১৮০
দেরাদুন	হইতে	যমুনোত্রী	—১১০
দেরাদুন		ধরাসু	—৬৪

ধরাসু	হইতে	যমুনোত্তরী	—৪৬
যমুনোত্তরী	"	উত্তর কাশী	—৩৮
টিহরী	"	ধরাসু	—৩৫
ধরাসু	"	গঙ্গোত্তরী	—৭৬
গঙ্গোত্তরী	"	গোমুখী	—১৮
ভটবাড়ী	"	ত্রিযুগী নারায়ণ	—৬৮
গঙ্গোত্তরী	"	কেদার নাথ	—১২০
যমুনোত্তরী	"	উত্তরকাশী হইয়া গঙ্গোত্তরী	—৯৩